কিশোরী

(কিশোরীদের সচিত্র বার্ষিকী)

সম্পাদিকা

শ্রীসুধাদেবী, বি, এ, বি, টি, এল, টি, ডি,
(লণ্ডন)

আশ্বিন, ১৩৩৮ সাল।

দি ষ্টুডেণ্টস্ এম্পোরিয়াম

২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কিশোরীর সূচি

লেখ-সূচি

দেশের খবর জানতে চান?

☞ অমৃত বাজার পত্রিকা ☜

পড়ুন

কিশোরীদের সচিত্র বার্ষিকী

প্রথম বর্ষ | আশ্বিন ১৩৩৮ | প্রথম খণ্ড

শুভদিনে

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর।

আজি মা আসিনি হেথা শুনাবারে তোমায় কবিতা,
কালাকাল-বোধহীন নহে কবি, হে বঙ্গ-দুহিতা,
আজি আসিয়াছি শুধু শুভাশিস্ করিতে জ্ঞাপন,
সব চেয়ে আজিকেই তারই বৎসে আছে প্রয়োজন।

স্থান-কাল-পাত্রাদির মুখ চেয়ে বহে কাব্য ধারা,
কারো মুখ নাহি চায় আশীর্ব্বাদ চিরকুণ্ঠাহারা।
জীবন-সন্ধির ক্ষণে আজি তাই করি আশীর্ব্বাদ,
মৈত্রেয়ীর মত লভ মর্ত্ত্য লোকে অমৃতের স্বাদ।
ভুলনাক অরুন্ধতী ভারতের আদর্শ মহিলা,
নারীত্বের ব্রত নয় নগরীয় লালসার লীলা।
বেছে লও ভক্তিভরে জীবনের কোন পুণ্যব্রত,
দেশ হোক, সত্য হোক, ধর্ম্ম হোক, যাহা অভিমত
তাহারি সেবায় কর চরিতার্থ ও নারী জীবন,
বিলাসিনী জনতায় হারায়োনা নারীত্ব আপন।
বিলাস·বেষ্টণী আজি দেহটারে বাঁধিবে বাঁধুক,
মন যেন মুক্তি পায়-নাহি হয় কূপের মণ্ডূক।
পঙ্ক ক্লিন্ন নীর ভেদি জাগো তুমি সমাজের বুকে,
শতদল অঞ্জলিতে দিব্যালোক পান কর সুখে।
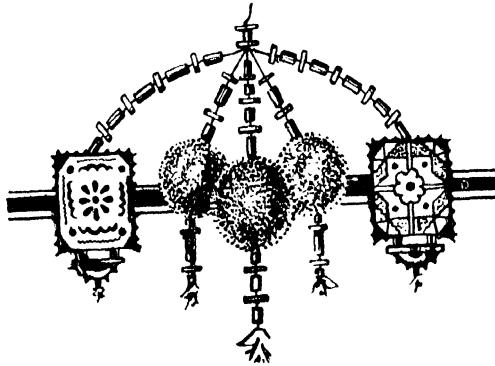
মহামিলন

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১)

ধনীর সুরম্য অট্টালিকা, তাহার পার্শ্বে দরিদ্রের একখানি কুটীর।

ধনীর আদরের দুলালী শুভ্রাকে মাঝে মাঝে পর্ণ কুটীরের ঠিক উপরে দ্বিতলের রেলিং ঘেরা বারাণ্ডায় দেখা যাইত।

নীচে সেই খোলার ঘরে থাকিত সতী ও তাহার পিতা। সংসারে আর কেহই ছিল না, কাজেই সতীকেই এতটুকু বেলা হইতে স্বহস্তে সংসারের সমস্ত কাজ করিতে হইত।

আগে তাহারা ছিল ভবানীপুরে, বাসার ভাড়া বাড়িয়া যাওয়ায় অগত্যা পিতা তারানাথকে সস্তা ভাড়ায় এখানে খোলার ঘর ভাড়া করিতে হইয়াছে।

শুভ্রা ছুটির দিনে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইত, ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিত তাহারই সমবয়স্কা এই মেয়েটী কেমন করিয়া কাজ করে, কেমন পরিপাটিরূপে খোলার ঘর খানি সাজায়, তিন হাত লম্বা উঠানটী কেমন পরিষ্কার করে।

প্রতিদিন স্কুলের বাস আসিয়া বড় বাড়ীটির গেটে দাঁড়ায়, সতী দেখিতে পায় সুসজ্জিতা শুভ্রা বাসে গিয়া উঠে, ঝি বইগুলা বাসে তুলিয়া দেয়। গড় গড় করিয়া স্কুলের বাস অনেকগুলি মেয়েকে বুকে লইয়া চলিয়া যায়। সতী সমস্ত দিন বসিয়া সেই স্কুলের গাড়ীর কথাই ভাবে। বৈকালে স্কুলের গাড়ী ফিরিয়া আসে, শুভ্রা নামিয়া পড়ে, দ্বারোয়ান প্রত্যহ তাহার বইগুলা নামাইয়া আনে।

পিতা বাড়ীতে ফেরেন সন্ধ্যার সময়। দোকানে হিসাব লেখার কাজ, সকাল বেলা যান, দশটার সময় এক ফাঁকে আসিয়া আহার করিয়া যান, আর বাড়ী আসিতে পারেন না।

ইহারই ফাঁকে সতী লেখাপড়া করে, নহিলে দিন যে কাটে না। সন্ধ্যার পর পিতা বাড়ীতে আসিয়া জল খাইয়া যখন তামাক খাইতে বসেন তখন সে পড়া দেয়, নূতন পড়া নেয় ; সমস্ত দুপুর সেই পড়াতেই সে কাটাইয়া দেয়।

স্কুলে যাইতে ইচ্ছা হয়, মনে হয় যদি অমনি করিয়া অন্ততঃ পক্ষে একটা দিনও সে বাসে উঠিতে পায় তাহার জন্ম সার্থক হইবে।

কিন্তু তাহা যে একেবারেই অসম্ভব। সে আপনার মনে নানা ছবি আঁকে। বাস্তবে যখন ফিরিয়া আসে তখন মনে হয় সে শুধু স্বপ্নই দেখিয়াছে, তখন তাহার হাসি পায়, সে হাসে কিন্তু সে বড় দুঃখের হাসি।

ওই বাসে যাহারা যাওয়া আসা করে তাহাদের সহিত তাহার পার্থক্য অনেক। তাহার পিতা যে বেতন পান তাহাতে কোনক্রমে সংসার খরচ চালাইয়া তাহার বিবাহের জন্য সঞ্চয় করেন তাহা সে জানিত। স্কুলে যাইতে হইলে কেবল বেতন বা বই হইলেই চলিবে না, বাসের জন্য খরচও চাই, ভদ্রভাবের কাপড় জামাও চাই, এ সব পাইবে কোথায় ?

একদিন সে মুখ ফুটিয়া পিতাকে বলিয়াছিল —"আমি স্কুলে পড়্‌ব বাবা—"

পিতা সেদিন হাসিয়াছিলেন, কথাটা যেন অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। গরীবের ঘরের মেয়ে, আর দুদিন বাদে তাহার বিবাহ দিতে হইবে, এখন কোথায় সেই ভাবনাতেই তিনি অস্থির, এই সময় সে স্কুলে যাইতে চায়।

সান্ত্বনা দিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "স্কুলে গিয়ে কি করবি মা, অনর্থক কতকগুলো খরচ বাড়ানো বই তো নয়। স্কুলে যা শেখায় তোকে আমি সেই শিক্ষাই তো দিচ্ছি।"

পিতার কথার উত্তরে সে আর একটী কথাও বলে নাই কিন্তু তাহার মুখখানা মলিন হইয়া উঠিয়াছিল, পিতা তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস তিনি রোধ করিতে পারেন নাই।

এইটুকু মেয়ে—মাত্র তের চৌদ্দ বৎসর মাত্র বয়স, একি একা সমস্ত দিনটা এই ঘরে থাকিতে পারে ? মানুষ মানুষের সঙ্গ চায়, যদি তাহার মা থাকিত তাহা হইলে মানুষের অভাবে সে এত বিষণ্ণ হইয়া উঠিত না। তিনি মাত্র রাতটুকু বাড়ীতে থাকিতে পান, সেই সময়টুকু সে পিতার সঙ্গ পায়, সকাল হইতে সারাদিন এই ছোট মেয়েটী একা থাকে।

পিতা কি করিবেন ভাবিয়া পান না।

(২)

সেদিন হঠাৎ পিতা যখন বলিলেন, "কাল হতে স্কুলে যাবি সতী, সব বন্দোবস্ত ঠিক করে এসেছি, সেদিন সতী যেন আকাশ হইতে পড়িল।

সে জানিতে চাহিল না পিতা কেমন করিয়া তাহার স্কুলের খরচ নির্ব্বাহ করিবেন। সে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল অন্য হাজার প্রশ্নে পিতাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

পরদিন স্কুলের বাস যখন আসিয়া ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইল এবং সুসজ্জিতা শুভ্রা গর্ব্বিতভাবে বাসে উঠিয়া নিজের নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিল তখন বিস্মিত হইয়াই সে দেখিল—তাহার ঘরের নীচের ছোট কুঁড়ের সেই মেয়েটীও কুণ্ঠিতভাবে কতকগুলি বই খাতা লইয়া আসিয়া উঠিয়া পড়িল, এবং তখনও বাসে যথেষ্ট সিট থাকা সত্ত্বেও সঙ্কুচিতভাবে একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

পরণে একখানা পরিষ্কার কাপড় ও একটী সেমিজ, আর কিছু নাই। পা দু'খানা খালি, আলতা পরা, হাতে একগাছি করিয়া সরু বালা, এ ছাড়া তাহার দেহে আর কোনও সাজ ছিল না।

দারুণ ঘৃণায় শুভ্রার সারা দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল,—ছিঃ, ইহারই সহিত এক গাড়ীতে তাহাকে স্কুলে যাইতে হইবে? এই মেয়েটীর চেয়ে তাহার দাসীরাও উন্নত,—সে তাহাদের অনেক তফাতে রাখিয়া চলে আর এই মেয়েটী,—কোন দোকানের বাজার সরকারের মেয়ে—সে কিনা তাহারই পার্শ্বে বসিয়া নিত্য যাতায়াত করিবে!

ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া শুভ্রা বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল, সতীর পানে একবারও চাহিল না।

স্কুলে গিয়া টিফিনের সময় সে অন্য মেয়েদের কাছে জানিতে পারিল এই মেয়েটীকে পরীক্ষা করিয়া হেডমিষ্ট্রেস মিস্ সোম ভারি খুসি হইয়াছেন এবং তাহাদের ক্লাসে লইয়াছেন।

শুভ্রার মুখখানা অন্ধকার হইয়া গেল।

আশ্চর্য্য এই মেয়েটী এতখানি লেখাপড়া শিখিয়া রাখিয়াছে অথচ সে তো সারা-দিনই সংসারে ভুতের মত খাটিতেছে। আর মিস সোমের কি চোখও নাই? এই সামান্য একটা শাড়ী সেমিজ পরা মেয়েকে তিনি পছন্দ করিলেন কি করিয়া?

সতী নিয়মিত স্কুলে আসিতে লাগিল, ক্লাসের অনেক মেয়ের সহিত তাহার সৌহার্দ্য স্থাপিত হইল, হইল না শুভ্রা ও তাহারই মত আর কয়েকটী মেয়ের সহিত। ইহারা শুভ্রার মত আভিজাত্য বংশে জন্মিয়াছে, গরীবকে ঘৃণা করিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখা ইহারা গৌরবের বলিয়া মনে করে।

ক্লাসের টিচারেরাও ধীরে ধীরে এই দরিদ্র মেয়েটীর পক্ষপাতিনী হইয়া পড়িলেন।

সে বৎসর পরীক্ষায় প্রথম হইল এই মেয়েটীই, যে মাত্র চারমাস পূর্ব্বে আসিয়া

স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছে। প্রাইজের সময় দেখা গেল সে-ই অনেকগুলি প্রাইজ লইয়া হাসিমুখে বাড়ী ফিরিল।

শুভ্রার সারা অন্তর বিষের মত জ্বলিতেছিল। সে বাড়ী গিয়া জানাইল এ স্কুলে সে আর পড়িবে না, তাহাকে অন্য স্কুলে দেওয়া হোক।

মা বলিলেন, "এই বছরটা কোন রকমে এখানেই কাটিয়ে দে শুভ্রা, সামনে ম্যাট্রিক একজামিন আসছে, তার পরে কলেজেই তো পড়বি।"

পিতা মাতা সকলেই এই স্কুল হইতে নাম কাটাইবার প্রস্তাবে অমত দিলেন, অগত্যা শুভ্রাকে আরও এক বৎসরের জন্য এখানেই থাকিতে হইল।

[৩]

যে কোন রকমেই হোক এই মেয়েটীকে অপদস্থ করিবার চেষ্টায় শুভ্রা উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

আগে সে ছুটির দিন ছাড়া এ ধারের বারাণ্ডায় আসিত না, এখন সকালে বিকালে সকল সময়েই বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়ায়, দেখে সতী কি করিতেছে। স্কুল হইতে ফিরিয়া বই খাতা রাখিয়া ও কাপড় জামা ছাড়িয়া ময়লা কাপড় পরিয়া সতী গৃহকর্ম্মে লাগিয়া যায়। কোমরে কাপড় জড়াইয়া মনের আনন্দে গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে সে ওবেলাকার বাসন মাজে, ঘর পরিষ্কার করে, রান্না চড়ায়। তখন সে স্কুলের সে সতী নয়, সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া যায়।

স্কুলে শুভ্রা রাষ্ট্র করিয়া দিল সতীর একখানি ভাল কাপড় ছাড়া আর নাই, সেইখানিই সে সযত্নে তুলিয়া রাখে, আসার সময় পরিয়া আসে।

জব্দ করিবার কোন উপায় না থাকিলে মানুষ এমনই ছোট ছোট বিষয় লইয়া মানুষকে জব্দ করিতে চায়, ভাবে না সে নিজেই ইহাতে কত ছোট হইয়া পড়ে।

সে দিন সতীর হাতে হলুদের দাগ লাগিয়াছিল, শুভ্রা গোপনে রাষ্ট্র করিয়া দিল সতী তাহাদের বাড়ীতে পয়সা লইয়া মসলা পিষিয়া দেয়, তাহাতেই তাহার স্কুলের বেতন দেওয়া হয়।

কথাটা সতীর কানে উঠিয়াছিল তাই সে একটু হাসিয়া বলিয়াছিল, "সেটা তো অপমানের কথা নয়। স্কুলের বেতন যোগাতে যদি আমার কারও বাড়ী বাসন মেজেও দিয়ে আসতে হয় আমি তাতেও রাজি আছি।"

সে দিন স্কুলে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। ম্যাট্রিক একজামিন সোমবার হইতে আরম্ভ হইবে, প্রশ্ন পত্রগুলি হেডমিষ্ট্রেসের অফিস রুমে ছিল, সেগুলি হঠাৎ কোথায় উধাও হইয়া গেল।

মিস সোম সকল মেয়েকে হলে ডাকাইয়া মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া আদায় করিবার চেষ্টা করিলেন, অবশেষে অনেক ভয় দেখাইলেন কিন্তু কেহই স্বীকার করিল না।

প্রকৃত অপরাধিনীকে না পাইয়া মিস সোম খুব বেশী রকমই রাগিয়া উঠিলেন।

প্রশ্নপত্র মিলিল পরদিন—তাঁহারই অফিস রুমে ডেস্কের উপর।

কে এ ঘরে আসিয়াছিল মিস সোম সেই তদন্ত করিতে লাগিলেন।

কোন মেয়েই একটা কথা বলিল না, কেবল শুভ্রা ও আর কয়েকটী মেয়ে গোপনে মিস সোমকে জানাইল—তাহারা আজ সতীকে ওঘরে যাইতে দেখিয়াছিল; কিন্তু সতীই যে প্রশ্নপত্র চুরি করিয়াছিল সে কথা তাহারা জানে না।

মিস সোম ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন।

সকল মেয়েকে বিদায় দিয়া তিনি সতীকে নিজের অফিস রুমে লইয়া গেলেন।

রুঢ় স্বরেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিই কোশ্চেন পেপার চুরি করেছিলে, জান না এ কাজটা কি রকম হয়েছে? আমি তোমায় খুব বিশ্বাস করি বলেই তোমায় এ ঘরে ঢুকবার অনুমতি দিয়েছিলাম, তাতে তুমি যে এমনই একটা কাণ্ড করবে তা তো আমি জানতুম না।"

ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

সতী যেন আকাশ হইতে পড়িল—"এ কি কথা বল্‌ছেন আপনি, আমি প্রশ্নপত্র চুরি করেছিলুম? আমি গরীব বলেই আপনি আমার মাথায় এই কলঙ্কের বোঝা চাপাতে পারলেন, যদি—"

মিস সোম গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "চুপ কর, বেশী কথা বলো না। জেনো, এ অপরাধে আমি তোমায় কখনই ক্ষমা করব না, আমি তোমার রাষ্টিকেট করব।"

সতী নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার দুইটী চোখ দিয়া নিঃশব্দে অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। যদি সে অপরাধ করিত তাহার এত দুঃখ কষ্ট হইত না, কিন্তু বিনা দোষে এতবড় শাস্তি তাহাকে মাথায় তুলিয়া লইতে হইবে এই তাহার বড় কষ্ট।

মিস সোম একটা ঘণ্টা বাজাইতেই তাঁহার আর্দ্দালি আসিয়া সেলাম দিল। মিস্ সোম তাহাকে বলিলেন "সব টিচারদের বলে দাও মেয়েদের নিয়ে হলে যেতে, আমি যাচ্ছি।"

সতীর পানে ফিরিয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে হলে এসো, সেখানে এর বিচার হবে।"

সতী নড়িল না।

কর্কশ কণ্ঠে মিস্ সোম বলিলেন, "এসো বলছি, না হলে আমি তোমায় জোর করে নিয়ে যেতে বাধ্য হব।"

নিরপরাধিনী হইয়াও কাঁদিতে কাঁদিতে সতী তাঁহার সহিত হলে চলিল।

প্রকাণ্ড বড় হল মেয়েতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, এতটুকু স্থান খালি নাই। শুভ্রার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল, চক্ষু দৃপ্ত, সে তাহার সঙ্গিনীর কানে কানে কি বলিয়া হাসিতেছিল।

মিস সোম গম্ভীর কণ্ঠে অপরাধিনীর দোষ কীর্ত্তন করিয়া ইহার জন্য কি শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে তাহাই জানিতে চাহিলেন।

মেয়েদের মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জন ধ্বনি উঠিল।

"ম্যাডাম—"

ছোট মেয়েটীর আহ্বানে মিস সোম তাহার পানে তাকাইলেন।

মেয়েটী ভয় পাইল না, সোজা তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি সত্যিকথা বলছি, কোশ্চেন পেপার চুরি করেছিলুম আমি,—শুভ্রাদি আমায় দিয়ে এই কাজ করিয়েছিলেন। উনিও একা ছিলেন না, কনিকাদি, ক্ষমাদি, গীতাদি, এঁরাও সব ছিলেন। ওঁরা নিজেরা পেপার চুরি করতে পারেন নি, আমি ছোট বলে আমায় দিয়ে এ কাজ করিয়েছিলেন আজ আবার আমিই সে পেপারগুলো আপনার ডেস্কের ওপর রেখে এসেছিলুম।"

মুহূর্ত্তে কি যে ব্যাপার ঘটিয়া গেল তাহা বলা যায় না। মেয়েরা আসিয়া সতীকে ঘেরিয়া ফেলিল, তাহাদের আনন্দোচ্চারিত কণ্ঠস্বরে হল পূর্ণ করিয়া ফেলিল।

এই গোলযোগে শুভ্রা ও আর কয়েকটী মেয়ে কোন খান দিয়া সরিয়া পড়িল তাহা কেহই দেখিতে পাইল না।

মিস্ সোম লজ্জিতভাবে সতীকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "আমায় ক্ষমা কর সতী, আমি কথাটা শুনেই বিশ্বাস করেছিলুম, ভাবি নি এ কথাটা সত্য হভে পারে কিনা!"

সতীর চোখদিয়া আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

[৪]

বহুকাল কাটিয়া গেছে।

সতী দিনাজপুর গার্লস স্কুলে হেডমিষ্ট্রেসের কাজ লইয়া আসিয়াছে।

প্রশংসার সহিত সে একে একে আই, এ, ; বি, এ, ; এম, এ পাশ করিয়াছিল। সকলের কাছে অজস্র প্রশংসা পাইয়া এবং উচ্চপদ লাভ করিয়া আজও তাহার প্রকৃতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই।

গম্ভীর সে কোনকালেই ছিল না, এখনও হইতে পারে নাই। স্কুলের মেয়েদের সে বড় ভালবাসে, মেয়েরাও তাহাকে দিদিমণি বলিতে অজ্ঞান হয়।

পিতা তাহার নিকটেই আছেন। সতী তাঁহাকে আর কাজ করিতে দেয় নাই। তাঁহার কাছে আজও সে সেই ছোট মেয়েটী, আজও ছুটির দিনে সে পিতার মাথার পাকাচুল তুলিয়া দেয়, ছোট শিশুর মত বৃদ্ধ পিতাকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখে। আজও সে পিতার ইচ্ছামত খাবার নিজের হাতে তৈয়ারী করিয়া তাঁহাকে খাওয়ায়, খাওয়াইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করে।

স্কুলে মেয়ের সংখ্যা বড় কম নয়। ইহাদের মধ্যে একটী মেয়ে বিশেষভাবে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

আশ্চর্য্য মানুষের মতও মানুষ দেখিতে হয়! এই মেয়েটীকে দেখিতে ঠিক শুভ্রারই মত, ইহার বয়সে শুভ্রা ঠিক এইরূপই ছিল, এমন কি কথার সুরটা পর্য্যন্ত এক রকম।

পরিচয় লইয়া জানিয়াছিল ইহার পিতার নাম সুরেশ মিত্র, এখানকার ফৌজদারী কোর্টের একজন কেরাণী মাত্র। বেতন যৎসামান্য পান—তাহাতে মেয়েটীর বেতনটা কোনরকমে দিতে পারেন, বই কেনা হইয়া উঠে না। মেয়েটীর পড়ার অত্যন্ত ঝোঁক বলিয়া সে অপর মেয়েদের নিকট হইতে বই চাহিয়া লইয়া কোনক্রমে পড়া চালায়।

সামান্য কাপড় জামা পরিয়া সে স্কুলে আসিত, ধনী মেয়েদের নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিত, দারিদ্র্য তাহাকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছিল।

সতী ক্লাসে আসিয়া ইহারই পানে তাকাইয়া থাকিত, পিছনে ফেলিয়া আসা হাজার দিনের স্মৃতি তাহার মনে জাগিয়া উঠিত, সে বর্ত্তমান ভুলিয়া যাইত।

সেদিন মেয়েদের প্রাইজ হইবে।

প্রত্যেক মেয়ের মা বোনদের নিমন্ত্রন করা হইয়াছিল, ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী স্বয়ং প্রাইজ বিতরণ করিবেন। মেয়েদের অভিভাবিকাগণ সকলেই আসিলেন।

হেড্‌মিষ্ট্রেসের অমায়িক স্বভাবের কথা সকলেই জানিতেন, সেইজন্যই সকলে তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

সতী অমায়িক আচরণে সকলকেই পরিতুষ্ট করিল।

একটী মেয়ে দূরে সরিয়াছিল, সে চোখের উপর পর্য্যন্ত অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়াছিল। সকলেই সতীর সহিত আলাপ পরিচয় করিল, কিন্তু সে মেয়েটী অগ্রসর হইল না, বরং যেন পিছাইয়া যাইতে লাগিল।

সতী যখন নিজেই তাহার নিকটস্থ হইল তখন সে যেন অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল।

বিস্মিত নয়নে খানিক তাহাব মুখের পানে তাকাইয়া সতী ডাকিল—"শুভ্রা—"

শুভ্রা মুখ ফিরাইল, পিছাইয়া যাইবার উদ্যোগ করিল, কিন্তু সতী তাহাকে ছাড়িল না।

সতী বলিল, "যেও না, অনেক কাল বাদে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে, আমার ঘরে এসো।"

সে শুভ্রার হাত ধরিয়া তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের ঘরে টানিয়া আনিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল, বলিল, "বসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

শুভ্রা বসিল, তাহার মুখখানা তখন শুভ্র হইয়া উঠিয়াছে।

বায়স্কোপের ছবির মতই পুরান দিনগুলা একসঙ্গে দু'জনের মনেই ভাসিয়া উঠিতেছিল।

সেই শুভ্রা আর সেই সতী। ধনী কন্যা শুভ্রা সেদিন দরিদ্র কন্যা সতীকে আন্তরিক ঘৃণা করিত, তাহার সহিত কোনদিন সে কথা বলে নাই। স্কুলে এই দরিদ্র কন্যার প্রতিষ্ঠা দেখিয়া সে কি হীন বৃত্তি পরিচালিত হইয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতে গিয়াছিল তাহাই ভাবিয়া সে মুখ তুলিতে পারিতেছিল না।

সতী দেখিতেছিল শুভ্রার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেই শুভ্রা—যে জুতা পায়ে না দিয়া এক পা চলিতে পারিত না, তাহার পা আজ খালি। সে বহুমূল্য ব্লাউজ শাড়ি আজ আর তাহার পরিধানে নাই, সামান্য শাড়ি সেমিজ তাহার পরিধানে রহিয়াছে। হাতে দু'গাছি শাঁখা মাত্র, সোনার চিহ্নমাত্র তাহার দেহে নাই।

"শুভ্রা—"

হঠাৎ শুভ্রা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফেলিল, তাহার করাঙ্গুলীর ফাঁক দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝড়িয়া পড়িতে লাগিল।

ক্লিষ্টকণ্ঠে সতী বলিল, "বুঝেছি, অতীতের কথা তোমার মনে হয়েছে; কিন্তু সে কথা আজ ভুলে যাও শুভ্রা।"

শুভ্রা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "ভুল্‌তে বল্‌ছ, কিন্তু আমি সে কথা ভুল্‌তে পারি নি সতী, আমার দিনরাত সেই কথাই মনে হয়। মনে হয় নির্দ্দোষীর ওপর যে কলঙ্কের ছাপ এঁকে দিতে গিয়েছিলুম সেই পাপেই আমার এই দুর্দ্দশা হয়েছে। সেদিন দরিদ্র বলে ধনীর মেয়ে আমি ঘৃণা করে তোমার সঙ্গে কথাও বলি নি, আজ সেই পাপে আমার ছেলেমেয়ে একখানা ভাল কাপড় পায় না, স্কুলের বই কিনবার পয়সা পায় না !"

তাহার চোখদিয়া আবার ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

শুভ্রার সংসারের কথা সতী সবই শুনিতে পাইল। পিতামাতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পিত্রালয়ের সহিত তাহার সকল সম্পর্ক ফুরাইয়া গিয়াছে। দরিদ্র স্বামী মাত্র ত্রিশ টাকা বেতন পান, তিনটী সন্তানকে তাহারা পেট ভরিয়া খাওয়াইতে পারে না, তাহাদের অদম্য ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও লেখাপড়া শিখান যায় না।

সতী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল।

"তোমার চিত্রাকে আমায় দাও না শুভ্রা, ওর ভার আমি নেব, ওকে আমি মানুষ করে তুল্‌ব। আর একটা কথা—তোমার আর দুটি সন্তানের জন্যে আমি তোমায় মাসে কুড়ি টাকা করে দেব, ওতে ওদের লেখা পড়া শেখা, পোষাক পরিচ্ছদের খরচ চলে যাবে, কেবলমাত্র খাওয়ার খরচের ভারটা তোমাদের ওপর থাক্‌। কি বল—রাজি হবে তো—?"

শুভ্রা বিস্ফারিত নেত্রে সতীর পানে তাকাইয়া রহিল, সে যেন এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

সতী বলিল, "বল—তোমার মত কি ?"

শুভ্রা দুই হাতে সতীর দুইহাত চাপিয়া ধরিল, চোখের জলে সতীর হাত দু'খানা ভিজিয়া উঠিল। সতীর প্রশ্নের উত্তর শুভ্রার চোখের জলে মিলিয়া গেল।

সতী শুভ্রাকে আলিঙ্গন করিল, শুভ্রা তাহার স্কন্ধের উপর মুখ রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আজ যেখানে তাহাদের মিলন হইল সেইটাই মহামিলনের ক্ষেত্র, এখানে উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র ভেদাভেদ নাই।—

আলোকের কথা।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ।

রবির আলোক মোরে কোন্ কথা বলে ?
যখন দুপুর বেলা ধরার আঁচলে
শুয়ে থাকে আন্‌মনে ? পাতার দোলায়
দোল খায়, থেকে থেকে আঙুল বোলায়
নারিকেল পাতে, শিহরি সে উঠে কেঁপে কেঁপে ;
আলো, তবু ছায়ার মতন যায় ব্যেপে
তরুতলে, চুমো খায় ঝরা শিউলিরে,
গাঁদা ফুলে টেনে দেয় রংএর তুলিরে
গাঢ় কমলায়, আর সোণালি হলুদে ;
পাতলা পাঁপড়ি জবা ছিল চোখ্ মুদে,
রোদের পরশে জেগে রাঙা সে সিঁদূর
বাদামের পাতা চায় যেতে বহুদূর,
আজি ঝরিবার দিন, তবু জোর করে,
খেরো রাঁঙা জামা তার, আছে কিন্তু পরে'
গেরুয়া হয়নি পরা, নিতে হয় সাথে
যত ছিল রং তার পরাণের পাতে।
দেবদারু বেদিকায় কিযে মন্ত্র পড়ে,
মনে মনে বার বার সারাদিন ধরে,
সবুজ ঘোচে না তার, ঝরে যদি যায়
গাঢ় রং ফিঁকে হয়ে আসে পুনরায়।
দেখি আর মনে শুধু জাগে সেই বাণী
"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি" *
সেইমত ফিরে আমি পাব বার বার,
এই জীবনের চির তারুণ্য আমার।
যেথা যাই নব হ'তে নবতর লোকে,
যখনি খুলিবে ঊষা তরুণ দ্যুলোকে॥

---

* পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নব বস্ত্রের মতন।

রাণী রাসমণি

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

রাসমণির কথা অনেকেই তোমরা জানোনা কিন্তু ইনি ছিলেন বাঙলার একজন মহীয়সী মেয়ে। ইনি কোন দেশের রাণী ছিলেন না, যাঁদের হৃদয়ে ইনি রাজত্ব কোরতেন, তারাই এঁকে 'রাণী' নাম দিয়েছিল—কোনো রাজত্বের রাণী হবার চেয়ে এর গৌরব অনেক বেশী। বাঙলার এই শক্তিমতী ও বুদ্ধিমতী প্রাতঃস্মরণীয়া মেয়েটি ভারত সরকারের মতো প্রবল প্রতিপক্ষকেও ভাবিয়ে তুলেছিলেন।

রাসমণির বাবা হালিশহরের একটি গ্রামের একজন গরীব কৈবর্ত্ত ছিলেন। সেখানেই তাঁর জন্ম হয়। এগার বছর বয়সে কল্‌কাতার প্রীতিরাম মাড়ের মেজছেলে রাজ-চন্দ্রের সঙ্গে রাসমণির বিয়ে হয়। রাসমণির অসামান্য রূপ ছিল।

আঠারোশ সতের খৃষ্টাব্দে প্রীতিরাম লোকান্তরিত হোলে, রাজচন্দ্রই তাঁর সব বিষয়ের ভার পান। রাসমণি স্বামীর সহায়তায় লেখাপড়া কিছু শিখেছিলেন এবং তাঁর ধারালো বুদ্ধি ছিল ব'লে, রাজচন্দ্র সব কাজেই রাসমণির পরামর্শ চাইতেন। আঠারোশ ছত্রিশ খৃষ্টাব্দে রাজচন্দ্রও মারা গেলেন। তখন সম্পত্তির সমস্ত ভার রসমণিকেই নিতে হোলো।

প্রতি বছর দুর্গাপূজার সময় রাসমণির বাড়ীর সাম্‌নের রাস্তায় খুব বাজনা বাজ্‌তো, সাহেবেরা তাতে অতিষ্ঠ হোয়ে উঠে সরকারী কোতোয়ালের সাহায্যে তা বন্ধ কোরে দিয়েছেলেন। এতে রাসমণি খুব রেগে গেলেন এবং তাঁর অধিকারে যে সব রাস্তা আছে, সে সব রাস্তায় সাহেবেরা যেতে পারবেন না এই রকম হুকুম দিলেন। সরকার বাহাদুর শেষে কিন্তু রাসমণির সঙ্গে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিলেন, রাসমণিও তাঁর আদেশ রদ্ কোর্‌লেন। সবচেয়ে বেশী গণ্ডগোল হোয়েছিল গঙ্গায় মাছধরা নিয়ে। গঙ্গায় মাছ ধরলে জেলেদের ট্যাক্স্ দিতে হবে, সরকার একবার এমন স্থির করেন। জেলেরা কাতর হোয়ে, রাসমণির কাছে এসে কেঁদে প'ড়্‌লো। রাসমণির অনুরোধে গভর্ণমেণ্ট কর বন্ধ কোর্‌তে স্বীকৃত না হোতে, রাসমণি নিজে দশহাজার টাকা দিয়ে গঙ্গায় মাছ ধর্‌বার অধিকার লাভ করেন। রাসমণি বয়াগুলিকে লোহার শিকল দিয়ে যুক্ত ক'রে, নদীর মুখ বন্ধ ক'রে দিলেন। এতে নৌকো জাহাজের চলাচল আট্‌কে গেল। বণিকরা এ সম্বন্ধে সরকার বাহাদুরকে জানালেন

এবং রাসমণিকে প্রশ্ন করা হোলো তিনি এই কাজ কেন করেছেন। রাসমণি উত্তর দিলেন তিনি দশহাজার টাকায় নদী জমা নিয়েছেন মাছ ধর্‌বার জন্যে। নৌকো ষ্টীমার চলাচল কোর্‌লে, মাছ পালিয়ে যাবে। সুতরাং তিনি নদীমুখ বন্ধ রেখেছেন আর রাখ্‌বেন। গভর্ণমেণ্ট অবশেষে জেলেদের ট্যাকস্‌ তুলে দিলেন।

হৃদয়ের গুণও রাসমণির ছিল অসাধারণ। রাসমণি একবার কাশী যাবার মন করেন। তখন ভারতবর্ষে রেল হয়নি, তাঁর যাবার জন্যে পঁচিশ ত্রিশখানা নৌকোর বন্দোবস্ত হোলো। অনেক টাকাকড়ি আর রাশিকৃত দরকারী জিনিসপত্র নিয়ে রাসমণি যেই কাশী যাবার জন্য তৈরি হোলেন অম্‌নি শুন্‌লেন যে বাঙ্‌লাদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, হাজার হাজার লোক অকালে প্রাণ হারাচ্ছে।

রাসমণি তখনি তীর্থে যাবার ইচ্ছা ত্যাগ কর্‌লেন এবং তাঁর কর্ম্মচারীদের ডেকে বল্‌লেন যে তাঁর তীর্থে যাওয়া হোলে যে টাকাটা খরচ হোতো তা' যারা খেতে পাচ্ছেনা তাদের দেওয়া হোক্‌। বল্‌লেন 'ওতেই আমার তীর্থে যাবার পুণ্যলাভ হবে'।

এমনই মহিমান্বিতা মেয়ে ছিলেন রাসমণি। গরীবের ঘরে জন্মেছিলেন, অনেক অর্থের অধিকারিণী হোয়েও গরীবদের কখনো ভোলেননি। তারাই শ্রদ্ধা প্রেমে কৃতজ্ঞতায় তাঁকে 'রাণী রাসমণি' আখ্যা দিয়েছিল—সে নাম চিরদিনই বজায় থাক্‌বে।

দক্ষিণেশ্বরের দেবালয় ও অতিথিশালা রাসমণির পবিত্র হৃদয়ের আর প্রচুর দানের অন্যতম পরিচয়। তিনটি মেয়ে রেখে, আঠারোশ একষট্টি খৃষ্টাব্দে, বাঙ্‌লার এই দীপ্তিমতী মেয়ে রাণী রাসমণি অমৃতলোকে চ'লে যান।

বন-ভোজন

শ্রীদীপ্তি দেবী বি, এ, বি, টি,

ভাই রাণী,

এখন তুই কেমন আছিস্ ভাই? এবার ছুটি ফুরোলে স্কুলে আস্‌ছিস্ তো? তোকে না হ'লে মোটে জমে না ভাই। কমলা আর আমি তোর অভাবে হয়ে রয়েছি যেন ডাঙ্গার মাছ। কোন কাজে মন লাগে না। কেবল বোসে বোসে পুরনো দিনের গল্প করে সময় কাটাই। সে সব দিনের কথা মনে পড়ে? এখন আর ভাই দুষ্টুমি কর্‌বার উপায় নেই, ম্যাট্রিক ক্লাশের মেয়ে, "সিনিয়র গার্লস," স্কুলের সুনাম নির্ভর করে যে আমাদের উপর! এই এক জ্বালা কিন্তু, চিরকাল থার্ড, ফোর্থ ক্লাসের মেয়ে হয়ে থাকা যায় তো বেশ হয় না? সত্যি কি সুখেরই না সে দিন গুলো ছিল।

আচ্ছা ভাই, সেই মিস্ বেল্‌কে মনে পড়ে? সেই সে অনেক আগে আমাদের মেট্রণ ছিল? বাবা, রাত্রে সে কি কাণ্ডটাই না করত! কাশি হয়েছে রমার, সে রাত্রে খক্ খক্ করে কাশে, মিস্ বেল অমনি ঘুমের ঘোরে বেরিয়ে এসে বিভাকে খুব কোরে মালিশ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে গেল, এদিকে রমার কাশি থামে না, বুড়ী তো চটেই খুন, এত কোরে মালিশ করা হ'ল তবুও মেয়েটার কাশি থামে না? নিশ্চয় সে ইচ্ছা কোরে সবাইকে জ্বালাবার জন্যে ঘ্যাঙ্গর ঘ্যাঙ্গর করে! কা'র হোল অসুখ আর চিকিৎসা হোল কার! আমরা সে রাত্রে কি ভীষণ হেসে ছিলাম মনে পড়ে কি? তার পর মনে পড়ে কৃপাকে? তার আবার ঘুমের ঘোরে চ্যাঁচান অভ্যাস ছিল, মিস বেল্ তার চীৎকার শুনে বেরিয়ে এসে কি রকম ধমক দিত? সে যেন কতই শুনছে? সত্যি বুড়ীটা ছিল একদম পাগল। কিন্তু তাকে লাগ্‌ত ভাল।

যা হোক্, সে সব পুরনো দিনের কথা শুনে আর কি হ'বে? উপস্থিত তোকে আমাদের বন-ভোজনের খবর দেব বলেই লিখ্‌তে বসেছি।

ছুটির আগের দিন আমাদের স্কুলে সকাল থেকে কি একটা কন্‌ফারেন্স বসবার কথা ছিল তাই সুহাসিনীদি' বোর্ডিংয়ের সব মেয়েদের সারাদিনের জন্যে বাইরে থাক্‌বার ব্যবস্থা করেছিলেন। অনেক মেয়েই বাড়ী চলে গিয়েছিল, কেবল আমরা যারা বিদেশের ছাত্রী আমাদেরই রেলওয়ে কনসেসনের জন্যে দুদিন থেকে যেতে হয়।

কমলা ও আমি তো ছিলামই এ ছাড়া জন দশ পনের মেয়ে হবে, আর টিচারদের মধ্যে ছিলেন অমিতাদি, সুষমাদি' আর মেট্রণ।

বন-ভোজনের যায়গাটায় কিন্তু ছিল একটু নূতনত্ব। সবাই তো যায়, হয় বোটানিকে না হয় তো চিড়িয়াখানায় আমরা কিন্তু গিয়াছিলাম সুন্দরবন অঞ্চলের একটি ছোট্ট গ্রামে। এখানে একটা স্কুল আছে, সেখানকার এক শিক্ষয়িত্রী নাকি সুহাসিনীদি'র পুরানো ছাত্রী তাই স্কুলবাড়ীতে ওঠ্‌বার বন্দোবস্ত হয়।

যাবার আগের দিন সে কি কাণ্ড! ভোরে যাওয়া হবে সেখানে পৌঁছতে—করতে দশটা বেজে যাবে তারপর রান্না বান্না করে খাওয়া সে এক বিভ্রাট! তাই সুহাসিনীদি বলেন যে সকালের আহারটা রুটি মাখন ইত্যাদি দিয়ে সেরে নিয়ে বিকেলের জলযোগের আয়োজনটা সেখানে গিয়ে করলেই ভাল হয়। তাই ঠিক হ'ল।

সারা সন্ধ্যে বাসন কোসন, টিফিন বাস্‌কেট, জলের কুঁজো, ইত্যাদি নিয়ে তো কাট্‌ল।

অমিতাদি'র হাতের রান্না খেয়েছিস্ তো? তাঁর উপর ভার পড়্‌ল জলখাবার তৈরীর। আমরা অবশ্য জোগাড় দিবার জন্য রইলাম। ঠিক হ'ল লুচি, বেগুন ভাজা, আলুর দম, মাংস আর একটা চাট্‌নি হ'বে। দৈ মিষ্টি ফরমাস দিলেই চল্‌বে। জলযোগই বটে!

সকালের আহারের বন্দোবস্তটা রইল মেট্রণের হাতে। শুন্‌লাম বুড়ীটা নাকি সারারাত ধরে স্যাণ্ডুইচ তৈরী করেছিল। তা বুড়ী মন্দ খাবারের আয়োজন করে নি। দু'তিন রকম স্যাণ্ডুইচ, চার পাঁচ রকম ফার্পোর বাড়ীর কেক, এ ছাড়া ছিল সঙ্গে একঝুড়ি কমলা নেবু।

যাবার আনন্দে আমরা সে রাত্রে প্রায় কেহই ঘুমুতে পারিনি। রাত দুটো থেকেই কলরব সুরু হ'ল। অন্যদিন হ'লে মেট্রণটা তেড়ে আস্‌ত কিন্তু আজ একটা বিশেষ দিন বলে কেউ কিছু বল্লে না। কলে তখনও জল আসে নি আমরা সেই ঠাণ্ডা বাসি জলেই স্নান সেরে নিলাম, পাছে দেরী হয়।

নীলাম্বরী শাড়ীখানা তাড়াতাড়ি জড়িয়ে নিলাম। বাইরে গেলে শাদা শাড়ীগুলো কিরকম ময়লা হয়ে যায় না ভাই? রমার কিন্তু কালো শাড়ী পছন্দ হ'ল না, সেই ফুলদার ও ঢাকাই শাড়ী না পোরে ছাড়ল না; সুষমাদি যাচ্ছেন ও কি কালো ভূত সেজে যেতে পারে? তারপর জুতো পরা নিয়ে কি ন্যাকামি! স্যাণ্ডেল ছাড়া ও কিছু পায়ে দেবে না, যাচ্ছেন তো বাপু বন বাদারে অত সাজ গোজের কি দরকার? মখমলের চটি পায়ে কি হাঁটা

যায়? কত বোঝালাম, সেকি সোজা মেয়ে? শেষে অমিতাদি'র কাছ থেকে দুই ধমক খেয়ে সুর্‌সুর্‌ করে গিয়ে জুতো জোড়াটা পায়ে দিল।

দুটো বাস্‌ বোঝাই করে তো আমরা বেরলাম। ভোরবেলা ফুর্‌ ফুর্‌ করে হাওয়া দিচ্ছে, আর সে কি আরাম! সত্যি তুই যদি থাক্‌তিস্‌ তো আমাদের ষোলকলা পূর্ণ হ'ত!

বাস্‌ আমাদের কেওড়াপুকুর পর্য্যন্ত নিয়ে গেল, তারপর রাস্তা ভয়ানক খারাপ মোটর চলে না, সাল্‌তি ভিন্ন উপায় নেই। সাল্‌তিতে চড়া দূরের কথা জীবনে কখনও তা চোখেও দেখি নি, সহরে সহরে ঘুরেছি গ্রামের সঙ্গে পরিচয় বল্‌তে গেলে এই প্রথম। সাল্‌তি দেখে গোড়ায় কিন্তু বড় ভয় হয়েছিল, এইতো সামান্য নারকোল গাছের ডোঙ্গা, এই বিশমণি ভার তাতে চাপ্‌লে খালের জলে সে যে কোথায় তলিয়ে যাবে তার ঠিক কি?

দুটো নৌকো ভাড়া নেওয়া হয়েছিল, একটাতে হাঁড়ি কুঁড়ি, খাবার দাবার ইত্যাদি সব নিয়ে মেট্রণ চাপলেন। সুট্‌কির কোন বিষয় কোন হ্যাঁত ক্যাঁত নেই, দিব্যি আরামে একটা মোড়ায় চেপে বোসে চশ্‌মা জোড়া না নাকের উপর চড়িয়ে দিয়ে কোডাক দিয়ে ছবি তুল্‌তে সুরু করে দিল। ঐ তো রস-কস-হীন চেহারা, ওর মধ্যে যে কবিত্বের লেশটুকুও আছে বলে তো মনে হ'ত না, ওকেও যখন দেখ্‌লাম তন্ময় হয়ে গ্রামের স্নিগ্ধ রূপের দিকে চেয়ে থাক্‌তে তখন বেশ বুঝ্‌লাম যে আমাদের রাণী থাক্‌লে রবীন্দ্রনাথের একটি ফিমেল এডিসনের সৃষ্টি হ'ত।

অন্য সাল্‌তিটাতে গোটা দশেক মেয়ে নিয়ে সুষমাদি' চড়লেন, অবশ্য রমা তাতে গেল; কিন্তু সে কত কাণ্ড কোরে। এক পা এগোয় তো দু'পা পেছোয়। শেষে অমিতাদি' যখন রেগে উঠ্‌লেন তখন মৃণালের হাত ধরে বলিদানের পাঁটার মত কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে সে গিয়ে বস্‌ল নৌকোতে। রমা এক অমিতাদির কাছেই থাকে জব্দ। যা হোক আমরা ক'জন খানিকটা রাস্তা হেঁটে যাওয়াই স্থির কর্‌লাম। একটা ছোট বাঁশের সেতু পার হয়ে খালের ধারে গ্রামের একটি ছোট মেঠো পথ ধরে আমরা এগিয়ে পড়্‌লাম। ভোরের ঝল্‌মলে আলোতে চারিদিক্‌ উজ্জ্বল, পাখীগুলোও এ অবসরে গান ধর্‌লে, কত রং বেরঙ্গের পাখী—ইট কাঠের মধ্যে এরা যে কোথায় লুকিয়ে থাকে তা কে জানে? তারপর সবুজ ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে ছোট্ট নীল ফুল গুলো কি সুন্দরই না দেখাচ্ছিল! সত্যি এতদিনে রবিবাবুর গানের মর্ম্ম বুঝ্‌লাম—'গ্রামছাড়া ঐ রাঙ্গামাটির পথ, আমার মন ভুলায় রে'—

রাস্তায় যেতে গ্রামের মেয়ে বধূ অনেকেরই সঙ্গে দেখা হ'ল, তারা বেশীর ভাগ সব চলেছিল হাটে মাছ বেচ্‌তে। অবাক হয়ে আমাদের দিকে তারা দেখ্‌তে লাগ্‌ল চেয়ে। সহরের লোকদের তো বড় একটা দেখ্‌তে পায় না! আমরা যেচে তাদের সঙ্গে

আলাপ কর্‌লাম। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিস্তর লজঞ্জুস চকোলেট খাওয়ালাম।

খানিক পর সুষমাদি' মেয়েদের নিয়ে হাঁট্‌তে চাইলেন, আমরা তখন সাল্‌তিতে উঠ্‌লাম। প্রথম চড়্‌তে কিন্তু ভয় করছিল, শরীরের ভারটা তো কিছু কম নয়! তবে অমিতাদি' এ সব ভয় টয় মোটে পছন্দ করেন না তাই মুখটি বুজে জয় মা কালী বলে নেমে পড়্‌লাম। বাবাঃ, আচ্ছা যা হোক নৌকোর ছিরি, একটু নড়েছ তো অমনি ডোঙ্গা কাত হয়ে গেল, এমন কি একটু প্রাণ খুলে হাসবারও যো নেই, একটু খুক্ কর্ত্তে না করতে মাঝি হেঁকে বলে—"হাসবেন না, নৌকো ডুল্‌বে।" সর্ব্বনেশে ব্যাপার! কিন্তু তবুও বেশ ভাল লাগ্‌ছিল। খালের জায়গায় জায়গায় কচুরী-পানায় ভরে এসেছিল, আমরা হাত বাড়িয়ে কত ফুল তুল্‌লাম, শেযে বেলা দশটায় এসে পৌঁছলাম আমাদের নির্দ্দিষ্ট গ্রামটিতে। খানিক দূর গিয়ে স্কুলটা পাওয়া গেল, ছোট মাটির বাড়ী —বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। চারিপাশে গাছপালা দিয়ে ঢাকা, যেন পুরাকালের কোন মুনিঋষির আশ্রম। বাড়ীটির সাম্‌নে খানিকটা খোলা যায়গা সেখানেই আমরা আশ্রয় নিলাম। অল্প দূরেই একটা ছোট কুঁড়ে ঘর। দেখাচ্ছিল বেশ। সেখানে গিয়ে দেখি বাড়ীর গিন্নী দাওয়ায় বসে খুন্তি নেড়ে কি একটা তরকারী রাঁধছে আর তার ছোট মেয়েটি গরুর সেবায় ব্যস্ত। আমাদের দেখে তারা কি খুসি! যেন কোন্ রাণী মহারাণী তাদের ঘরে পায়ের ধূলো দিয়েছে! এই শান্ত সরল পল্লীবালাদের দেখে যে কি ভাল লাগ্‌ল তা বল্‌তে পারি না। যে ছোট মেয়েটি গরুকে জাব দিচ্ছিল সে তাড়াতাড়ি এক গাছা ঝাঁটা নিয়ে এসে আমাদের বস্‌বার জায়গাটা পরিস্কার করে দিল। আমরা তাকে কত মানা কর্‌লাম কিন্তু সে কিছুতেই শুন্‌ল না, অবশেযে তার কোঁচর ভরে ফল বেঁধে দিয়ে তবে তাকে যেতে দিলাম।

সত্যি অমিতাদি'র কি সুন্দর বন্দোবস্ত! তোয়ালে সাবান কিছুই তিনি আন্‌তে ভোলেন নি। হাত মুখ ধুয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে সবাই দলে দলে বেড়াতে বেরুলাম। কথা রইল ডুটোর মধ্যে সবাই দলে এসে জড়ো হব। কমলা আর আমি তো অম্‌নি দৌড় দিলাম, যেন খাঁচার পাখী ছাড়া পেল। ওঃ কী বিশ্রী পথ, উঁচু নীচু, আঁকা বাঁকা, চল্‌তে ভীষণ কষ্ট, কিন্তু দেখ্‌তে কি সুন্দর! খালের ধারে গাছতলায় ছায়ায় ব'সে ডুজনে কত গল্পই না করলাম! সেই সময় তোকে যে কি রকম মনে পড়্‌ছিল তা' বল্‌তে পারি না। যা হোক ডুটোর কাছাকাছি উঠে পড়্‌লাম, যেতে যেতে দেখি এক বাড়ীর বাগান আলো করে রয়েছে রাশীকৃত গাঁদা ফুল। বড়ই লোভ হ'ল। কমলাকে তো জানিস্? সে অম্‌নি ডাক দিলে—"হ্যাঁগা এটা কাদের বাড়ী? আমাদের চারটি ফুল দেবে কি?"

কমলার গলা শুনে একটি ছোট্ট বৌ একগলা ঘোমটা টেনে বেরিয়ে এল, আমাদের দেখে একটু মুচ্‌কে হেসে অনেকগুলো ফুল তুলে দিলে। দুজনে মিলে বেশ কোরে ফুল দিয়ে খোঁপা সাজালাম, অমিতাদি' আমাদের কত ঠাট্টাই না কর্‌লেন।

যা হোক আর গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ালে তো চোল্‌বে না, এবার কাজে নাম্‌তে হ'ল কোমর বেঁধে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তরকারীগুলো সব হয়ে গেল, মাংস আগে থেকেই চড়ান হয়েছিল। আমরা মেয়েরা ক'জন সার বেঁধে বসে গেলাম, অমিতাদি' আর সুষমাদি' পরিবেশন কর্‌লেন। সত্যি অমিতাদি'র কি সুন্দর কাজ, আর কি চটপট্ করেই না তিনি সব সেরে ফেল্লেন। লোকে বলে পাশ করা মেয়েরা কাজের বাইরে, অমিতাদি'কে দেখলে এ কথা আর কেউ বল্‌তে পারত না।

এতক্ষণে সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল, এইবার বিদায়ের পালা। আমরা যে সহর থেকে এসেছি সে খবর বেতারে চারিদিকে প্রচার হয়ে গিয়েছিল তাই দলে দলে লোক এসেছিল আমাদের দেখ্‌তে। আর কেউ না হোক মেট্রণটি আমাদের দেখ্‌বার জিনিস বটে। ঐ তো ঢ্যেপ্‌সি, তার উপর ঠ্যাঙ্গের উপর ফ্রক পোরে কি বাহারই খোলে তা সেই জানে।

এর উপর লাফ দিয়ে সাল্‌তিতে চড়্‌তে গিয়ে কাদায় পা আট্‌কিয়ে সে কি এক কাণ্ড বাধালে। কেউ তাকে টেনে তুলতে পারে না, শেষে আমাদের সাল্‌তির যে মাঝি ছিল

সেই এসে তাকে হেঁচকে টেনে তুল্‌ল। কি জ্বালা বুড়োকে নিয়ে। হাঁসতেও পারি না, অমিতাদি' ছিলেন দাঁড়িয়ে সাম্‌নে। চার ইঞ্চি হীল পরবার কি দরকার তার? হনুমানের মত লম্ফ দেবারই বা কি ছিল প্রয়োজন? যতই গম্ভীর হবার চেষ্টা করি ততই কমলাটা কাণের কাছে খুঁক্ খুঁক্ করে। শেষে হাসি চাপ্‌তে গিয়ে বিষম লেগে কেশে মরি।

যা হোক কোন রকমে তো সাল্‌তিতে চোড়ে বসা হ'ল। ভোর বেলায় পল্লীশ্রী দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, এখন আবার নূতন করে মুগ্ধ হ'লাম। সূর্য্যদেব তখন পশ্চিমদিকে বেশ একটু হেলে পড়েছিলেন। ঠাণ্ডা বাতাসটিতে কেমন ছিল যেন একটা মাদকতা। সেদিন আবার পূর্ণিমা, দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেঘের আড়াল থেকে চাঁদের হাসি মুখটি বেরিয়ে পড়্‌ল। জ্যোৎস্নার আলোতে চারিদিক উজ্জ্বল। সেই শুভ্র, স্নিগ্ধ আলো খালের বুকে যে কি অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করেছিল তা আমার বর্ণনার বাইরে। এমন সাঁঝে নিতান্ত শুষ্ক প্রাণেও কবিত্ব ফোটে। কাগজে কলমে কিছুই ফোটাতে পারলাম না, তুলির সাহায্য যে নেব তারও উপায় নেই—একটা সোজা দাঁড়ি টান্‌তে যে আমার ঘাম ছুটে যায়! তবে এইটুকু স্বীকার করতেই হবে যে রহস্যময়ী প্রকৃতির সেই দিনের সান্ধ্য সৌন্দর্য্যটুকু আজও আমার মনে ছবিরই মত ফুটে আছে।

কবিত্বের মাত্রাটা একটু ছাড়িয়ে গেল না? মাপ করিস্ তোর সব খবর দিয়ে একটা খুব বড় চিঠি লিখিস্। আজ আসি ভাই। ভালবাসা জানিস্। ইতি।

তোর বন্ধু
আভা

ছোট তারা।

শ্রীনিরুপমা দেবী

তুমি লাজে নত
তুমি ভয়ে সারা
নভঃ সভাতলে
ওগো ছোট তারা!
দিঠি থরথর আঁখি মুদে আসে
লাজে জড় সড় থাক পাশে পাশে
আঁখি কোণে কোণে তব বাণী ভাসে
ক্ষণে বিকশিত
ক্ষণে দিশাহারা!

কত জ্ঞানী গুণী—
কত মহাঋষি
আছে সভা তলে
বসি দিবানিশি
তারা কত বাণী কহে কত সুরে
গানে ভুবন গগন কাঁপে সুরে
বাজে সে বাণী সুদূরে মহাদূরে
দ্যুলোকে ভূলোকে
দিশিদিশি!

তব আধ' বাণী—
বাধ' বাধ বাণী—
লাজে ক্ষণে ক্ষণে
মুখে ঢাক পাণি!

ওগো ছোট তারা, ওগো ছোট তারা
তব আলোর ঝরণা ক্ষীণধারা—
তব ব্যাকুল দৃষ্টি দিশাহারা
দ্বিধা শঙ্কিত—
ভীত হিয়াখানি !

কাণে কহ কথা—
প্রাণে কহ কথা
কহ গোপনে—
লজ্জাবতী লতা !
তব অকথিত বাণী লব গুণে
হৃদ্ স্পন্দনে মম গুণে গুণে
লব আমার হিয়ায় বুনে বুনে
সখি তোমার প্রাণের—
ব্যাকুলতা !
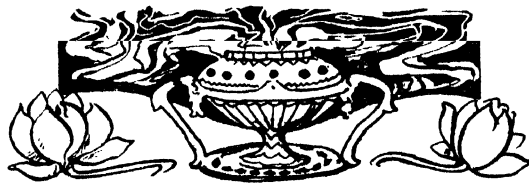
কৈশোর ও
য়ুরোপের অভিনব যুবপান্থনিবাস।

ডাঃ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র এম, বি

(১)

সে দিন কি আর ফিরে আস্‌বে—জীবনের সে কৈশোর—যখন বাল্য ও যৌবনের সন্ধিস্থলে, জীবন প্রভাতের পূর্ব্বাকাশ এক অপূর্ব্ব রক্তিমরাগে দীপ্ত ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল!

কিন্তু অন্তর্জীবনের মনোরাজ্যে ত চিরকৈশোর,—যেখানে নিত্যনবসত্তের অরুণরক্তিমরাগ মনকে উদ্দীপ্ত ও কৌতুহলী করে, তার নূতন নূতন স্বাদ ও সংস্পর্শ জীবনকে
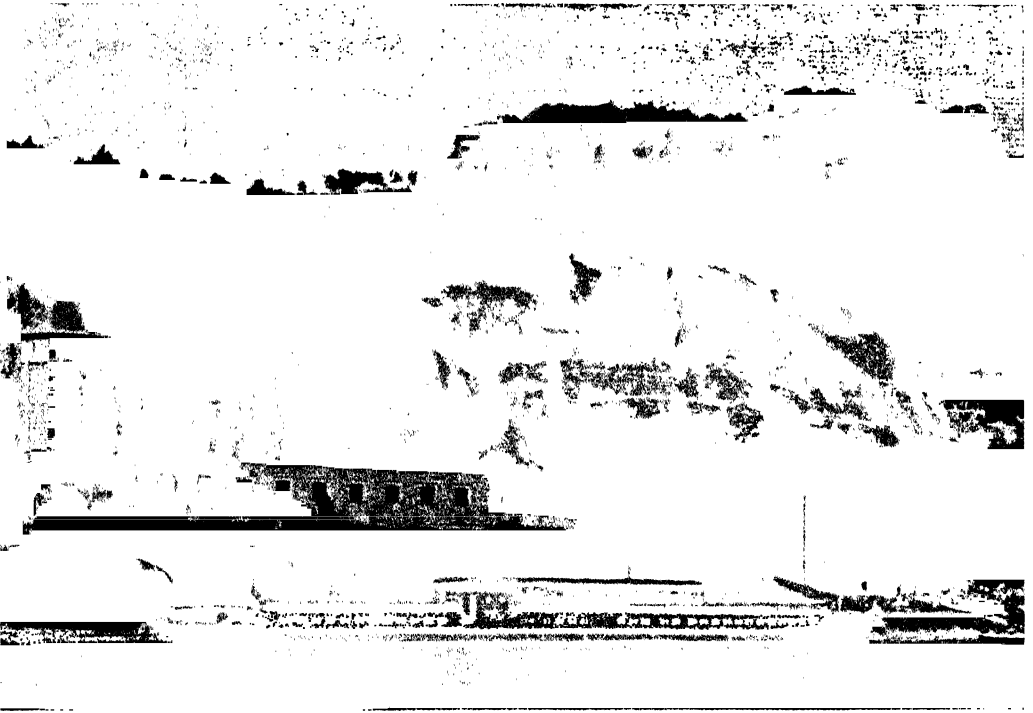
ভাসমান যুবপান্থ-নিবাস।

সরস ও অনুপ্রাণিত করে; সে কৈশোর যে অভিনব জ্ঞানের উন্মেষ! মনের সে কৈশোর ত আজিও যায় নাই!

বয়ঃ জীবনের সে কৈশোরস্মৃতি আজ কত সমুজ্জ্বল ও কি মধুর !

তার প্রতিচ্ছায়া দেখ্‌তে পাই প্রকৃতিতে—যখন রবির আলোক ও তাপস্পর্শে পৃথিবী সম্যক জেগে ওঠেনি; অরুণোদয়ের পূর্ব্বাভাসে পূর্ব্বদিকের গণ্ড আরক্তিম; বিহগকাকলিগীতে বায়ুমণ্ডল ঝঙ্কৃত; ঊষাসমীরণস্পর্শে ধরণী পুলকিত; পুষ্পকোরকের দলগুলি তখন ঈষন্মাত্র উন্মেষিত ও শিশিরকণায় স্নিগ্ধ শীতল—সকলের মধ্যেই যেন এক আশা উদ্যম তখনো অস্ফুট।

সে অনবদ্য উদ্যম, উৎসাহ ও আশা নিয়ে কৈশোরস্রোত মিলেছে যৌবনের ভরা গাঙ্গে।

সে প্রবাহে বালসুলভ চঞ্চল চপলতা নেই, আবার যৌবনের তরঙ্গোচ্ছ্বাসও নেই; এই দু'য়ের মধ্যে কৈশোর শান্ত, উজ্জ্বল, সুন্দর ও আবেগপূর্ণ।

মনের কৈশোরের এই কৌতূহলী জ্ঞানপিপাসা নিয়ে সম্প্রতি গিয়েছিলাম য়ুরোপে,—১৮ বৎসর পরে;—বিগত মহাযুদ্ধে ও মহাবিপ্লবের পর য়ুরোপ তার সমাজও জাতিকে কি করে' আবার নূতন করে ঢেলে' সাজ্‌ছে, প্রত্যক্ষ ভাবে তা' দেখবার জন্য।

অনেক কিছু দেখেছি, অনেক শিক্ষালাভ করেছি। তা'র মধ্যে একটা জিনিষ যা' দেখে বড় ভাল লেগেছে, তা'রই কথা সংক্ষেপে আজ আমার কিশোর-কিশোরী বন্ধুদের কাছে বল্‌ব।

সেটা হচ্ছে, য়ুরোপের যুবদের মধ্যে একটা আত্মপ্রত্যয় ভাব ও আত্মনির্ভরশীলতা দৃষ্টির উদারতা ও প্রসারতা, জীবনকে আরো বড় ও ব্যাপক করে' দেখা; নিজকে বহু পরিমাণে মুক্তিদান ও সেই মুক্তির মধ্যে স্ব-অধীন করে' জীবনকে আরো পূর্ণতর ভাবে পাওয়া;—এই সবের পরিচয়।
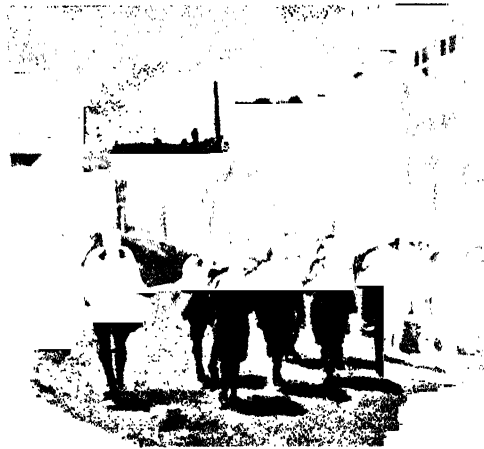
ভ্রাম্যমান কিশোর-কিশোরী-দল।

এই মনোভাবের একটা বিশেষ প্রকাশ দেখিতেছি, তরুণ তরুণীদের বেরিয়ে-পড়ায়—কাজ কর্ম্ম ও বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের ফাঁকে ফাঁকে 'লম্বা-পায়ে' দূর-দূরান্তে বেড়ানোয়।

মন এইরূপ মুক্ত ভাবাপন্ন হ'লে পর, সে-মন মাঝে মাঝে এমনি করে' বেড়িয়ে পড়তে না পারলে, নূতন সংস্পর্শের অনুপ্রেরণা ও অনুপ্রাণনা পায় না। সহরে ইটের পাঁজার মধ্যে, তার ধোঁয়া অন্ধকারের মধ্যে, তার কোলাহল, ব্যস্ততা ও অবকাশ-বিহীন ছুটোছুটির মধ্যে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে; গতানুগতিক দৈনন্দিন ব্যাপার দেহমনকে তেমন ধাক্কা দেয় না, সতেজ ও স্ফূর্ত্তিমান করে না। প্রাণ যা'র মধ্যে সজীব, সে-মানুষ তখন, মাঝে মাঝে যখনই সম্ভব হয়, বেরিয়ে পড়তে চায়—বদ্ধ বাতাসের ভিতর থেকে উন্মুক্ত আলো বাতাসের মধ্যে। অবারিত নীল শুভ্রমেঘমণ্ডিত আকাশ, উন্মুক্ত পবিত্র বাতাস, উজ্জ্বল রবি কিরণ, সুবিস্তীর্ণ খোলা মাঠের আন্দোলিত শ্যামল অঞ্চল, বন-উপবনের ছায়ামর্ম্মর, পর্ব্বত উপত্যকার জমাট তরঙ্গ-হিল্লোল, হ্রদের প্রশান্ত, নদীর আবেগময়, সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত শীতল স্পর্শের উত্তেজনা ও স্ফূর্ত্তি; আর এই সকলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে নানাদেশ ও জাতির তরুণ তরুণী ও পুরজনের সহিত আলাপ বন্ধুত্ব ও মুক্ত পবিত্র মনে সকলের মাঝে মেলামেশার আনন্দ ও অভিজ্ঞতা, গ্রামবাসীদের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়—এই সকলের ডাকে আজকের যুগের যুবজন সাড়া না দিয়ে পারে না—সে বেড়িয়ে পড়ে।

পায়ে মোটা জুতো পরণে সার্ট; গায়ে ঢিলে সার্ট' কাঁধে হয় তা ঝোলানো এক গীটার (Guitar) (বেহালার মতো); আর পিঠে বাঁধা তার রুক্স্যাক (Rucksack),—সৈনিকদের ন্যাপস্যাক (Knapsack) এর মতো—এর মধ্যে তার ব্যবহার্য্য যা' কিছু। এই হোল ছেলে মেয়েদের পোষাক।

তা'রা দলে দলে গীটার বাজিয়ে, গান গেয়ে, হাল্লাকরে বেরোয় সারাদিন টো-টো ট্রাম্প (tramp)—ক্লান্তিনেই—কারণ তাদের পথ চলতেই আনন্দ। মন স্ফূর্ত্তি-ভরা; একটা গানে আছে "আমরা আমাদের ব্যাগে যা কিছু একান্ত দরকারী তাতো ভরছিই; আর 'প্যাক' করছি তার সঙ্গে অফুরন্ত উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি।" এই হচ্ছে তাদের স্পিরিট বা উল্লসিত মনোভাব।

এরা যাবে দূর-দূরান্তে; রাত্রি বাস করবে কোথা? কখনো কখনো খোলা মাঠে রাত কাটিয়ে দেয় বটে; কিন্তু এদের জন্য এখন য়ুরোপময়—বিশেষ ভাবে জার্ম্মানীতে—পান্থশালা খোলা হয়েছে। একে জার্ম্মান ভাষায় বলে Jugendherberge বা Youth Hostel বা যুব পান্থনিবাস। প্রায় ৪০ লক্ষ তরুণ তরুণী এর মধ্যে এ সব হোষ্টেল থেকে গেছে।

মহাযুদ্ধ ও বিপ্লবের পর দেশময় এই সব যুবপান্থশালা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এক জার্ম্মানীতেই—যেখানে এই জাগরণ সবচেয়ে বেশী দেখা দিয়েছে—এর মধ্যে ২২০০টি এই রকম 'হোষ্টেল' খোলা হয়েছে। কোনো কোনোটায় ৫।৭ জনের বেশী থাকবার সুবিধা নেই; আবার বড়গুলিতে ৫০০।৭০০র উপরে ছেলে মেয়েরা থাকতে পারে। আমি একটী

দেখতে গিয়েছিলাম স্যাক্‌স্‌-সুইজারল্যাণ্ডে, হোন্‌স্টাইন ক্যাস্‌ল্‌এ। এই দুর্গ প্রাসাদ
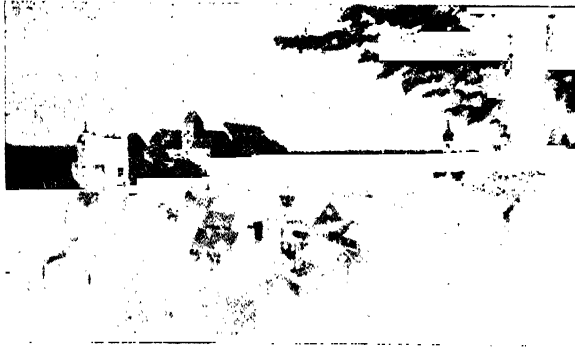
হোনষ্টাইন-ক্যাস্‌ল্‌
(বর্ত্তমানে যুব-পান্থনিবাস)

(ছবি দেখো) এক সময় এক দুঃস্থ রাজার ছিল ; পরে হয় এক কয়েদখানা ; এখন হয়েছে যুবদের আনন্দ উল্লাস ও স্ফূর্ত্তির স্থান। চারিদিকে কি অপরূপ দৃশ্য ! হাজারের উপর ছেলে মেয়েরা এখানে একবারে থাকতে পারে। প্রায় সব হোষ্টেলই ভাল ভাল রাস্তার কাছে, ষ্টেশনের অনতিদূরে। প্রত্যেকটী যারপর নাই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সুনিয়ন্ত্রিত। এদের অধ্যক্ষদের 'বাপ' ও 'মা' বলা হয়—তাঁরাও সেই ভাবে ছেলেমেয়েদের দেখেন, যত্ন করেন। যত্ন করার বিশেষ কিছু নেই—কারণ এই সব হোটেলের নিয়মই হচ্ছে যে যার নিজেরটী করবে আর যাবার সময় সব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে রেখে যাবেই। এর ব্যতিক্রম হয় না। য়ুরোপীয় জাতির

যুব পান্থ নিবাসের শয়ন কক্ষ
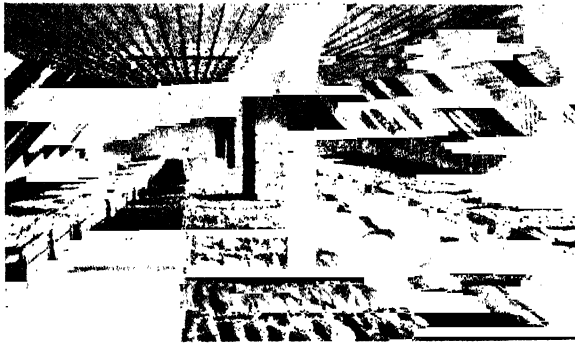
বিশেষ জার্ম্মাণ ও ইংরেজদের নিয়মানুবর্ত্তিতা (Discipline) আশ্চর্য্য। এখানকার জীবন যতদূর সম্ভব সাদাসিধে। ছোবড়ার গদী আঁটা সারি সারি একতালা বা দোতালা লোহার খাট

সাজানো আছে (ছবি দেখো) খুব সস্তা দামে বা নামমাত্র ভাড়ায় (আনা ছয়েক) ধোয়া পরিষ্কার শোবার থলি পাওয়া যায়, তার মধ্যে নিজকে ভরে শুয়ে পড়তে হয়। নিজেরা রান্না করে' খেতে পারে ; বা বড় বড় হোষ্টেলে চমৎকার খাবারের বন্দোবস্ত আছে, সব খাঁটী কিন্তু অত্যন্ত সাদাসিদে। ছেলেদের ও মেয়েদের শোবার ঘর বিভিন্ন বিভাগে ও স্বতন্ত্র। এগুলি "হোষ্টেল," 'হোটেল' নয়। সুতরাং tourist বা পর্য্যটকদের স্থান এখানে নেই। ইহা কেবল এই ভ্রাম্যমান যুবদের জন্যই। তাও যাদের বয়স বিশের নীচে, তাদেরই আগে স্থান দিতে হবে ও তাদের জন্য এক রাত্রির ভাড়া মাত্র।০ কি ।/০ ; স্কুলের ছাত্রদের মাত্র ৵০ কি ৵০ ; বয়স কুড়ির উপর হলে বছরে মাত্র ২৲ টাকা দিয়ে সভ্য (member) হ'তে হয়, ও ছোট ছেলেমেয়েদের সংস্থান হ'লে পর তবে তাদের স্থান দেওয়া হয়। গেলেই থাকতে পাওয়া যায় না, আগের থেকে নিজের ছবি ও নাম ধাম বয়স ইত্যাদি দিয়ে 'পাশ' নিতে হয় 'পাশে' সে ছবি আঁটা থাকে। একটী কেন্দ্রীয় আফিস (Westphalenএ) থেকে, যে কোনো হোষ্টেলের জন্য এই সব 'পাশ' বার করা হয়। পাশের জন্য আলাদা খরচ নেই। ছেলেমেয়েরা যৎসামান্য যা' দেয় এর থেকে অবশ্য এ সকল হোষ্টেলের খরচ কুলায় না। এ সব বাড়ী প্রায়ই ধনীদের বা বিবিধ লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ীদের দান। এই ব্যবস্থা চালাবার জন্য দেশময় লক্ষাধিক সভ্য আছেন ; ব্যক্তিগত ভাবে সাহায্যে বা সমিতি বা কারবার থেকে নিয়মিত অর্থানুকূল্যে এই সব হোষ্টেল চলে। যাঁরা দেখেছেন যে,

বর্ত্তমান কালের তরুণ তরুণীরা এই সব বাসস্থানের সাহায্যে তাদের শরীরের ও মনের কি রকম স্বাস্থ্যলাভ করছে, তাঁরা কিছু সাহায্য না করে যেন পারেন না। এক এক সময়ে এত

ছেলেমেয়ে এসে পড়ে যে স্থানে কুলায় না। তখন, আশেপাশের গ্রামবাসীদের সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে, তারা সাদরে নিজেদের কুটীরে স্থান দেয়! তখন এই ছেলে মেয়েদের পল্লীজীবনের সহিত আকাঙ্ক্ষিত পরিচয়ের ও ঘনিষ্ঠতার খুব সুযোগ ঘটে। এরূপ সংস্পর্শে উভয় পক্ষই উপকৃত হয়।

এখানে একদিকে যেমন চলাফেরার উৎফুল্ল স্বাধীনতা, অপরদিকে আবার নিয়ম শৃঙ্খলা যথেষ্ট আছে। এখানে মদ্যপান নিষিদ্ধ; এবং হোষ্টেলের মধ্যে ধূমপানও বারণ। এই সব হোস্টেলের অন্যতম উদ্দেশ্য এই যে, এখানে নানা মতাবলম্বী ও নানা দেশ ও জাতীর ছেলেমেয়েরা পরস্পরের সহিত শ্রদ্ধা ও প্রীতির যোগে পরিচিত হয়; সুতরাং এখানে কোনও প্রকার মনোমালিন্য বা উত্তেজনাজনক তর্ক বিতর্ক নিষিদ্ধ। লাইব্রেরী আছে, বক্তৃতা হয়, আলোচনা হয়—সবই এক প্রীতি ও সৌজন্যের আবহাওয়ার মধ্যে। হোষ্টেলের অধ্যক্ষকে সকলকে মেনে চলতে হয়। সকলকে স্নান করে পরিষ্কার হয়ে তবে শুতে হয়। প্রায়ই মাত্র একরাত্রি বাসই নিয়ম তবে লোক বেশী না হলে ২।৭ দিনও থাকতে পারে।

সমগ্র ইউরোপে ঘুরেছি—একাধিক বার। হোনষ্টাইন দুর্গপ্রাসাদে এই পান্থ নিবাস আমাকে যেমন মুগ্ধ করেছে এমন খুব কম স্থানই করেচে। কি শান্তি, কি সরল জীবন চারিদিকের কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, আর সর্ব্বোপরি হোষ্টেলের প্রৌঢ়া মায়ের কি আদর তথাতিথেয়তা! আমাকে এক গ্লাস খাঁটি দুধ খেতে দিলেন আর সদ্যপ্রস্তুত মোটারুটী
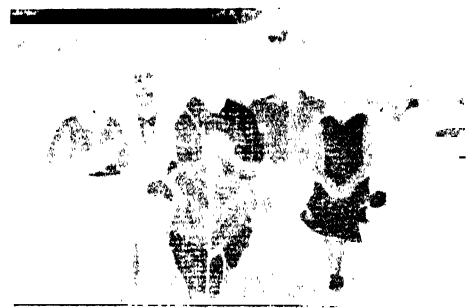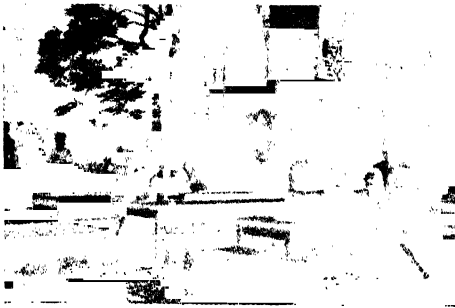
যুব পান্থনিবাসের একটি দৃশ্য

দেশী-পোষাকে লেখক।

খাঁটি মধুর সঙ্গে। আমি প্রায় ২২ মাইল রাস্তা ড্রেসডেনের এক বন্ধুর মোটরে, ধুতি চটি পরেই এসেছিলাম। আমাদের দেশীয় ধুতি, নাগরাই জুতা, পাঞ্জাবী ও শাল দেখে কত সুখী! আমার হাতের লেখা নিলেন সংস্কৃতে, বাংলায় ও ইংরাজীতে। খাতায় দেশময় রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা। তিনিও দেখতে এসেছিলেন।

এ প্রবন্ধ আর দীর্ঘ করিব না।

পূজার অবকাশ উপস্থিত। এই শরৎকালে বাঙ্গলার শোভা অপূর্ব্ব! "বাতাস জল আকাশ আলো" এই সকলকে প্রাণভরে ভালোবাসার এই সুপ্রশস্ত সময়! প্রকৃতি যেন প্রস্তুত হয়ে সকলকে ডাকচেন আয় তোরা আমার বুকে আয়!

মনের স্ফূর্ত্তি উৎসাহ ও সৎসাহস নিয়ে আমার দেশের ছেলে মেয়েরা, তরুণ তরুণীরা দলে দলে গাহিতে গাহিতে"জলে স্থলে নদীনদে গিরি উপবনে বেড়াতে বেরোবে কি ?—গাইতে গাইতে ·

"আবার কবে ধরণী হবে তরুণা"
যেদিকে চাব, দেখিতে পাব নবীন প্রাণ,
নূতন প্রীতি আনিবে নিতি কুমারী ঊষা অরুণা।"
আবার কবে ধরণী হবে তরুণা।"

তরুণের নূতন পবিত্রোজ্জ্বল নির্ম্মল দৃষ্টিতে, নূতন আদর্শের সৃষ্টিতে মন ও মতকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে আমার দেশ আবার: কবে তরুণ হবে ও দেহ ও মনের স্বাস্থ্যও স্ফূর্ত্তির সম্পদ লাভ করবে!
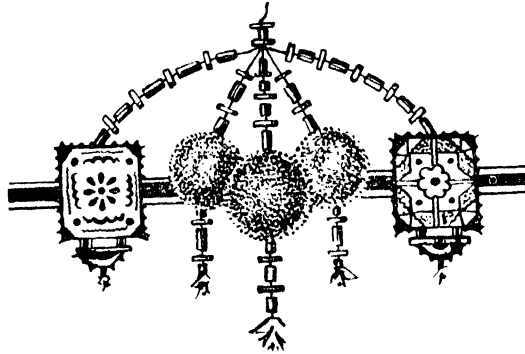
আমরা দুটি ভাই

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

খেজুর বনের পাশে পাশে
সূর্য্যি মামা যখন আসে
আমরা দুটী ভাই
বই খাতা সব ঘরে রেখে
নদীর ধারে যাই
সোণার আলো এসে পড়ে
কভু নদীর জলের প'রে
কভু ধানের খেতে।
তালের গাছের ছায়া নামে
আলোর পেছনেতে।
আকাশ ঘিরে দলে দলে
অনেক পাখী উড়ে চলে
আমরা দুটী ভাই
সেই দিকেতে চেয়ে চেয়ে
অবাক্ হয়ে যাই॥

ছাগল ছানা ডেকে ডেকে
ঘরে ফেরে মাঠের থেকে
শুক্‌নো যত ফুল
বাতাস লেগে ঝরে, ঝরে
ভরে নদীর কুল।

বাঁশ বনেরই ডাইনে বামে
জমাট বেঁধে আঁধার নামে
তবু নদীর পাশে
আকাশ থেকে নানা রঙ্গের
আলোক ভেসে আসে।

সেই আলোতে রঙ্গিন্ হয়ে
জলের ধারা চলে বয়ে
আমরা দুটী ভাই
তারই পানে চেয়ে চেয়ে
অবাক্ হয়ে যাই ॥

আকাশ ভরা এখন একি
অনেকগুলো তারা দেখি
কোথার থেকে আসে
সূর্য্যি যখন একেবারে
নেমে মাঠের পাশে
কোথায় যে যায় তাড়াতাড়ি।
দুকুর বেলা চাইতে নারি
কে বলতে বা পারে
এখন তারে দেখ্‌লে কেন
চক্ষে লাগে নারে ?
আকাশেতে কে জ্বালালো
নানা রঙ্গের এমন আলো
আমরা দুটি ভাই
সেই কথাটি ভেবে ভেবে
অবাক্ হয়ে যাই।

মহাবীর চণ্ড

শ্রীগায়ত্রী দেবী।

মহাভারতে মহাপ্রাণ ভীষ্মদেবের কথা তোমরা সকলেই পড়েছ। এবং তাঁর সেই ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথাও তোমাদের অজানা নেই, যার জন্য তাঁর নাম হয়েছিল ভীষ্ম। তা না হোলে তাঁর আসল নাম ছিল দেবব্রত।

আজ আর একটি সেইরকম তেজস্বী মহাপুরুষের কথা তোমাদের বলবো। ইনি হচ্ছেন মেবারের রাণা লাক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ চণ্ড।

রাণা লাক্ষ বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়ে, পুত্র, পৌত্র যার যা প্রাপ্য সবাইকে সব দিয়ে নিজে নিশ্চিন্ত মনে ভগবানে মনপ্রাণ সমর্পণ করে পরকালের চিন্তায় মনোনিবেশ করেছেন। তবে একটী কাজ এখনও তাঁর বাকী সেটি হচ্ছে জ্যেষ্ঠপুত্র চণ্ডকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করা। এই কাজটি করা শেষ হলে তাঁর সাংসারিক কাজ কর্ম্মের ব্যবস্থা একরকম ঠিকঠাক হোয়ে যায়। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। সেই জন্য এই শেষ কাজটির সময় প্রচণ্ড বাধা এসে সমস্ত ওলট্ পালট্ কোরে দিয়ে রাজস্থানের ইতিহাসের ধারা একেবারে বদলে দিয়ে গেল। পঞ্চাশদ্বর্ষীয় বৃদ্ধ রাণা আবার সংসারে জড়িয়ে পড়লেন। যে মুক্তির আশায় তিনি উন্মুখ হোয়ে ছিলেন, সে মুক্তি তিনি আর পেলেন না শেষ জীবনে।

একদিন রাণা লাক্ষ মন্ত্রী, পারিষদ ও সামন্ত রাজগণে পরিবৃত হোয়ে রাজসভায় বসে আছেন এমন সময় সুন্দররাজ রণমল্লের দূত রাজসভায় নারিকেল হস্তে এসে উপস্থিত হলো। ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে এই প্রথা ছিল যে, দুইরাজা পরস্পরের মধ্যে যদি সম্বন্ধ স্থির করতে ইচ্ছা করেন তা'হলে, একজন আর এক জনের কাছে দূত হস্তে নারিকেল প্রেরণ করেন। রাণা দূতকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করে তাঁর চিতোরে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন দূত বল্লেন—মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ চণ্ডের সঙ্গে নিজ দুহিতার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে, মহারাজ রণমল্ল এই নারিকেল ফল প্রেরণ করেছেন। যুবরাজ চণ্ড তখন রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন না। রাণা দূতকে বল্লেন যে চণ্ড এখনই এসে এ প্রস্তাবে সম্মতি দান করবেন। তারপর রাণা পরিহাসছলে বল্লেন—"আমার বোধ হয় যে আমার মত

কমলার গলা শুনে একটি ছোট্ট বৌ ঘোমটা টেনে বেরিয়ে এল

(বনভোজন—১৯ পৃষ্ঠা)

INDIAN Photo Engraving Co Calcutta.

এরূপ শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধের জন্য আপনারা এরকম খেলার সামগ্রী প্রেরণ করেন না।” সভাসদেরা এবং এমন কি দূত পর্য্যন্ত রাণার এই কৌতুকে হেসে উঠ্‌লো। এমন সময় চণ্ড এসে উপস্থিত হলেন। পিতার এই কৌতুকের কথা তার কাণে গেল। তিনি একথাটিকে সহজভাবে নিতে পারলেন না। তিনি ভাব্‌লেন, পিতা কৌতুকের বশবর্ত্তী হয়ে যে সম্বন্ধকে মুহূর্ত্তকালের জন্যও আপনার বলে ভেবেছেন, সে সম্বন্ধে পুত্র কি রকমভাবে আবদ্ধ হোতে পারে? এই কুটচিন্তা চণ্ডের মনে উদয় হতেই তিনি স্থির করে ফেল্লেন যে, এ বিবাহে সম্মত হওয়া কখনই তাঁর পক্ষে উচিত হবে না। রাণার কাণে একথা গেল তিনি ছেলেকে ডেকে কত বোঝালেন, কত ভয় দেখালেন, কিন্তু চণ্ডের সেই ভীষণ প্রতিজ্ঞার এতটুকু নড়চড় হোলো না। তখন রাণা ভয়ানক চটে গিয়ে বল্লেন—“বেশ এই যদি তোমার মত হয় তা'হলে তাই হোক্‌। আমি রণমল্লকে চটাতে চাই না, এই কন্যার পাণি গ্রহণ আমাকেই করতে হবে। আর মনে রেখো এই কন্যার যদি কোন পুত্র সন্তান হয়, তা'হলে সেই পুত্রই আমার সিংহাসন পাবে।—শপথ কর।”

তেজস্বী চণ্ড পিতার এই কথা শুনে কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। তিনি অকম্পিত স্বরে উত্তর কর্‌লেন—“হ্যাঁ বাবা! আমি ভগবান একলিঙ্গের নামে শপথ করে বল্‌ছি যে, তাহলে আমার উত্তরাধিকার সত্ব আমি আপনিই ত্যাগ কর্‌বো।

ভবিতব্যের লিখন কেউ খণ্ডন কর্‌তে পারে না। দ্বাদশবর্ষীয়া সুন্দররাজ-দুহিতা পঞ্চাব্দবর্ষীয় বৃদ্ধ রাণা লাক্ষের করে সমর্পিত হোলো। তারপর রাণার একটি পুত্র সন্তান হয়। এই পুত্রের নামই মকুলজি।

মকুলজির বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন রাণা শুন্‌তে পেলেন যে, মুসলমানরা হিন্দুর পুণ্যতীর্থ গয়াধাম আক্রমণ করেছে। তখনকার দিনে রাজারা ভাবতেন যে, রাজকার্য্য করতে হোলে রাজাকে অনেক পাপকার্য্য করতে হয়। সেই জন্য বৃদ্ধ বয়সে নানা রকম পুণ্যকার্য্য না কর্‌লে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিছুতেই হয় না। মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, সেই ধর্ম্মযুদ্ধে যদি প্রাণ দিতে পারা যায়, তাহলে তো একেবারে অক্ষয় স্বর্গ। এই অক্ষয় স্বর্গলাভের লোভ রাণা কিছুতেই সম্বরণ করতে পার্‌লেন না। তিনি চণ্ডকে ডেকে বল্লেন “আমি যে কঠোর ব্রতানুষ্ঠান কর্‌তে প্রবৃত্ত হয়েছি, তা উদ্‌যাপন কোরে আর যে জীবন নিয়ে দেশে ফিরে আস্‌তে পারবো, এরকম আশা করি না। যদি আমি আর না ফিরি তা'হলে মকুলের উপজীবিকার উপায় কি?—তাহলে তার জন্য কোন্‌ সম্পত্তি নির্দ্ধারিত হবে?” তেজস্বী চণ্ড স্থিরভাবে উত্তর কর্‌লেন—“চিতোরের রাজাসন।” এবং পাছে

পিতার মনে কোনও প্রকার সন্দেহ থেকে যায় সেইজন্য, পিতার গয়া যাত্রার পূর্ব্বেই মকুলের অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করালেন। এবং তাকে সিংহাসনে বসিয়ে তার প্রতি রাজোচিত সম্মান দেখিয়ে চণ্ড সর্ব্বসমক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করলেন যে, চিরকাল মকুলের অনুগত থাকবেন, কখনও তার বিরুদ্ধে, কোন প্রকার অবিশ্বাসের কার্য্য করবেন না। চণ্ডের মহত্ত্ব দেখে সকলে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। এবং তাঁর এই মহৎ ত্যাগ স্বীকারের প্রতিদান স্বরূপ, তাঁ'কে মন্ত্রণা ভবনে সর্ব্বোচ্চ আসন দেওয়া হলো। আর সেইদিন থেকে ঠিক হোয়ে গেল যে, সামন্তগণকে যে ভূমিবৃত্তি দান করা হবে, তার দানপত্রে রাণার স্বাক্ষরের শিরোভাগে, চণ্ডের ভল্লচিহ্ন অঙ্কিত থাকবে। সেইদিন থেকে চিতোরের অধিপতিরা যা'কে যে ভূমিবৃত্তি দান করেছেন, তার শিরোদেশে সালুম্ব্রাপতির ভল্লচিহ্ন অঙ্কিত দেখতে পাওয়া যায়।* রাণা লাক্ষ সেই যে গেলেন আর তাঁকে ফিরতে হোলো না। পুণ্যতীর্থ গয়াধামেই তিনি প্রাণত্যাগ করলেন।

চণ্ডের হৃদয় যে কত মহৎ, কত উদার, তা' তাঁর এই অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের বিষয় মুহূর্ত্ত-কাল চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায়। পিতার অবর্ত্তমানে তিনি কনিষ্ঠ মকুলের এবং সমস্ত মিবার রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য, প্রাণপণ শক্তিতে খাটতে লাগলেন। সকলেই চণ্ডের ব্যবহারে সন্তুষ্ট। শুদ্ধ চণ্ডের হাতে এতখানি ক্ষমতা দেওয়াতে, রাজমাতার তা' সহ্য হোলো না। তিনি ভেবেছিলেন যে, রাণার অবর্ত্তমানে, তিনিই শিশুপুত্র মকুলজির হয়ে রাজকার্য্য পরিচালনা করবেন। কিন্তু তাঁর সে আশা ফলবতী হোলো না। তখন তিনি চণ্ডের উপর ভয়ানক চটে গিয়ে, তাঁর বিরুদ্ধে নানারকম মিথ্যা কথা রটাতে লাগলেন এবং অবশেষে এ কথাও বলতে ছাড়লেন না যে, চণ্ড তাঁর শিশুপুত্রকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করবার চেষ্টা করছেন। সরল হৃদয় চণ্ড যখন এই সব শুনলেন তখন তিনি মনে অত্যন্ত আঘাত পেলেন। যে কনিষ্ঠের জন্য তিনি এতখানি ত্যাগ স্বীকার করলেন, এখন তা'র প্রতিদান হোলো এই। তিনি রাজ্য ছেড়ে যেতে স্থির সংকল্প হলেন। যাবার আগে বিমাতাকে শুধু এই কথাটা বলে গেলেন—"আমার যদি চিতোরের সিংহাসনে বসবার অভিলাষ থাকতো, তা' হলে কে আজ আপনাকে রাজমাতা বলে সম্বোধন করতো? বিশেষ কিছুই দুঃখ নেই, কেবল এই দুঃখ যে চিতোর ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আর চিতোরের ভাগ্য অতি ভয়ঙ্কর তা' দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

---

* চণ্ডের বংশধরগণ চণ্ডাবৎ নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। তাঁদের অধিপতি বা সর্দ্দারের আবাস-ভূমি শালুম্ব্রা। মিবারের সর্দ্দার সমিতির মধ্যে শালুম্ব্রাপতিই শ্রেষ্ঠ।

আমি চল্লাম চিতোরের সুখ, দুঃখ, সম্পদ, বিপদ, এখন আপনার হাতেই সমর্পিত হোলো। দেখ্‌বেন শিশোদীয়কুলের গৌরব, সম্ভ্রম, যেন চিরতরে অস্তমিত না হয়।" এই বলে চণ্ড চলে গেলেন। তাঁর বিমাতা তাঁকে থাক্‌বার জন্য একবার অনুরোধও কর্‌লেন না। ভাব্‌লেন, এতদিনে আপদ বিদায় হোলো, বাঁচা গেল।

এদিকে চিতোর পরিত্যাগ করে চণ্ড মান্দুরাজ্যের দিকে অগ্রসর হোলেন। মান্দু-রাজ তাঁর পরিচয় পেয়ে সাদরে তাঁ'কে গ্রহণ কর্‌লেন, এবং হল্লার নামক জনপদ তাঁকে ভূমিবৃত্তি স্বরূপ দান ক'লেন।

চণ্ড, রাজ্য ছেড়ে চলে গেছেন এ খবর মকুলজির মামার বাড়ীতে পৌঁছতে বিশেষ দেরী হোলো না। তাঁর মামা যোধরাও ও দাদা মহাশয় রণমল্ল, অনুচরবর্গে পরিবৃত হয়ে, নাবালক নাতিকে রক্ষণাবেক্ষণ করবার জন্য, মিবারের শীতল ছায়াতলে এসে আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লেন। মুকুলজির মা ভাবলেন, থাক্ বাবা এসেছেন, ভাই এসেছেন, আর কোনও ভাবনার কারণ নেই।

শিশু দৌহিত্রকে কোলে কোরে রণমল্ল বাপ্‌পারাওয়ের সিংহাসনে বস্‌তে লাগ্‌লেন। রাণার ছত্র, চামর, তাঁর চারিদিকে শোভা পেতে লাগ্‌লো। সিংহাসনে বসে, তিনি মনে মনে কত সুখস্বপ্ন দেখ্‌তেন! বালক মকুল ক্রীড়াসক্ত হয়ে যখন রাজসভা ছেড়ে চলে যেতেন, তখনও সমস্ত রাজোচিত চিহ্ন রণমল্লের মাথার ওপর শোভা পেতো। এটী সকলের কাছে অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ হওয়া সত্ত্বেও ভয়ে কেউ কিছু বলতে পার্‌তেন না। অল্পদিনের মধ্যেই সকলে বেশ ভালো করেই বুঝ্‌তে পার্‌লেন যে এই বৃদ্ধ বয়সে, এই বৃদ্ধ নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ করে সদলবলে শুধু যে নাবালক নাতির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ছুটে এসেছেন তা' নয়। তাঁ'র মনে একটী অতি দুষ্ট অভিসন্ধি আছে, সেটী হচ্ছে শিশু দৌহিত্রকে সিংহাসনচ্যুত কোরে, নিজে সেই সিংহাসনে অধিরূঢ় হওয়া। এঁরা সব বৃদ্ধের দুস্ট অভিসন্ধির কথা জান্‌তে পেরেও ভয়ে চুপ করে রইলেন। কিন্তু শিশোদীয় কুলের বৃদ্ধ ধাত্রী, যাঁর হস্তে রাজকুমারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল, তিনি দেখ্‌লেন যে আর চুপ করে থাকা ঠিক নয়, তাহলে বীরবর বাপ্পারাওয়ের সিংহাসন, বিশ্বাসঘাতক রাঠোর কর্তৃক অধীকৃত হবে, এবং শিশোদীয়কুল চিরকালের মত ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। তখন তিনি একদিন রাণীকে ডেকে বল্লেন—"তুমি কি তোমার পিতার মতলব কিছু বুঝ্‌তে পারছো না? এইবেলা সাবধান হও। তা' না হোলে, তোমার পিতৃকুল, তোমার শিশুপুত্রকে চিতোর রাজ্য থেকে বঞ্চিত করবে।

ধাত্রীর এই কথা শুনে রাণীর মনে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হোলো। তিনি নিজেই তাঁর পিতার কাছে গিয়ে' তাঁ'র এই রকম ব্যবহারের কারণ কি জিজ্ঞাসা

কর্‌লেন। তা'তে তাঁ'র পিতা যে রকম মনোভাব প্রকাশ কর্‌লেন, তা' শুনে রাণীর প্রাণ ভয়ে কেঁপে উঠ্‌লো। তিনি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লেন যে, প্রয়োজন হোলে তাঁর শিশুপুত্রকে হত্যা করতেও তিনি দ্বিধাবোধ কর্‌বেন না।

এই রকম বিপদ যখন চল্‌ছে তখন রাণী শুন্‌তে পেলেন যে, চণ্ডের দ্বিতীয় সোদর উদার-হৃদয় রঘুদেব দুরাচার রণমল্ল কর্ত্তৃক গুপ্তভাবে নিহত হয়েছেন। রাজ-মাতার আশঙ্কার আর পরিসীমা রইলো না। দুরাচার যখন রঘুদেবকে হত্যা করেছে, তখন সে যে বালক মুকুলকেও শীঘ্রই সংহার করবার উদ্যোগ কর্‌বে, তা' তিনি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লেন। চারিদিকে চেয়ে দেখলেন কোন আশা ভরসা নেই। চিতো-রের যা কিছু উচ্চাসন—সে সমস্তই রণমল্লের আত্মীয় কুটুম্বেরা অধিকার করেছে। আর শিশোদীয় কুলের যারা আছে তাদের সকলকেই তাঁর পিতা বশীভূত কোরে ফেলেছেন। এমন কেউ আজ আর রাজ্যে নাই, যে মহিষীর পক্ষ অবলম্বন করে, শিশোদীয় কুলকে চিরবিনাশের হস্ত হতে রক্ষা করে। আছে শুধু একজন, সে সেই দেবচরিত, উদার হৃদয় চণ্ড। তাঁর কথা মনে হতেই তাঁর প্রতি রাণী যে রকম ব্যবহার করেছিলেন, সে সব কথাও তাঁর মনে পড়্‌লো। তিনি অনুতাপে দগ্ধ হতে লাগ্‌লেন। তিনি নিজের সমস্ত দোষ ত্রুটী স্বীকার করে চণ্ডের কাছে মার্জ্জনা চেয়ে, উপস্থিত সমস্ত বিষয় অতি গোপনে তাঁকে জানালেন। চণ্ড দূরদেশে থাকা সত্ত্বেও চিতোর সংক্রান্ত সমস্ত দৈন-ন্দিন ঘটনার সংবাদ রাখ্‌তেন। তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও চিতোরের মঙ্গলসাধনে উদাসীন ছিলেন না। রাজমাতা বিপদে পড়ে আবার তাঁর সাহায্য প্রার্থনা কর্‌বেন, একথা তিনি আগে থাক্‌তেই জান্‌তেন বিমাতার অনুরোধপত্র পেয়েই তিনি তাঁকে গোপনে এই কথা বলে পাঠালেন—যে আপনি চিতোরের আশে পাশে সমস্ত গ্রামগুলিতে ভোজ দেবেন, এই কথা চারিদিকে রটিয়ে দিয়ে, মুকুলজিকে নিয়ে ধীরে ধীরে চিতোর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ুন। এবং দেওয়ালির দিন যাতে গোসুন্দরপুরে উপস্থিত হতে পারেন, সেই চেষ্টা করবেন। তা না হলে সকল দিক হারাতে হবে! আর জান্‌বেন যতক্ষণ চণ্ডের প্রাণ আছে, ততক্ষণ কেউ আপনার শিশুপুত্রের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।

বিমাতাকে এই খবর পাঠিয়ে দিয়েই চণ্ড এদিকে প্রস্তুত হতে লাগলেন। তিনি আগে থাকতেই দুশো আহেরীয় সৈন্যকে চিতোরে পাঠিয়ে দিলেন। এরা চণ্ডকে বড় ভাল বাসতো, সে জন্য যখন চণ্ড চিতোর ছেড়ে চলে আসেন, এরাও নিজের স্ত্রী, পুত্র, পরিবার ত্যাগ করে চণ্ডের সঙ্গে চিতোর ছেড়ে চলে এসেছিল। এরা সব চিতোরে গিয়ে ছদ্মবেশে কতক রাজ সরকারে চাকরী নিলো—কতক এদিকে সেদিকে লুকিয়ে রইলো।

এদিকে রাণী ভোজের নাম করে, মকুলজিকে সঙ্গে নিয়ে, চিতোর ছেড়ে বেরিয়ে

পড়্লেন। কেউ কোন প্রকার সন্দেহ কর্লো না। গ্রামে গ্রামে ভোজ দিতে দিতে শেষে নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁরা গোসুন্দরপুরে এসে উপস্থিত হোলেন। সন্ধ্যা হয়ে রাত্রি উপস্থিত হলো, কিন্তু চণ্ডের দেখা নেই। চিন্তিতমনে ধাত্রী, রাজমাতা, ও কুলপুরোহিত মকুলজীকে নিয়ে চিতোরী দুর্গের দিকে অগ্রসর হচ্চেন, এমন সময় পেছন দিক থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুন্‌তে পাওয়া গেল। আশায় ও আনন্দে তাঁরা উৎফুল্ল হয়ে উঠ্লেন। দেখ্তে দেখ্তে চল্লিশজন অশ্বারোহী, তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁদের অতিক্রম করে চলে গেল। এই অশ্বারোহীদের সর্ব্বাগ্রে ছিলেন ছদ্মবেশী চণ্ড। নিজের কনিষ্ঠ মকুলজির কাছে আস্‌তেই সঙ্কেতে তাঁর প্রতি রাজোচিত সম্মান দেখিয়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে তিনি দৃষ্টির বহির্ভুত হয়ে গেলেন।

তারপর তাঁরা চিতোরের সিংহদ্বারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দ্বাররক্ষীরা তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে, চণ্ড উত্তর কর্লেন যে তাঁরা সকলেই রাজপুত সর্দ্দার। চিতোরের আশে পাশের গ্রামগুলি তাঁদের আবাস ভূমি, রাজকুমারের উৎসবে যোগদান করবার জন্য, তাঁরা তাঁর সঙ্গে গোসুন্দর পুরে গিয়েছিলেন, এখন আবার তাঁকে দুর্গে পৌঁছে দিতে এসেছেন। একথা শুনে দ্বাররক্ষীদের, তাঁদের উপর আর কোন সন্দেহ হোলো না। তাঁরা অপ্রতিহত ভাবে দুর্গমধ্যে প্রবেশ কর্লেন। ইতোমধ্যে আগেকার সেই সব আহেরীয় সৈন্য এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিল। দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হোলো। রণমল্ল তো তাঁর রাঠোর সৈন্যসহ নিহত হোলো।—তবে রাঠোরকুল ধ্বংসপ্রাপ্ত হোলো না। কারণ যোধরাও কিছু রাঠোর সৈন্য সঙ্গে নিয়ে, পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বেঁচে গেলেন। তবু চণ্ড তার পিছনে ধাওয়া কর্লেন। যোধরাও দেখ্লেন চণ্ডের সঙ্গে পেরে ওঠা বড় শক্ত ব্যাপার। অগত্যা তিনি চণ্ডের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হলেন। বিশ্বাসঘাতক রাঠোরদের হাত থেকে শিশোদীয়কুল রক্ষা পেলো মকুলজি আবার চিতোরের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন।

মহাপ্রাণ চণ্ড আজ আর এ জগতে নেই। কিন্তু যে মহত্ব তিনি রেখে গেছেন, তা সমস্ত মানব জাতির অনুকরণীয়।

———

ভাব্‌বার কথা

শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

রাত্তিরে বিট্‌কেল বিচ্ছিরি শব্দ
যদি কেউ করে রোজ, হও কিগো জব্দ ?

শীতকালে ভোরবেলা যবে থাক কুঁচ্‌কে
হেনকালে রামযাদু, পট্‌লা, কি পুঁচ্‌কে,
যদি ধর লেপ তুলে্‌ ঢালে জল ফোর্‌সে, (forceএ)
তখন কি হাসবে, না কাঁদবে, গো জোর্‌সে ?

যদি ধর বর্ষায় ফুটপাতে ছট্‌কে
ঘাড় মুখ গুঁজে পড় একেবারে লট্‌কে,
দাঁত বার করে যদি হাসে সব পান্থ,
তখন কি রাগ বাপু, নয় থাক শান্ত ?

গ্রীষ্মের দুপুরেতে যদি—কোন দস্যি
ঘুমুবার সময়েতে নাকে দেয় নস্যি,
প্রতিশোধ সে সময় কোন্‌ ভাবে নিচ্ছ?
ধর্‌বে কি ? কর্‌বেতো হ্যাঁচ্ছো ও হিঁচ্ছো !

এই ভাবে তিন দিন চল যদি সর্‌বে,
গোড়া থেকে ভেবে রাখ তা'না হলে মর্‌বে !
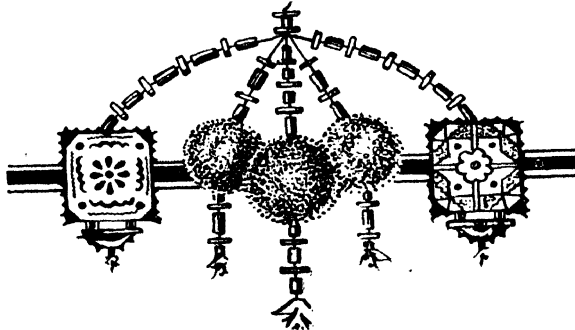
আলো ও ছায়া

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র ডি, এস্, সি।

আজকাল মেয়েদের মধ্যে ছবি আঁকতে শেখার খুব একটা আগ্রহ দেখা যায়। আগে আগে গান বা কোনও রকম বাজ্‌না, যেমন সেতার, এস্রাজ, কি বেহালা—এইসব শেখার দিকেই ঝোঁক ছিল, এখন সেই সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকলাও অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করছে। এটা খুব ভাল লক্ষণ বল্‌তে হবে। কারণ সুকুমার কলা মাত্রেই মানুষের মনকে উন্নত করে, বুদ্ধিকে পরিমার্জ্জিত করে ও পর্য্যবেক্ষণ-শক্তিকে বৃদ্ধি করে। এই হিসাবে যা'রা চিত্রকলার জন্য সময় ও অর্থব্যয় করতে পারেন, তাঁদের তা করা উচিত। কিন্তু ঐ শেষের কথাটা নিয়েই গোল ওঠে। অনেকের সময় আছে, ইচ্ছা আছে, কিন্তু ছবি আঁকার জন্য যে সব সাজ সরঞ্জাম ও শিক্ষকের সাহায্য দরকার, সেটা করতে পারেন না। Water Colour এর মূল্য অবশ্য বেশী নয়, কি ভাল Oil Colour এর দাম বেশী। তা ছাড়া আসল খরচ হচ্চে শিক্ষকের বেতন। এইটাই অনেকের শেখার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু শিক্ষকের সাহায্য না নিয়েও এক রকম চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি আছে, যাতে ছবি আঁকার অভ্যাস অনেক দূর অগ্রসর হয়, শিক্ষকের খরচও লাগে না; আর সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট আমোদও পাওয়া যায়। এই রকম চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির নাম Silhouette Painting. Silhouette এর পদ্ধতি ও প্রণালী খুবই সহজ—শুধু আলো ও ছায়ার খেলা মাত্র।

আমরা সকলেই জানি যে কোনও জিনিষের ছায়া সেই জিনিষের আকারের মত হয়। গোল জিনিষের ছায়া গোল হয়—চৌকা জিনিষের ছায়া চৌকা হয়। কারও Silhouette ছবি নিতে হলে তার ছায়াটা একটা পরিষ্কার জায়গাতে ফেল্‌তে হয়। তার পর সেই ছায়ায় ধারে ধারে Pencil দিয়ে ছবিটী এঁকে নিলেই হয়ে যায়। ভাল ও পরিষ্কার ছবি তুল্‌তে হলে কয়েকটা বিষয়ে সাবধান হতে হয়। সেই সাবধানতা না নিলে ছবি ভাল হয় না, ঝাপ্‌সা হয়। সব চাইতে আসল হচ্চে যে, যে আলোর সাহায্যে ছায়া ফেলা হচ্চে—সেটা আয়তনে ছোট হওয়া চাই। আলোর আয়তন যদি

বড় হয় তবে ছায়ার ধারে ধারে আলো ও অন্ধকারের প্রভেদটা স্পষ্ট হয় না। কেন হয় না —তা' নীচের দুটা ছবি থেকে বেশ বোঝা যাবে।
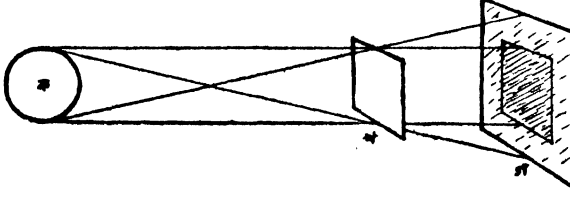
১নং চিত্র

'ক' একটা আলোর গোলক। যেমন ধরা যাক একটা Table lampএর ঘসা কাচের গোল ডোম, অথবা সাদা দুধকাচের (Milk glass) বিজলী বাতির Bulb. আলোর গোলকের আয়তন বড় হলে তার উপর ও নীচে, ডাইনে ও বাঁয়ে, সব জায়গা থেকেই আলো বাহির হয়ে চৌকা জিনিষটার (খ) একটী করে ছায়া ফেল্‌ছে। অর্থাৎ ছায়া (গ) যেন একটী নয়, গোলকের প্রত্যেক বিন্দুই একটা একটা করে অনেকগুলা ছায়া ফেল্‌ছে। সুতরাং ছায়ার উপর ছায়া পড়ে সবটা ঝাপ্‌সা হচ্চে। মাঝ খানটা বেশ কাল অন্ধকার ও তার আশপাশটা অপেক্ষাকৃত কম অন্ধকার। যে জিনিষটার ছায়া ফেলা হচ্চে সেটা আকারে যদি আলোর গোলকের চাইতে ছোট হয় আর যে দেওয়ালের উপর ছায়া পড়ছে সেটা যদি একটু দূরে থাকে, তাহলে মাঝের কালো ছায়াটা একেবারেই বাদ পড়ে যায় ও ছায়া এত অস্পষ্ট হয় যে প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না। এই কারণে যখন আকাশে কোনও পাখি ডানা মেলে ওড়ে তখন সূর্য্যের আলোতে তাদের ছায়া মাটীতে প্রায়ই পড়ে না।
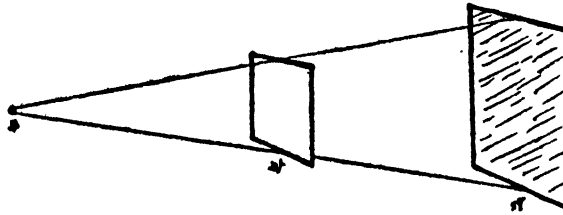
২নং চিত্র

কিন্তু, আলোর আয়তন যদি বেশ ছোট হয় তবে ছায়াটা বেশ পরিষ্কার পড়ে। ২নং ছবি দেখ্‌লেই বোঝা যাবে। এখানে 'ক' আলোটা যেন একটা বিন্দু মাত্র। একটা আলোর বিন্দু মাত্র একটা ছায়া ফেলেছে।

Silhouetteএ আলোর আয়তন খুব ছোট করার আবশ্যকতা এখন বোঝা গেল।

ছোট আলো পেতে গেলে খুব সহজ পন্থা হচ্ছে প্রথমে একটা milk glassএর বিজলী বাতির bulb (যত জোরাল হয় ততই ভাল), একটা কাগজের বাক্সের ভিতর রাখ। (জুতা কেনার সময় যেরকম কার্ডবোর্ডের বাক্সে জুতা দেয় সেই রকম বাক্স) তা হলে বাজে আলো বাইরে আস্‌তে পায় না। তারপর বাক্সের গায়ে একটা ছোট ছিদ্র করে দিলে সেই পথে আলো বাইরে আসে। এখন আলোর ছিদ্র হতে প্রায় ৫।৬ হাত দূরে যার ছবি আঁকা হবে, তাকে বস্‌তে হয় ও সেখান থেকে দেড় বা দুই হাত দূরে, দেওয়ালের উপর ছায়া ফেল্‌তে হয়। এই ভাবে ছায়া ফেল্‌লে ছায়াটা খুব পরিষ্কার পড়ে। ঘরটা অন্ধকার হওয়া চাই, নয়ত ছায়াটা অস্পষ্ট ওঠে। দেয়ালে ছায়ার জায়গায় একটা কাগজ এঁটে কাগজে উপর পেন্‌সিল বা কাল Crayon দিয়ে ছবিটা এঁকে নিতে হয়। ছবি আঁকা মানে ছায়ার ধারে ধারে দাগ দিয়ে যাওয়া। সকলেই তা পারে। এই ভাবে গোড়ায় ছবি আঁকা অভ্যাস করলে মানুষের মুখের বা শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ছবি আঁকার কায়দাটা বেশ আয়ত্ত হয় ও পরে কাউকে সামনে বসিয়ে তাকে দেখে দেখে তার ছবি আঁকার অভ্যাসটাও অনেক সহজ হয়ে আসে।

উপরে Silhoutte পদ্ধতিতে ছবি আঁকার কথা যা বল্‌লাম তা' বুঝতে কারও অসুবিধা হবে না। যে জিনিষের ছায়া ফেলা হচ্চে, ছায়াটা সেই জিনিষের মতই হবে এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই,—বরং জিনিষের আকারের অনুরূপ ছায়া না হলেই একটু আশ্চর্য্য হবার বিষয় হয়। আলোর আয়তনটা যতই ছোট হয়, ছায়াটা ততই স্পষ্ট হয়ে আসে—এটার কারণও সহজে বোঝা যায়।

কিন্তু আরও একটু সূক্ষ্মভাবে দেখলে দেখা যায় যে ছায়াটা সব সময় বস্তুটার আকৃতি নেয় না—তা' সে আলোক বিন্দুটা যতই সূক্ষ্ম করা হোক না কেন। সময় সময় ছায়ার চেহারা বস্তুটা থেকে এত তফাৎ হয় যে কোন্ বস্তুর যে ছায়া তা' হঠাৎ বোঝা যায় না। ছায়ার সঙ্গে বস্তুর আকারের এই যে বৈষম্য ও তার কারণের মূলে যে গভীর বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে সেই সম্বন্ধে দুই একটী কথা এইবার বল্‌ব।

ছায়াটা বস্তুর আকারের অনুরূপ কেন হয় ভাবতে গেলে গোড়াতেই মনে হয় যে আলো সোজা পথে সরল রেখায় চলে, সুতরাং ছায়াটী বস্তুর আকারের ছাপ দেবেই ত। ২নং চিত্র দেখলেই একথা বোঝা যায়। বস্তুটী যদি গোল বা বাদামী বা অন্য কোন আকারের হয় তা হলে আলো সরল রেখায় চলার দরুণ ছায়াটাও ঠিক গোল বা বাদামী

বা অন্য আকারের হয়। কিন্তু আলো যে সরলরেখায় সোজা পথে চলে এই কথাটাই একেবারে খাঁটি নিখুঁত সত্য নয়।

৩নং চিত্রে এইটা বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে। 'ক' একটা খুব ছোট আলোক বিন্দু—'খ গ' একটা কাঠের বা অন্য কোন কিছুর আড়াল। 'ক' থেকে আলোর রশ্মি 'চ ছ' এর উপর এসে পড়েছে। সাধারণতঃ স্থূলভাবে দেখ্‌লে দেখি যে 'ক ঘ' রেখার ডাইনে সব জায়গাটা আলো ও 'খ' এর আড়ালের তলায় সব জায়গাটা অন্ধকার। আর 'ঘ' এর কাছে আলো ও ছায়ার বিভেদ রেখাটা বেশ পরিষ্কার। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখ্‌লে দেখা যায় যে আড়ালের ঠিক তলায় যেখানটা অন্ধকার হওয়া উচিৎ অর্থাৎ 'ঘ'এর বাঁয়ের জায়গাটা অন্ধকার নয়—ছায়ার ভিতরের কতকদূর পর্য্যন্ত আলো প্রবেশ করেছে। অবশ্য ছায়ার ভিতরে বেশী দূর গেলে আলোটা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসে। তারপর আস্তে আস্তে একেবারে অন্ধকার হয়ে যায়। আবার বাইরে যেখানে শুধু আলো থাকা উচিৎ, ('ঘ'এর ডাইনে) সেখানে দেখা যায় যে আলো আর আঁধারে মিশে একবার আলো, একবার অন্ধকার, এইরকম পাশাপাশি আলো আঁধার হয়ে কিছু দূর গিয়ে অবশেষে শুধু আলোই পাওয়া যাচ্ছে। এই যে আলো আঁধারের খেলা এর কি কারণ হতে পারে তার অনুসন্ধান কর্ত্তে গিয়ে বৈজ্ঞানিকদের অনেক গবেষণা কর্ত্তে হয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, আলো ইথার নামে একটা সর্ব্বব্যাপী পদার্থের ঢেউ মাত্র। আমরা বিজলী বাতির ফিলামেণ্টে যখন কারেণ্ট দিই তখন ফিলামেণ্টের অনুপরমাণুগুলা অত্যধিক তাপে চঞ্চল হয়ে এই ইথরে ঢেউ তোলে। সেই ঢেউ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঢেউ চলার পথে মানুষের চোখ থাক্‌লে, চোখে প্রবেশ করে ঢেউ আলোর অনুভূতি জন্মায়। 'ক' আলোক বিন্দু থেকে আলোর ঢেউ আস্‌তে আস্‌তে খ গ তে বাধা পেল (৩নং ছবি)। 'গ'য়ের কাছে ঢেউ বাধা পেয়ে চারি ধারে ছড়িয়ে আঁড়ালের নীচে অন্ধকারের ভিতরেও প্রবেশ করল। ঢেউ বাধা পেলে চারিধারে ছড়িয়ে পড়ে তা বোধ হয় সকলেই জানে। শব্দ বাতাসের ঢেউ মাত্র। সেই জন্য যদি কেউ কথা বলে বা শব্দ করে, সে সময়ে আমি যদি কানের সাম্‌নে একটা খাতা বা বই আড়াল করে ধরি, তা' হলে শব্দ আট্‌কায় না—কারণ শব্দের ঢেউ খাতায় বাধা পেয়ে, খাতার ধার ঘুরে কানে পৌঁছায়। আলোর ঢেউও সেই রকম ঐ 'খ গ' আড়ালের 'গ' এর কাছে বাধা পেয়ে ঘুরে ছড়িয়ে পড়ে ও
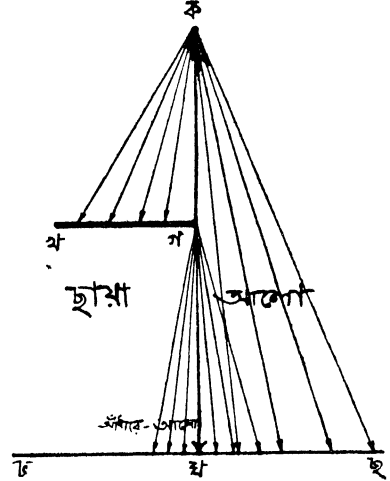
আড়ালের তলায় পৌঁছায়। একটা কথা মনে রাখ্‌তে হবে। বাধা পেয়ে বেঁকে ঘুরে যাওয়ার পরিমাণ, শব্দের চাইতে আলোর খুব কম। শব্দ বেশ সহজেই অনেকখানি ঘুরে বেঁকে যেতে পারে। কিন্তু আলো অতি কষ্টে সামান্য একটুখানি বেঁকে ঘুরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। পারমাণ কম বলে আলোর ঘুরে বেঁকে যাওয়াটা সহজে নজরে পড়ে না—সাধারণতঃ মনে হয় আলো শুধু সোজা পথেই চলে বুঝি। শব্দের ঢেউ কেন সহজেই বাঁকতে, ঘুরতে, বা ছড়াতে পারে, আর আলোর ঢেউ কেনই বা পারে না তা বোঝাতে গেলে অনেক কথা বল্‌তে হয়। সে সব বলা এখানে সম্ভবপর নয়। শুধু এইটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে বাঁকার পরিমাণ নির্ভর করে ঢেউটার দৈর্ঘ্যের উপর। (ঢেউএর একটা মাথা থেকে আর একটা মাথার যে দূরত্ব সেইটাকে ঢেউএর দৈর্ঘ্য বলে)। লম্বা ঢেউ সহজে বাঁকে, ঘোরে, ছড়ায়। আর ছোট ঢেউ তত সহজে ছড়ায় না। বাতাসে শব্দের ঢেউ ৫।১০ হাত লম্বা আর ইথরে আলোর ঢেউ মোটে এক ইঞ্চের লক্ষভাগের এক ভাগ! সেই জন্য এই দুরকম ঢেউএর বাঁকান, ঘোরার বা ছড়ানর পরিমাণ এত ভিন্ন।
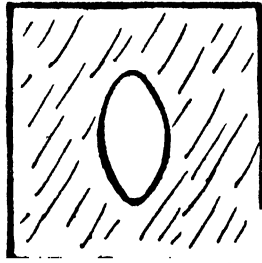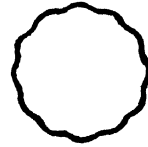
আলোর ঢেউ কোনও জিনিষে বাধা পেলে সেই জিনিষের ছায়াটার ভিতর প্রবেশ করে আর আলো ছায়ায় মিলে কি রকম বিচিত্র সুন্দর ছবি তৈয়ার করে তার দুই একটা উদাহরণ দিচ্চি। ৪নং চিত্র 'ক' একটা লোহার বা অন্য কোনও ধাতুর পাতে বাদামী আকারের একটা গর্ত্ত ও 'খ' একটা এক-আনির চেহারা। সাধারণতঃ আমরা মনে করি যে আলো যদি ঐ বাদামী গর্ত্তের ভিতর দিয়ে যায় তাহলে গর্ত্তের সামনে একটা কাগজ ধরলে, আলো গর্ত্তে দিয়ে বের হয়ে কাগজের উপর বাদামী আকারের আলোক সম্পাত করবে। আবার আলো চলার পথে যদি এক-আনিটা ধরা যায় তাহলে

এক-আনিটার অনুরূপ একটা ছায়া পড়বে। কিন্তু ৫ ও ৬নং ছবি দেখ্‌লে বোঝা যায়
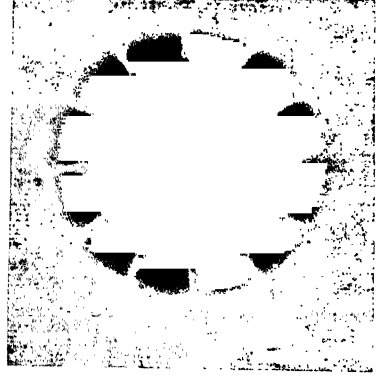
যে ছায়ার সঙ্গের বাদামী গর্ত্তটার বা এক আনিটার চেহারার অনেক পার্থক্য আছে। দেখা যায় যে বাদামী গর্ত্তের ছায়ার ভিতরে আলোক অনেক-দূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করেছে। এক-আনির ছায়াটা আরও সুন্দর। এক-আনির ধার দিয়ে আলোর ঢেউ ছায়ায় ঢুকে ঢেউএ ঢেউএ মিলে কেমন সুন্দর ছবি তৈয়ার করেছে।

ছায়ার ভিতরে এই যে আলো ঢোকে তা অতি ক্ষীণ। কাগজের উপর ছায়া ফেল্‌লে নজরে পড়া শক্ত। কাগজে না ফেলে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াতে দেখলে ছায়াটার ভিতরের রূপ স্পষ্ট দেখা যায়। ছবি তোলার জন্য বাক্সর ভিতরে বিজলী বাতি রেখে বাক্সের গায়ে ছোট ছিদ্র করে, যেমন ছোট আলোক বিন্দু পাওয়া গিয়েছিল, সেই রকম ছোট আলোক বিন্দু গোড়ায় পেতে হবে। অলোক থেকে তিন চার হাত দূরে যে জিনিষের ছায়া দেখতে চাও সেইটা ধর। জিনিষটা থেকে আরও তিন চার হাত দূরে যেখানে ছায়া দেখতে চাও সেখানে কোন কাগজের উপর ছায়া না ফেলে কাগজের বদলে একটা লেন্স ধর। বাইসিক্লের ল্যাম্প এর সামনে যে পেটমোটা কাঁচ থাকে সেই রকম কাঁচকে লেন্স বলে। লেন্সের একটু পিছনে ২।৩ ইঞ্চি দূরে চোখ রেখে লেন্সের ভিতর দিয়ে দেখলেই ছায়াটা ও তার ভিতরে আলো কতদূর প্রবেশ করেছে তা বেশ সুন্দর দেখা যায়। ফোটো তুল্‌তে হলে লেন্স দরকার হয় না। কাগজে ছায়া না ফেলে সেইখানে একটা ফোটোগ্রাফির প্লেট ধরলেই হয়ে যায়। আলোটা ক্ষীণ বলে অনেকক্ষণ

exposure দিতে হয়। আলোর জোর অনুসারে তিন চার মিনিট থেকে আধঘণ্টা পর্য্যন্তও exposure লাগে।

সাম্‌নে বাধা পেলে আলোর ঢেউ যে চারধারে ছড়িয়ে পড়ে, পরে তার একটা সহজ ও সুন্দর পরীক্ষার কথা বলে প্রবন্ধ শেষ কর্‌ব। ডান হাতের তর্জ্জনী ও মধ্যমা পাশাপাশি রাখ। এমন ভাবে রাখ যে দুইটা অঙ্গুলের মধ্যে যেন সামান্য একটু ফাঁক থাকে। আঙ্গুল দুটির মাঝের এই ফাঁকটা ডান চোখের খুব কাছে ধর। এত কাছে যে আঙ্গুল যেন প্রায় চোখের পাতায় ঠেকে যায়। এইবার এই আঙ্গুলের ফাঁকের ভিতর দিয়া দশ পনের হাত দূরে বিজলী বাতির একটা ফিলামেণ্ট লক্ষ্য করে দেখ। আঙ্গুলের ফাঁকটা এমন ভাবে ধরবে যে যেন ফিলামেণ্টটার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে থাকে! দেখবে যে ফিলামেণ্টের পাশে ডাইনে বাঁয়ে লাল নীল রংয়ের অনেকগুলা ফিলামেণ্ট যেন পাশাপাশি রয়েছে। ফিলামেণ্ট থেকে আলোর ঢেউ চোখে পৌঁছতে হলে আঙ্গুলের ফাঁকের ভিতর দিয়ে আস্‌তে হয়। আঙ্গুলের ফাঁকের ধারে বাধা পেয়ে ঢেউ পাশে ছড়িয়ে পড়ে। আমরা এই ছড়িয়ে পড়া ঢেউ দিয়ে ফিলামেণ্টটা দেখি বলে ফিলামেণ্টের দুই পাশে ঐ রকম অনেকগুলা ফিলামেণ্ট দেখি। আঙ্গুলের ফাঁকটা ছোট বড় করলে ফিলমেণ্টের প্রতিচ্ছবিটা বড় ছোট হয়।
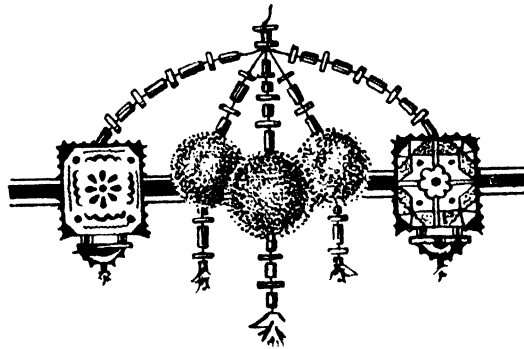
ভূতের কীর্ত্তি

শ্রীপ্যারি মোহন সেনগুপ্ত

কাটামুণ্ডু নামে এক গ্রাম
হুগলীর ঈশান কোণে।
সে গাঁয়েতে ছিল
ডাকাত-সর্দ্দার এক—
নামটি গণেশ।
একদিন গণেশের চেলা
পরাণ বিশ্বাস
ডাকাতির ভাগ নিয়ে
মুণ্ডু তার কেটে দিল কাটারির ঘায়ে।
সে মুণ্ডু খেজুর গাছে
ভূত হ'য়ে নিতি
করিতে লাগিল বাস।

একদিন সেই গাঁয়ে জমিদারী নিয়ে
ঘোষে আর বোসে দু'য়ে
খুব মারামারি।
দু'দলে লেঠেল এল
এয়া মোটা মোটা
যেন যমদূত।
ঘোষেদের দলে ছিল মেহেরালি মিঞা
প্রকাণ্ড জোয়ান!
একলা সে বোসেদের দলে
করিল ঘায়েল।

বোসেদের ছোট ছেলে হাঁদু
পিছু থেকে তলোয়ার দিয়ে
মেহেরের মাথা দিল কেটে।
হরি, হরি, একি হ'ল !—
মেহেরের ধড়
যেম্‌নি মাটীতে পড়া অম্‌নি সকলে
দেখিল লাফায়ে এল গণেশের মাথা, –
সেই দাঁত, সেই টাক –
দিনের বেলায়—
লাফায়ে লাফায়ে এসে মেহেরের ধড়ে
ব'সে গেল কাটা কাঁধে !
এ কি এ অদ্ভুত।
মেহেরের দেহ আর গণেশের মাথা
দু'য়ে যেন জুড়ে গেল !
উঠিল সে দেহ
তিন দাঁতে হাসি হেসে !!
ঘোষ বোস এ উহারে ভয়ে ধরে চেপে,
উধাও উধাও ছুটে !
এতদিন ছিল শুধু মাথা,
এবার লাগিল ধড়।
গণেশ, গণেশ তোর এত মনে ছিল ?
বাঁচা, বাপ্, বাঁচা !—
এই উঠে রব।

মিণ্টু-মাসী

শ্রীঅখিল নিয়োগী

তখন গিরিডি মেয়েদের ইস্কুলে পড়তুম।

উশ্রীর ঝরণার মতোই ছিল আমাদের হাসি-গান-গল্প-গাথায় ভর্ত্তি ছেলেবেলাকারও মধুময় দিনগুলি।

তৃতীয় শ্রেণীতে পড়তুম।

মীরা বলে যে মেয়েটি বোর্ডিংএ থেকে আমাদের সঙ্গে পড়ত—ক্লাশের আর সবার আগে আমার সঙ্গেই তার ভাব জমে উঠ্‌ল কেন সেই কথাই বলব।

মীরা বড় লোকের মেয়ে। ওর বাবা কল্‌কাতার কোন এক সওদাগরী আফিসের বড়বাবু। কাজেই চিরদিন প্রয়োজনের বেশী জিনিষই ও পেয়ে এসেছে।

কি ভাবে ড্রেস করে সাড়ী পরে পেছনে স্কোয়ার আঁচল ঝুলিয়ে দিতে হয়, তা' ও এই বয়সেই ভাল ভাবে আয়ত্ব করে নিতে পেরেছিল।

বেণী দুলিয়ে কি ভাবে রিবণ বাঁধ্‌লে ভালো দেখায় তাও ওর অজানা ছিল না।

মোট কথা ওর সমস্তটা দেহ ঘিরে অহঙ্কারের এমন একটা আবরণ দেওয়াছিল যার জন্যে সহসা ওর মনকে নাগাল পাওয়া যেতো না!

ওর বাড়ীর আদব-কায়দা, ফ্যাসান, চালচলন সম্বন্ধে ও এমন করে গল্প করত যে আমি তাতে ভারী মজা পেতুম।

বিশেষ করে ওর মিণ্টু মাসীর কথা! ক্লাশে এমন কেউ ছিল না, আর ক্লাশই বা বলি কেন—গোটা ইস্কুলে এমন মেয়ে নেই যে ওর মিণ্টুমাসীর গল্প না শুনেছে।

মিণ্টুমাসী নাকি থাক্‌তেন কাশ্মীরে। সেখানকার জানা অজানা কত গল্পই যে ও আমাদের কাছে করেছে যে, তা একে একে সব লিখে রাখ্‌লে, এদ্দিনে একখানা রাজ-সংস্করণের কাশ্মিরী রামায়ণ হয়ে উঠ্‌ত।

কিন্তু বল্‌বার কথা এই, যে মিণ্টু মাসীকেও কখনো চক্ষে দেখেনি।

ক্লাসের আর সবাই ওর গল্প শুনে যেতো চটে। কাজেই প্রাণ খুলে কেউ ওর সঙ্গে আলাপ করতে চাইত না।

কিন্তু আমার ত' তা নয়!

ওর মজার মজার গল্প—আমি খুব মন দিয়ে শুনতুম। আর মীরাও আমাকে একজন সমজ্‌দার শ্রোতা ঠাউরে ওর যত রাজ্যের আজগুবী গল্প আমার কানে ঢাল্‌ত।

ভাগ্যিস্ ও এ কথা কোনো মতেই জান্তে পারে নি যে, নিছক কৌতুক করেই আমি ওর মন গড়া আবোল্ তাবোল্ গল্প শুনে অবাক হবার ভান্ করতাম সব চাইতে বেশী।

গ্রীষ্মের ছুটির মাস খানেক আগের কথা। পূর্ণিমা রাত। দল বেঁধে সন্ধ্যে বেলা গিয়েছিলাম বোর্ডিংএ বেড়াতে।

সেখানেও অনেক মেয়ে জুটে গেল। ক্লাশেরা সবাই বল্লে, আমাদের সন্ধ্যেটা ক্রিশ্চান-হিলের ওপর কাটাতে হবে।

বোর্ডিং এর মেয়েদের জন্যে মিস্ রায়ের অনুমতি চাইতে যাওয়া হল।

তিনি হেসে বল্লেন, বেশ,—এই ত বেড়াবার উপযুক্ত সময়। আচ্ছা, আমিও তোমাদের সঙ্গে আস্ছি।

দল বেঁধে সব হাসি গল্প করতে করতে বারগণ্ডা ছাড়িয়ে উশ্রী নদীর ধারে গিয়ে পড়লুম। বীণা আমায় ডেকে বল্লে, দেখ ঊষা, এই উশ্রী নদী যখন একেবারে কানায় কানায় ভর্ত্তি হ'য়ে ওঠে, জ্যোৎস্নারাতে দেখ্তে এমন চমৎকার লাগে যে কি বল্ব। মনে হয়, শুধু সেই দিকে চেয়ে সারারাত চাঁদের খেলা দেখি।

মীরা তার কথা শুনে একেবারে ফোঁস্ করে উঠ্ল। বল্লে, কি যে কথা বল্লি বীণা! উশ্রী নদী এমন কিছু নয় যার দিকে চেয়ে চেয়ে সমস্তটা রাত কাটিয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ বল্তিস্ কাশ্মীরের কথা বুঝ্তুম। মিণ্টু মাসী লিখেছে, সেখানে জ্যোৎস্না রাতে মনে হয় যে বুঝি বা স্বর্গে চলে এসেছি।

কল্যাণী ছিল আমাদের দলের মধ্যে সব চাইতে মুখরা। ও কোনো মতেই মীরার এই ধরণের কথাবার্ত্তা পছন্দ করত না!

হয়ত হতে পারে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের জ্যোৎস্না রাত্রি শুধু চোখে দেখ্বার; কিন্তু আমাদের গিরিডির উশ্রীও ত ফেল্না নয়! তাই সে মুখটা যথা সম্ভব গম্ভীর করে বল্লে, "দেখ্ মীরা তোর মিণ্টু মাসীকে চিঠি লিখে দিস্, আমরা এখনই কেউ স্বর্গে যেতে রাজী নই। আমাদের এই উশ্রীই ভালো।"

কল্যাণীর কথার জবাব দেওয়ার মত সাহস মীরার ছিল না, তাই সেখানিকটা গুম্ হ'য়ে রইল, তারপর এক সময়ে আমায় চুপ করে বল্লে, "দেখ্লি ঊষা, কল্যাণীর কথা বল্বার ধরণ? দেখবার মধ্যে দেখেছে ত এক গিরিডি আর মধুপুর; আর একবার নাকি আমাদের কল্কাতায় গিয়েছিল; মিণ্টু মাসীদের কাশ্মীরের ধারণা ওর থাক্বে কি করে?"

আমি মীরাকে উস্কে দেবার জন্যে বল্লুম, "সত্যিই ত'—কাশ্মীরের কথা ও শুধু পড়েছি ভূগোলে—আর পড়েছি, কি ফাঁকি দিয়েছে তাই বা কে জানে? আর তোমার বেলা ত' সে কথা খাটে না। তোমার মিণ্টু মাসী নিজে রয়েছেন সেখানে!"

মীরাও আমার কথায় উৎসাহিত হয়ে বল্লে, "তুই যা একটু বুঝিস্ শুনিস্, আমি সত্যি বল্‌ছি মিণ্টু, মাসী যদি কখনো এখানে আসে ত' তোর সঙ্গে নিশ্চয় আমি আলাপ করিয়ে দেবো।"

আমি মুখ টিপে হেসে বল্লুম, "কল্যাণীর সঙ্গেও ভাব করিয়ে দিস্, তা' হলে কাশ্মীর সম্বন্ধে ওর অনেক জ্ঞান হবে।"

মীরা ঠোট উল্টে বল্লে, "বয়ে গেছে আমার ওর সঙ্গে ভাব করিয়ে দিতে,—থাক্‌বে ও বোকা হ'য়ে, তাইত' আমি চাই।"

ক্রিশ্চান-হিলের ওপরে উঠে আমরা সবাই একখানা বড় পাথরের ওপর বসে পড়লুম।

চাঁদের আলোয় গোটা আকাশটায় যেন জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে।

মিস্ রায় আমাদের ডেকে বল্লেন "এখানে ত' কেউ কোথাও নেই—তোমরা রবিবাবুর গান জানো? গাইবে কেউ?"

আমাদের ক্লাশের মধ্যে বীণার গলা ছিল ভারী মিষ্টি।

আমি বল্লুম "গা না বীণা একটা গান।"

গান জানার চাইতেও বীণার আর একটা মিষ্টি স্বভাব ছিল, সে ইচ্ছে গাইতে বল্লে ও আর বিশেষ আপত্তি করত না।

আমি দেখেছি—গান জানে এই ধরণের মেয়েদের একটা অকারণ গর্ব্ব থাকে, যার জন্য গাইতে বল্লেই তারা গাইবে না, তাদের আবার খোসামোদ করে রাজী করাতে হ'বে।

বীণার গান শুনে খুসী হ'য়ে মিস্ রায় বল্লেন "বেশ গলা তোমার। বরাবর চর্চ্চা রেখো, তা' হলে কালে তুমি খুব নাম কর্ত্তে পারবে।

সবাই সেই কথায় সায় দিয়ে বল্লে, হ্যাঁ, এ রকম মিষ্টি গলা এই অল্প বয়েসে বড় একটা শোনা যায় না।

মীরা এতক্ষণ চুপ্ করেই ছিল। এইবার আর তার বোধ করি সহ্য হ'ল না। বল্লে, এ রকম গলা আমাদের কল্‌কাতায় যে কোনো বাসায় শোনা যায়। হ্যাঁ, হ'ত মিণ্টু মাসীর গান ত' বুঝ্‌তুম—

কল্যাণী চট্ করে সরে এসে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে বল্‌লে, "ফের যদি তুই মিণ্টু মাসীর গল্প করবি ত' তোর চোখের ভেতর পাথরের কুচি দিয়ে দেবো।"

কল্যাণীকে মীরা সত্যি ভয় করত', আর তা ছাড়া ও যে দস্যি মেয়ে, যা বলে তাই করে, ওর অসাধ্য কিছুই নেই।

কাজেই মীরা এখনও ভয়ে ভয়ে চুপ্ করে গেল।

এর দিন সাতেক পরের কথা। সবে ইস্কুলে এসে পা দিয়েছি, মীরা ছুট্‌তে ছুট্‌তে

এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বল্লে "উষা, শুধু তোকে বলছি, আর কাউকে বলিস্ নি, ভাই—

বলে উৎসাহে আনন্দে সে হাঁপাতে লাগল। আমি বল্লুম "কিরে? তুই যে একেবারে লাল হয়ে উঠ্‌লি!"

মীরা আমার কানের কাছে মুখ এনে, আস্তে আস্তে বল্লে, "মিণ্টু মাসী এখানে আস্‌ছে।"

আমিও উৎসাহিত হয়ে বল্লুম, "বলিস্ কিরে, তা আমায় এদ্দিন জানাস্ নি?"

যেন এই না জানানোর দরুণ আমার মস্ত বড় একটা ক্ষতি হয়ে গেছে।

মীরা বল্লে, "বারে— চিঠি ত পেলাম আজ সকালে, তোকে বুঝি আমি না জানিয়ে থাক্‌তে পারি?"

আমি আশ্বস্ত হ'য়ে বল্লুম "তাই বল্, নইলে আমি ভাবছিলুম তুই আমায় না বলে কি করে রয়েছিস্।"

মীরা বল্লে, "মিণ্টু মাসী কি লিখেছে জানিস্?—গিরিডিতে তাঁর কে এক বন্ধু আছে। এই গ্রীষ্মের ছুটির কিছু আগেই এসে তার সঙ্গে দেখা করে আমাকে নিয়ে, কাশ্মীরে চলে যাবে। আমার ইচ্ছে হচ্চে তোকেও সঙ্গে নিয়ে যাই—তা হ'লে তুই মিণ্টুমাসীর কাছে কত কি যে শিখতে পারতিস্—সত্যি একটা মানুষ হ'য়ে ফিরে আস্‌তিস তা'হলে।"

আমি অবাক হবার ভান্ করে বল্লুম, "বলিস্ কি?" মীরা মাথা নেড়ে বল্লে, হ্যাঁ সত্যি ভাই, তখন আর কিছুতেই বল্‌তিস না যে বীণার গলা মিষ্টি।"

মীরা বলেছিল বটে, শুদ্ধ তোকে বলছি—কিন্তু টিফিনের ঘণ্টায় দেখা গেল—ইস্কুলের দারোয়ান ছাড়া আর সকলেই এ সংবাদ জানে!

কল্যাণী আমায় কোণে ডেকে নিয়ে বল্‌লে, "দেখ্ উষা, ওকে একটু জব্দ করতে হবে কিন্তু আমায় ও দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারে না—জানিস্ ত। তাই তোকেই এ ভার নিতে হবে—অবশ্য আমি তোকে সাহায্য করবো।"

আমি বল্লুম, "ব্যাপারটা কি তাই বল্‌না—কল্যাণী মুচ্‌কি হেসে বল্‌লে, এই পয়লা এপ্রিলের দিন মীরাকে জব্দ করতে হ'বে।

আমি বল্লুম, "কিন্তু কি করবি তাই বল্ না—জানিস্ ত এ রকম সৎ ইচ্ছায় আমার এতটুকু আপত্তি নেই!"

কল্যাণী ফিস্ ফিস্ করে বল্‌লে "কাউকে মিণ্টু মাসী সাজিয়ে মজা করতে হ'বে।"

হঠাৎ আমার মাথায় এক বুদ্ধি এসে গেল—লাফিয়ে উঠে বল্লুম, "হ'য়েছে।"

কল্যাণী বল্‌লে, কি রে ?

আমি বল্‌লুম—আমার এক মামাতো বোন দু'দিনের জন্য এখানে আস্‌ছে, কালকেই আস্‌বে, কলেজে পড়ে এমন হাসাতে পারে- অথচ গম্ভীর যখন হয় ত' ভাব্‌বি, এ বুঝি বছরে একটি বার মাত্র হাসে। তাকে যদি সব খুলে বলিস্ ত' সব প্ল্যান সেই মাথা থেকে বের করে নেবে—তোকে আর কিচ্ছুটি কর্‌তে হ'বে না।"

পরদিন সুরমাদি আস্‌তে, তাকে সব বলে ধরে বসলুম—"মীরাকে তোমায় জব্দ কর্‌তেই হ'বে।"

সুরমাদি বল্‌লে, "ওর মাসীকে ও দেখিনি ত কখনো ?"

আমরা বল্‌লুম সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। সুরমাদি মুচ্‌কি হেসে বল্‌লে, "আচ্ছা।" তারপর কাপড় জামা পরে আমাদের সঙ্গে বোর্ডিংএ বেড়াতে গেল।

আমরা বরাবর তাকে মীরার ঘরে নিয়ে হাজির কর্‌লুম। ভারী সুবিধে হ'ল এই যে তখন ঘরে আর কেউ ছিল না।

সুরমাদি বল্‌লে, "তুমি মীরা, তা' কবে যাচ্ছো আমার সঙ্গে কাশ্মীর বলো।"

মীরা অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুরমাদি বল্‌লে, "ওরে, পাগ্‌লী আমি যে তোর মিণ্টু মাসী, তা' তুই চিন্‌বি কি করে বল্।

মীরা আনন্দে একেবারে লাফিয়ে উঠ্‌ল। সুরমাদিকে জড়িয়ে ধরে বল্লে, "সত্যি ? তা তুমি ওদের সঙ্গে কোত্থেকে এলে !"

সুরমাদি বল্লে, "ঊষার বড় বোন নিশা যে আমার ছেলে বেলার বন্ধু। সেইখানেই উঠেছি। তা' ওরা ত' আর আমায় চিনতো না—এইখানে এসে আলাপ হ'ল। চল্ ওদের বাসায় চল, তোর জন্যে কাবুলের কত মেওয়া নিয়ে এসেছি !

মীরা বল্লে, কাবুলের মেওয়া—তুমি কি কাবুল গিয়েছেলে নাকি ?" বলে আমাদের দিকে চেয়ে গর্ব্বের হাসি হাস্‌তে লাগলো।

সুরমাদি বল্লে, "আরে কাবুল আর কাশ্মীর ত এপাড়া আর ওপাড়া, এই তোদের যেমন শ্যামবাজার আর বউবাজার। চল্, ওঠ, আর দেরী করিস্ নে।"

লাফাতে লাফাতে মীরা আমাদের সঙ্গে বাসায় চলে এলো।

সুরমাদি কল্‌কাতা থেকে সঙ্গে করে অনেক খেজুর, কিস্‌মিস, বাদাম, পেস্তা, আঙ্গুর এনেছিল। সেই গুলো মীরাকে খেতে দিয়ে বল্লে, "কেমন লাগছে রে মীরা ? মীরা বল্লে, তোমাদের কাবুলের মেওয়া গুলি ত' ভারী চমৎকার। কল্‌কাতায় কিন্তু এমন টাট্‌কা জিনিষ পাওয়া যায় না।"

দু'দিন বাদে সুরমাদির কল্‌কাতায় ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। বল্লে, মীরা আমি

পরশু কাশ্মীর ফিরে যাচ্ছি। এ দু'দিন আর তোর সঙ্গে দেখা হবেনা—আমি উশ্রী ফল্স্ এবং এখানকার আরো সব জিনিষ দেখব কিনা! তুই পরশু সন্ধ্যে বেলা বোর্ডিংএ একেবারে তৈরী হয়ে থাকিস্। তারপর কাশ্মীর গিয়ে তোকে কত কি দেখাবো।

মীরা খুসী হয়ে চলে গেল।

সেদিন সকাল থেকে উঠেই মীরা জিনিষ পত্র প্যাক্ করতে সুরু করে দিলে। বোর্ডিংএর বামুন, চাকর ঝি—সবাইকে বক্‌শিশ দিয়ে নীচ থেকে রাত্তিরের খাবার খেয়ে তাড়াতাড়ি ওপরে ফিরে গিয়ে দেখে তার সুটকেস্‌টার ওপর কল্যানীর হাতের বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—"এপ্রিল ফুল।"

সেই দিন থেকে তাকে আর কেউ মিণ্টু মাসীর গল্প বল্‌তে শোনে নি।
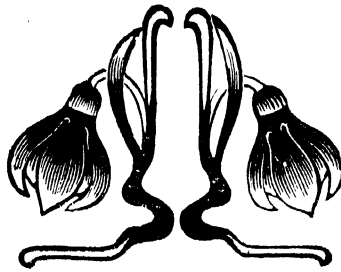
বুড়ীর বিপদ্

(আবৃত্তি)

শ্রীনিখিল মোহন সেন, বি, এ।

(গঙ্গাজলের কলসী কাঁখে বুড়ীর প্রবেশ)

বুড়ী। (গঙ্গাজল ছিটাইতে ছিটাইতে)

এ পাড়ার পথ ঘাট,
বারো মাসে ছায় না ঝাঁট্,
এঁটো কেটো সব হেথা হোথা প'ড়ে।
গঙ্গাজল ছিটিয়ে তাই,
কোনমতে চ'লে যাই—
রাম—রাম, ইঁদুরটা রয়েছে ম'রে।

(লাফ দিয়া মরা ইঁদুর ডিঙ্গাইয়া গেল)

(চার পাঁচটি বালিকার প্রবেশ)

বালিকাগণ। বুড়ি—বুড়ি—বুড়ি,
এই পথে দিলাম থুড়ি!

(সকলে থুতু ফেলিল)

বুড়ী। মর্ মর্ ছাই কপালী,
পথে-ঘাটে বেড়ান খালি,
ঘরে বুঝি হয় না কারু ঠাঁই?
কাল্ পড়েছে বিষম কাল্
পথে ঘাটে মেয়ের পাল,
ধম্ম-কম্ম থাকবে কি আর ছাই!

বালিকাগণ। বুড়ি—বুড়ি—বুড়ি
এই পথে দিলাম থুড়ি!

(পুনরায় থুতু দিল)

বুড়ী।　　　　পথটা দিল এঁটো ক'রে,
যাবো এখন কেমন ক'রে ?
　　এ পাশ দিয়ে পথ কাটিয়ে যাই।

(বালিকাগণ মরা ইঁদুরটি তুলিয়া সেই দিকে নিক্ষেপ করিল)

বালিকাগণ।　　　　বুড়ি, ইঁদুর ম'রে
ঐ পথে রয়েছে প'ড়ে।

বুড়ী।　　　　শুধু কেবল 'বুড়ি - বুড়ি'
তোরা ভারী কচি ছুঁড়ি,
　　রূপ দেখে ভূত আঁংকে পলায়।
হয়েছেন সব লম্বা ধাড়ি
শুধুই কেবল সেমিজ-শাড়ী,
　　গরবে আর পা পড়ে না ধরায় !

বালিকাগণ।　　　　বুড়ি—বুড়ি—বুড়ি,
তোর বয়েস হ'ল ক' কুড়ি ?

বুড়ী।　　　　তাতে তোদের কাজ কিলা',
ভালো চাস্‌ত শীগ্‌গির্‌ পালা,
　　নইলে মাথায় ছিটিয়ে দেবো জল।

বালিকাগণ।　　　　সেই তো ভালো, বাড়ী যেয়ে
বলবো—এলাম গঙ্গা নেয়ে !

বুড়ী।　　　　ওমা মেয়ে—ছাখ কথার ছল !

(বুড়ী মেয়েদের গায়ে জল ছিটাইয়া দিল—গায়ে জল পড়িবার পূর্ব্বেই মেয়েরা অন্য দিকে পলায়ন করিল। পুনরায় সেই দিকে জল ছিটাইল. কিন্তু মেয়েরা সরিয়া গেল।)

আরে ম'লো- একি জ্বালা,
ঘুরছে যেন নাটাইর শলা
　　এ গুলোরে আঁটবো কেমন ক'রে ?

বালিকাগণ। বুড়ি - বুড়ি - বুড়ি,
এই পথে দিলাম থুড়ি !
আমরা চল্লাম ঘরে।
(প্রস্থান)

বুড়ি। রাম—রাম—হরে-হরে,
পথটা দিলে এঁটো ক'রে !
—আবাগীদের মরণও কি নাই ?
ছিটিয়ে চলি' গঙ্গাজল,
যেমন আমার কম্মফল,
নইলে এখন কি করেই বা যাই ?
ঘেন্নাপিত্তি নেইকো মোটে
কথার শুধুই বহর ফোটে
অবাগীদের পড়ুক মুখে ছাই !
(গঙ্গাজল ছিটাইতে ছিটাইতে বুড়ীর প্রস্থান)
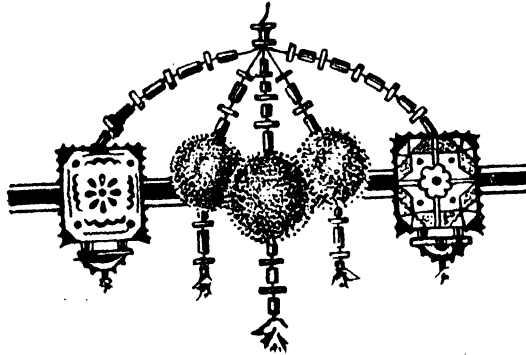
শ্রীমন্দির

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী

শ্রীমন্দির বৌদ্ধদিগের একটি প্রাচীন কীর্ত্তি। সিংহলের একখানি ধর্ম্মপুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ—১৪৩ খৃঃ পূর্ব্বে বুদ্ধের নির্ব্বাণের পর তাঁহার জনৈক শিষ্য পবিত্র দন্ত লইয়া পুরীতে আগমন করেন। তাহার পর, উড়িষ্যাপ্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয় এবং পরবর্ত্তী দশ শতাব্দকাল উৎকল প্রদেশে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের অসামান্য প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

পরবর্ত্তী কালে হিন্দুগণ এই বৌদ্ধগঠিত নিলয়ে দারুব্রহ্ম মূর্ত্তির স্থাপনাদ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মকে একাসন প্রদান করিয়াছেন।

উৎকলগ্রন্থে জগন্নাথ দেব বুদ্ধাবতার বলিয়াই কথিত। নিম্নে দুই একটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

এবে বৌদ্ধরূপে হরি নীলাচল পরে
শ্রীমুখ দেখাই মুক্তি দেউছে সবারে”
“দারুব্রহ্মরূপে মুহি এঠারে বসিবি
বৌদ্ধরূপে নীলাচলে লীলা প্রকাশিবি।

জগন্নাথদেব যে বুদ্ধদেবের নিরাকার প্রতিমূর্ত্তি পাণ্ডাগণও এইরূপ বলিয়া থাকে, পণ্ডিতদিগের মতেও মন্দিরের ত্রিমূর্ত্তি বৌদ্ধ সাঙ্কেতিক চিহ্নের রূপান্তর মাত্র।

মধ্যে মধ্যে জগন্নাথদেবের দারুময় কলেবর পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

প্রবাদ এই, সমুদ্রদেব এই উদ্দেশ্যে যথাসময়ে একখানি বৃহদাকার কাষ্ঠ ভাসাইয়া আনিয়া তীরে তুলিয়া দেন। সম্ভবতঃ এই দারুমূর্ত্তির মধ্যে বুদ্ধের অস্থিপঞ্জর আজিও সংরক্ষিত।

শ্রীক্ষেত্রের অন্নসত্রের দৃশ্য দেখিলে হৃদয় আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠে। এই উৎকলেই সম্রাট ধর্ম্মাশোকের প্রসিদ্ধ অনুশাসনলিপি শৈলাঙ্গখোদিত হইয়া সর্ব্বজীবে অহিংসা সাম্য ও মৈত্রী প্রচার করিতেছে। শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া আমরা ইহার চাক্ষুব প্রমাণ লাভ করি। এখানে জাতিবিচার নাই, উচ্চ নীচের ভেদাভেদ নাই,—সকলেই এখানে সেই পরমপুরুষ, জগন্নাথ দেবের সন্তান! যদি সেখানে কোন অস্পৃশ্যজাতীয় লোককে স্পর্শ করিতে তুমি মনে মনে ঘৃণা বোধ কর, তবে তুমি হেয় অধম হইয়া পড়িবে।

শ্রীক্ষেত্র—যাত্রীগণ তীর্থ হইতে ফিরিবার সময় সযত্নে মহাপ্রসাদ লইয়া আসেন, তাহা আর কিছুই নহে, জগন্নাথদেবের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন। তাহাই শুষ্ক হইয়া হিন্দুর ঘরে ঘরে সযত্ন-রক্ষিত হইয়া থাকে এবং তাহার এক কণামাত্র হিন্দুমাত্রেই ভক্তিসহকারে গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন।

হিন্দুর আচার প্লাবিত দেশে বুদ্ধদেবের উদার ধর্ম্ম মহিমা আজিও এই অনুষ্ঠানে সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। চৈতন্যদেব বহু প্রয়াসেও এই জাতিভেদ উঠাইতে পারেন নাই। বুদ্ধদেবের মহিমা স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

জগন্নাথদেবের দর্শন পাইতে হইলে পাণ্ডাগণের আশ্রয় লইতে হয়। ইহারা সংখ্যায় বড় অল্প নহে, মন্দিরদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া জগন্নাথদেবের খাস দরবার পর্য্যন্ত, কত যে পাণ্ডা, তাহার সংখ্যা নাই। ভগবানকে লাভ করিতে হইলে খৃষ্টানদিগের যেমন একমাত্র যীশুখৃষ্টকে প্রসন্ন করিতে হয়—এখানে সেইরূপ পাণ্ডার দলকে বশে আনিয়া তবে জগন্নাথ-দেবের দর্শনলাভ ভাগ্যে ঘটে! বড় সহজ কথা নয়! তাই যাত্রার সময় মনে মনে বেশ একটু ভীত হইয়া সঙ্গের বশীকরণ থলিয়াটি পূর্ণ করিয়া লইতে ত্রুটি করি নাই। কিন্তু মন্দিরে গিয়া বুঝিলাম, ভয় জিনিসটা রবারের থলির মত ফুলাইলে খুব ফোলে বটে, কিন্তু থাবড়াইয়া দিলে একেবারেই চ্যাপ্টা হইয়া যায়। পঞ্চতঙ্কাতেই খাস দরবারের পাণ্ডাগণ সন্তুষ্ট হইয়া গেল, আর দ্বারের, দালানের, অন্যান্য নানাস্থানের সঙ্গধারী প্রহরী পাণ্ডা প্রত্যেককে দুই চারি আনা দিয়াই ঠাণ্ডা করিলাম।

অনেকে পাণ্ডাদিগের এই ভিক্ষা দৌরাত্ম্য অসহ্য মনে করেন, আমি কিন্তু তা, মনে করি না। ইহারা নবাগত যাত্রীর সর্ব্ববিধ সুবিধার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া নির্ব্বিঘ্নে জগন্নাথদেবের দর্শনলাভ ঘটাইয়া দেয়। এই সামান্য অর্থব্যয় তাহাদের উপকারের যৎকিঞ্চিৎ প্রতিদান মাত্র।

শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে প্রধান প্রধান হিন্দুদেবদেবীর অন্যূন ৫০টী ক্ষুদ্রতর মন্দির আছে। বলা বাহুল্য সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার মন্দিরটিই জগন্নাথদেবের। ঘোর অন্ধকার মধ্যে রত্নসিংহাসনে জগন্নাথ সুভদ্রা ও বলরাম এই ত্রিমূর্ত্তি একত্র বিরাজিত! জগন্নাথের মন্দির ছাড়িয়া দিলে ক্ষুদ্র মন্দিরগুলির মধ্যে লক্ষ্মীর মন্দিরই বৃহত্তম। ছোট ছোট মন্দির গুলিতে অন্যান্য দেবদেবীর অধিষ্ঠান।

কি প্রকাণ্ড মন্দির! বাহির হইতে মনেই হয় না মন্দির তেমন বড়। ভিতরে প্রবেশ কর—বড় বড় দালানের পর দালান প্রত্যেক দালানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থাম। থামে, থামে, প্রকোষ্ঠে, প্রকোষ্ঠে, দেয়ালে, দেয়ালে, চূড়ায়, দরজায়, ভিতরে, বাহিরে, কেবলই খোদিত, মুর্ত্তি সমূহে পরিপূর্ণ।

কোথাও নৃসিংহ, হরিহর, ব্রহ্মা, গণেশ, নারদ, রাম, দশানন প্রভৃতি প্রভুগণের চিত্র। কোথাও শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ; কৃষ্ণ রাখাল বালকদিগের সহিত গরু চরাইতেছেন ; কোথাও শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতেছেন, গোধনগুলি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে। কোথাও রামের রাজ্যাভিষেক, সীতার বিবাহ—রামের সিংহাসনারোহণ ইত্যাদি। কোন্‌টি রাখিয়া কোন্‌টি দেখিব বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না, এই সকল দেবদেবীদিগের চিত্রাবলীর মধ্যে, একটি স্থানে হিন্দুরমণী মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তিটি বড়ই মনোরম। মাতার কর্ণে সুবৃহৎ কুণ্ডল, বাহু ও প্রকোষ্ঠে অলঙ্কার। পুত্রকে বক্ষে তুলিয়া ধরিয়া তন্ময়ভাবে তাহার প্রতি চাহিয়া আছেন ; শিশুও মাতার মুখের দিকে সহাস্য বদনে চাহিয়া রহিয়াছে। এই চিত্রটি অতিশয় চিত্তাকর্ষক।

প্রাচীরের চারিদিকে চারিটি তোরণ। পূর্ব্ব তোরণটি সিংহদ্বার ; এখানে দুইটি সিংহ বিরাজিত। দক্ষিণ তোরণ অশ্বদ্বার—অশ্বমূর্ত্তিযুক্ত ; উত্তরে হস্তিমূর্ত্তি ; তাই ইহার নাম হস্তিদ্বার। পশ্চিম তোরণটি রক্ষকমূর্ত্তিশূন্য ইহার নাম যজ্ঞদ্বার।

শুনিলাম এই মন্দির চূড়ার গম্বুজ সমগ্র একখানি পাথর কাটিয়া প্রস্তুত। গম্বুজের চারিধারে, চারি খানা বড় পাথরও নাকি আস্ত পাথর। এখানকার জনশ্রুতি, এই জগন্নাথ-দেবের মন্দির একটা বড় পাহাড়কাটা মন্দির ! অসম্ভব নহে ! পুরীর ত্রিসীমায় ছোট পাহাড়ও যদি দেখা যায় না, তথাপি বোধ হয় নিকটবর্ত্তী পাহাড় কাটিয়া সমুদ্রপথে এখানে আনীত হইয়াছিল ; ইহা অসম্ভব নহে।

জগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখস্থিত অরুণস্তম্ভ, কনার্কের সূর্য্যমন্দির হইতে তুলিয়া আনিয়া, এখানে প্রোথিত করা হইয়াছে। জগন্নাথদেবের ভোমমণ্ডপের দরজার উপর যে নবগ্রহ-মূর্ত্তি আছে—তাহাও নাকি কনার্ক সূর্য্য মন্দিরের অংশ বিশেষ !

জগন্নাথ মন্দির ছাড়া পুরীতে দেখিবার আরও অনেক স্থান আছে ; গুঞ্জোবাড়ী আঠারনালা, চন্দন সরোবর ইত্যাদি, ইত্যাদি।

গুঞ্জোবাড়ী জগন্নাথদেবের গ্রীষ্মবাস মন্দির। রথযাত্রাকালে এইখানে ত্রিমূর্ত্তির অধিষ্ঠান হয়। আঠারোনালা একটি সেতুর নাম। এই সেতু বিনা খিলানে নির্ম্মিত। আঠারোনালার প্রত্যেকটি স্তম্ভ চূড়ায় তির্য্যগ্‌ভাবে সজ্জিত পাথরের সারির উপর এই সেতু স্থাপিত। চন্দন সরোবরের জল অতিশয় নির্ম্মল। ইহার বক্ষে একটি কৃত্রিম দ্বীপ এবং চারি-দিকেই বাঁধাঘাট। ঘাটের সিঁড়িগুলি জলের মধ্যে ঝক্ ঝক্ করিতেছে—দেখিতে বড় সুন্দর !

শুনিলাম শ্রীমন্দির হইতে কিছু দূরে দূরে দু-একজন যোগী তপস্বী বাস করেন। ইহারা নাকি অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন সিদ্ধ পুরুষ ! পুরীতে আসিয়া অনেকেই ইঁহাদের দর্শন করিতে যান ! আমাদের ভাগ্যে সে সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে নাই !

স্বরলিপি
শ্রীবাণী দেবী।

বাঁশরী

কথা ও সুর
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খাম্বাজ তেতালা !

প্রাণে বাজাও তোমারি বাঁশরী !
প্রাণে বাজাও তোমারি বাঁশরী।
প্রাণে বাজাও, প্রাণে বাজাও,
প্রাণে বাজাও তোমারি বাঁশরী।
উঠুক ধ্বনিয়া সুরের লহরী, ছুটুক সে ঢেউ প্রাণের উপরি।
সেই ঢেয়েতে বসিয়া সুখেতে,
প্রাণে বাজাও তোমারি বাঁশরী।
যে সুরে আজ জীবনতন্ত্রী বাজাইলে বন্ধু জীবনযন্ত্রী,
সেই সুরে দাও পরাণ ভরিয়া।
আনন্দ ছুটুক দুকুল ছাইয়া—
প্রণে বাজাও তোমারি বাঁশরী।
শুনিয়া পরাণ আকুল আমার, রইতে নারে ঘরেতে আঁধার,
হওয়ায় খোলা, আলোয় খোলা,
দিন রাতি যে আপন ভোলা,
রইতে চাহি বিভোর গানে তৃপ্তি নাহি পরাণ মানে—
প্রাণে বাজাও তোমারি বাঁশরী।

স্বরলিপি

২´ ৩ ০ ১
II { পা ধা পধণা—া | ধা—া পা মা | সা—া সা গা | —া মা পা—া } I
প্রা ণে বা০০ ০ জা ও তো মা রি ০ বঁা ০ ০ শ রী ০

২´ ৩ ০ ১
I না না না—া | না—া র্সা না | র্সা—া র্সা না | া ধা র্স্না ধা I
প্রা ণে বা ০ জা ও তো মা রি ০ বঁা ০ ০ শ রী ০

২´ ৩ ০ ১
I পা ধা পা ধা | পধা ণা া া | পা ধা পা া | পর্সা া া া I
প্রা ণে বা ০ জা০ ও প্রা ণে বা ০ জা ও

২´ ৩ ০ ১
I পা ধা পা ধা | পধা ণর্সা না ধা | ঃপঃ মগা গাঃ মঃ | পা পা পা—া I
প্রা ণে বা ০ জা০ ০ও তো মা ০ রি বঁা ০ ০ শ রী ০

২´ ৩ ০ ১
I না না না া | না—া র্সা না | র্সা া র্সা ণধা | পা ধা স্না ধা II
প্রা ণে বা ০ জা ও তো মা রি ০ বঁা ০০ ০ শ রী ০

২´ ৩ ০ ১
I { মা মা মা ণা | ধা ধা ধা না | না র্সা র্রা সা — সা না র্সা া I
উ ঠু ক ০ ধ্ব নি য়া ০ সু রে র ০ ল হ রী ০

২´ ৩ ০ [ধ ণা] ১
I র্সা র্সা ণা ণা | ধা পা ধা া | ধা ণা ধা র্সা | ণা দা পা া } I
ছু টু ক্ সে ঢে ০ উ ০ প্রা ণে র ০ উ প রি ০

২´ ৩ ০ ১
I মা া ধা ধা | ধা া ধা ণা | ধা ণা ধা র্সা | না ধা পা া II
সে ০ ই ঢে য়ে ০ তে ০ ব সি য়া ০ সু খে তে ০

২´ ৩ ০ ১
I { পনা । । না | না । নধা পা | পা না র্সা না | র্সা । র্সা । I
যে ০ ০ সু রে ০ আ০ জ্ জী ০ ব ন তন্ ০ ত্রী ০

২´ ৩ ০ ১ [—।—]
I র্সণা ণা—। ণা | ধা পা ধা । | ধা ণা ধা র্সা | র্স্মা ধা পা না } I
বা জা ই লে ব ০ ন্ধু ০ জী ০ ব ন যন্ ০ ত্রী ০

২´ ৩ ০ ১
I র্সা—। র্গা র্গা | র্গা—। র্গা—। | র্গা র্মা র্গর্মা র্পা | র্মা র্গা র্গর্রা র্মনা I
সে ০ ই সু রে ০ দা ও প রা ণ০ ০ ভ রি য়া০ ০০

২´ ৩ ০ ১
I না র্সা—। র্সর্রা | র্রা—। র্সা—। | না র্সা নর্সা র্রা | র্সা না ধা—। II
আ ন ০ ন্দ ছু ০ টু ক্ হৃ কু ল০ ০ ছা ই য়া ০

২´ ৩ ০ ১
I { সা সা সা—। | রা—। রা গা | সা গা গা—। | মা—। মা—। I
শু নি য়া ০ প ০ রা ণ আ কু ল ০ আ ০ মা র

২´ ৩ ০ ১
I মা—। গমঃ পঃ পা | পা—। পমা গা | গা মা মপা ধণা | ধা—। পধা—। } I
র ০ ০ ই তে না ০ রে০ ০ ঘ রে তে০ ০০ আঁ ০ ধা র্

২´ ৩ ০ ১
[র্সাঃ নঃ র্রা—র্জ্জ]
I { মা—। মা ণা | ধা—। ধা না | না র্সা র্রা র্সা | র্সা না র্সা—। I
হা ও য়া য় খে ০ লা ০ আ ০ লো য়্ খে ০ লা ০

২´ ৩ ০ ১
I পর্সা—।—। ণা | ধা পা ধা—। | ধা ণা ধা র্সা | ণা ধা পা—। } I
দি ০ ন্ রা তি ০ যে ০ আ প ন ০ ভো ০ লা ০

২´ ৩ ০ ১
র্সা—। র্গা র্গা | র্গা—। র্গা—। | র্গা র্মা র্গর্মা র্পা | র্মা র্গা র্রর্সর্মা—। I
র ০ ই তে চা ০ হি ০ বি ভো র০ ০ গা ০ নে০০ ০

২´ ৩ ০ ১
I না—।—। র্সা | র্সর্রা—। র্সা—। | না র্সা নর্সা র্রা | র্সা ণা ধা—। IIII
তৃ ০ ০ প্রি না ০ হি ০ প রা ণ০ ০ যা ০ নে ০

প্রিয়ার্থিনী

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ,

শ্রাবস্তী দেশের কোন এক গ্রামে এক বৌদ্ধ বিহার ছিল। তোমরা হয়ত জান, সে অঞ্চলে বুদ্ধদেবের অতি প্রসিদ্ধ জেতবন ছিল, বৎসরের অধিককাল সেই খানেই তিনি কাটাইতেন। যখন সময় করিয়া উঠিতে পারিতেন তখন দূরান্তরের বৌদ্ধবিহারেও তাঁহার পায়ের ধূলো পড়িত, এমন এক সুযোগে তিনি ঐ গ্রাম্যবিহারে পদার্পণ করিয়া ছিলেন। সেই মন্দিরে আসিয়া দেখিলেন শ্রমণেরা কোন দুঃখে যেন ম্রিয়মাণ, তাঁহাদের মুখচোখ যেন অশ্রুজলে ফুলিয়া গিয়াছে। তোমরা জান, সন্ন্যাসীরা গৃহস্থের ন্যায় কাঁদিতে পারে না, কাঁদিবার কোন কারণও নাই। কেননা তাঁহাদের ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র থাকে না, সবকেই ছাড়িয়া যাইতে হয় তবে সন্ন্যাসী হওয়া যায়। বড় শক্ত কথা! এমন সন্ন্যাস লইয়া শ্রমণেরা কাঁদ কাঁদ হইয়াছে কেন জানিতে শ্রীবুদ্ধের ইচ্ছা হইল। ইহাত ভাল নয়, এরা কাঁদিবে কেন? কাঁদিবার অধিকারও নাই, কাঁদিলে ভিক্ষু নাম কাড়িয়া ফেলিতে হইবে।

বুদ্ধদেবের কৌতুহল দেখিয়া, তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান, তিনি সকল ঘটনা শ্রীগুরুর চরণে নিবেদন করিলেন। "ভগবন্, এই গ্রামে একটি মেয়ের বিবাহ হইয়া ছিল, তাহাকে আমরা বাল্যাবধি জানি, আশৈশব সে দেবতার চরণে ফুল জল দিয়া বলিত—'পতি সনে মিলাও হে প্রভো!' তাহার আচরণ পরম সুন্দর, সে ছিল ফুলেরই ন্যায় একটি পাপহীন লাবণ্যের খনি; যখনই পূজার দিন আসিত তখনি সে নৈবেদ্য সাজাইত এবং দেবতার নামে উৎসর্গ করিত আর বলিত—'পতিসনে মিলাও প্রভো!' যখন তাহার ষোল বৎসর পূর্ণ হইয়া আসিল, তখন এই গ্রামে তাহার বিবাহ হইল। বিবাহের পরেও এই বালিকা পূর্ব্বের ন্যায় দেবসেবায় ব্যস্ত থাকিত।

তাহার অবাস সংলগ্ন হওয়ায় আমাদের এই বিহারের প্রতি তাহার দৃষ্টি গেল। গ্রাম্যযাত্রিদের সহিত সেও লাজনম্র মুখে বিহার দর্শনে আসিত, আমাদের বিশেষ উৎসবের দিনে সে শান্ত ছবির মত বিহারের এক কোণে আসিয়া ঠাঁই লইত। এই রূপে ধীরে ধীরে সে আশ্রমের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়া গেল। তখন তাহার এখানে আসিতে আর কোন সঙ্কোচ ছিল না। সে আশ্রমের কাজ আপন হাতে

করিবার ভার লইল; বিহারটিকে ধুইয়া মুছিয়া পটের ন্যায় করিয়া তুলিত, কোন খানে একটু আবর্জ্জনা থাকিতে পাইত না। যে প্রশস্ত কক্ষে ভিক্ষুদের বিচার বিতর্ক হইত, সেই সভাগৃহের মেঝেতে সে মাদুর পাতিয়া দিত যেন ভিক্ষুরা আরামে বসিতে পারে, সন্ধ্যায় বিহারের দীপ নিজের হাতে জ্বালিয়া দিত। ভিক্ষুদের তৃষ্ণা পাইলে জল আনিয়া দিত, পা ধুইবার জন্যে পাদ্যার্ঘ্য সাজাইত। এমনি করিয়া সে বিহারের সহিত মিশিয়া গেল যে, ভিক্ষুদের তপশ্চরণে তাহার হাতের পরশ স্পষ্ট টের পাওয়া যাইত।

এই সকল খুঁটিনাটি অনুষ্ঠানের মধ্যে সে যেন তাহারি পূজার উপকরণ সাজাইত এবং তন্ময় হইয়া সকাল সন্ধ্যায় প্রার্থনা করিত 'হে প্রভো, পতিসনে মিলাও,' ভিক্ষুদের কাণে এই করুণ মিনতি ভাসিয়া আসিত, তাহারা ইহা শুনিতে শুনিতে এত অভ্যস্ত হইয়া গেল যে, শেষে সেই বালিকার নাম পড়িয়া গেল প্রিয়ার্থিনী। তাহার আলয়ে সে ছিল একেবারে লক্ষ্মীপ্রতিমা, সেখানে স্বামীর ও গুরুজনের সুখবিধানই ছিল তাহার অতি প্রিয় সেবাধর্ম্ম ক্রমে তাহার অঙ্কে চারি পুত্রের সমাবেশ ঘটিল। গৃহিণীপনায় ইহার যৌবন পার হইয়া প্রৌঢ়ের আঙ্গিনায় পৌঁছিল, এই দীর্ঘসময় জুড়িয়া তাহার সহিত বিহারের কত না ইতিহাস জড়িত। অদ্য সহসা সংবাদ আসিল, সেই প্রিয়ার্থিণী আর ইহ জগতে নাই, অতি অল্প সময় অসুখ ভোগ করিয়া সে লোকান্তর গমন করিয়াছে। এই নিদারুণ সংবাদ ভিক্ষুদের প্রাণের তারে বড় আঘাত দিয়াছে, তাই আজ ইহারা কাতর প্রাণ, শোক অশোভন হইলেও প্রিয়ার্থিনীর প্রতি ইহাদের মন এতটা অনুকুল ছিল যে, শোক ইহাদের মুখে চোখে স্বতঃই আঁকিয়া গিয়াছে।'

বুদ্ধদেব সবই বুঝিতে পারিলেন, তপস্যার মৌন মহিমায় তাঁহার মুখ অতি প্রশান্ত,—মন যেন ধ্যানের কোন্ অতল তলে তলাইয়া যাইতেছে। ভিক্ষু প্রশ্ন করিল—'প্রভো, প্রিয়ার্থিনী এখন কোথায়?' তখন সন্ধাতারার ন্যায় বিহারের দীপগুলি জ্বলিয়া উঠিল, আকাশের তারারা যেন নিরুদ্ধ শ্বাসে বুদ্ধদেবের মুখে উত্তর শুনিতে উৎসুক হইয়া কাল গুণিতে লাগিল। বুদ্ধদেব কহিলেন—'সে এখন তাহার প্রিয়সন্নিধানে, প্রিয়েরই সহিত মিলিত হইয়াছে!' এই কথাগুলি নিশার বাতাসে ভাসিয়া বুঝি তারালোকে চলিয়া গেল। এদিকে ভিক্ষুদের মধ্যে বড়ই ফিস্ ফাস্ চলিতে লাগিল,—প্রভুর মুখে একি কথা?

প্রিয়ার্থিনী তাহার স্বামী পুত্রকে শোকসাগরে ভাসাইয়া প্রিয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, ········ বিচ্ছেদের মধ্যে প্রিয়ের সহিত মিলনত অসম্ভব! প্রভুবাক্যের সামঞ্জস্য হয় কেমন করিয়া?

বুদ্ধদেবের মন ধ্যানের গভীরতায় ধাপে ধাপে নামিয়া যাইতেছিল, কিন্তু

মাতৃমূর্ত্তি

শিল্পী—র‍্যাফেল (ড্রাসডেন চিত্রশালা)

INDIAN Photo Engraving Co Calcutta.

ভিক্ষুদের মধ্যে চাপা আলাপের অস্ফুট আভাষ, তাহার কাণের পর্দ্দা ছুইতেই, সে ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। প্রফুল্ল কমলের ন্যায় দুই চক্ষু মেলিয়া তিনি শিষ্যদের দিকে চাহিলেন। তখন সেই প্রধান নিবেদন করিল—"প্রভো, আমরা কিছুই বুঝিলাম না, এ নারী তাহার প্রিয়ের সহিত মিলিত হইল কি করিয়া, আমরা ত দেখিতেছি সে তাহার প্রিয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল!

তখন বুদ্ধদেব কহিলেন,—'তোমরা তাহাকে মৃত্যুসীমানার বাহিরে দেখিতে পাও কি? তোমরা তাহাকে অনুসরণ করিতে পার, যতক্ষণ সে জীবিতলোকে চলাফিরা করিতেছে, কিন্তু যাই সে জীবিতলোকের সীমা ছাড়িয়া মৃত্যুলোকে পদার্পণ করিয়াছে অমনি তোমাদের চক্ষু রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তোমারে দৃষ্টি যেখান হইতে ফিরিয়া আসিতেছে, আমার দৃষ্টি তাহার উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে বহুদূরে চলিয়া যাইতেছে। আমি তাহাকে কোথায় দেখিতে পাইতেছি জানো? তোমরা যেমন এখানে প্রিয়া-র্থিনীকে দেখিতে পাইতে, আমি তাহাকে তেমনি দেখিতে পাইতেছি, তবে আরও অধিকতর লাবণ্যখচিত তনুতে, কেন না সে মর্ত্ত্যকামিনী নহে সে হইল স্বর্গরমণী।"

শিষ্যদের মুখে বিস্ময়ের আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে, নয়ন স্পন্দন হারাইয়াছে, আকাশে তারাও সারি দিয়া যেন সে অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী শুনিতেছে। বুদ্ধদেব কহিতে লাগিলেন—'প্রিয়ার্থিনীকে তোমরা চিন নাই, সে এক স্বর্গনিবাসী দেবতার প্রিয়া। তাহার ন্যায় শত শত কান্তাকে লইয়া সে কুসুমামোদী দেবতা ফুলবনে বিহার করিতে গিয়াছে। দেবতা কল্পতরুর উপরে ফুলদোলে বসিয়া আছে, আর গন্ধর্ব্ব কামিনীরা তাহাকে মনের সাধে মালা গাঁথিয়া, গলার পরাইতেছে। এক এক জন করিয়া আসিতেছে, ফুলহার গলায় পরাইতেছে, আর প্রণাম করিয়া আবার মালার ফুল গাঁথিতে কোণে সরিয়া যাইতেছে। ফুলবিলাসীর আর মালা পরার সাধ মিটে না, তাহার ফুলের ন্যায় বিকচ কমনীয়া কান্তারা ফুলসাজে সাজিয়া যেন তাহার চক্ষুর তৃষা মিটাইতে পারিতেছে না। গন্ধর্ব্বকামিনীরা ফুলবনের ফুলতরুতে আরোহন করিয়া আচল ভরিয়া ফুল আহরণ করিতেছে, ঐ দূরের ডালে কি সুন্দর ফুলটি, কান্তের কুসুমকেতন মানাইবে ভাল, মনে করিয়া যাই এক গন্ধর্ব্ব কামিনী ফুল তুলিতে ডাল ধরিতে গেল, অমনি ঝাকি লাগিয়া সে নীচুতে পড়িয়া গেল এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারাইল।'

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বুদ্ধদেব থামিলেন শিষ্যরা যেন এখন কিছুটা ধরিতে পারিয়াছেন বোধ হইল, তাহাদের মুখে উৎসাহের আভা জাগিল।

'তারপর তোমরা সব জান, এইটুকু কেবল জান না, যে তোমরা তাহাকে প্রিয়ার্থিনী নামের ব্যাখ্যা ভুল করিয়া দিয়াছ। সে মর্ত্ত্যালয়ে জন্মাইল সত্য, কিন্তু তাহার পূর্ব্বস্মৃতি

বিস্মরণ হইল না। সে যে দেবকন্যা এবং দেবকান্তা এ কথাটা আশৈশব জানিয়া আসিয়াছে, তাই সর্ব্বদা সে প্রার্থনা করিত যেন পুনরায় দেব-প্রিয়া হইতে পারে, তাই সে করুণ মিনতি জানাইত—'পতি সনে মিলাও প্রভো!'

ভিক্ষুদের মধ্যে আনন্দের কম্পন জাগিল, এতদিনে প্রিয়ার্থিনীর পূর্ণরূপ যেন তাহারা দেখিতে পাইল। তাহার নিত্যকার সত্যশুভ্র অনুষ্ঠানে যে অমরার বারতা ছিল এতদিনে সে পাঠোদ্ধার হইল।

[২]

বুদ্ধদেব ক্ষণিক ধ্যান স্তিমিত নয়নে রহিলেন, তারপর কমল নয়ন উন্মীলন করিয়া শিষ্যদের মুখে তৃপ্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন তোমরা কি কাহিনীর শেষ শুনিয়াছ মনে কর? না না তোমরা প্রিয়ার্থিণীর জীবনের দু'দিক দেখিতে পাইলে না, যাহা দেখিলে সে শুধু একদিক। সেই না দেখা দিকটি এবার বলিব, শুন!

প্রিয়ার্থিণী সহসা দেখিতে পাইল সেই ফুল তরুর নীচে, যেখানে তাহার প্রাণহীন তনু পড়িয়াছিল, সেখানে সে যেন জাগিয়া উঠিয়াছে, চাহিয়া দেখিল, ঐ দূরের তরুতে ফুল দোলে দেবতা দুলিতেছেন, গন্ধর্ব্বকন্যারা মালা পরাইতেছে। সে দেখিল, তাহার আচলের ফুল ঘাসের উপর গড়াইতেছে, ফুলগুলি সে কুড়াইয়া লইল, মালা গাঁথিতে লাগিল। যখন গাঁথা শেষ হইয়া গেল তখন দেবতাকে মালা পরাইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিল। মালা লইয়া দেবতার কপোল ছুইবামাত্র, দেবতার চক্ষু প্রিয়ার্থিণীর উপরে পড়িল। কেমন একটু আশ্চর্য্য বোধ করিয়া সোৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাল, তোমাকে এই যেন কিছুকাল দেখি নাই, এই মালটি গাঁথিতে কি এতটা সময় লাগিয়া গেল? প্রিয়ার্থিনী উত্তর করিল—'প্রভো, সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার, ফুল তুলিতে যাইয়া পড়িয়া গেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ হারাইলাম।'

'বটে?—তার পর?' দেবতা অবাক হইয়া গেলেন।

তখন প্রিয়ার্থিনী কহিতে লাগিল—'তার পর মর্ত্ত্যলোকে মায়ের পেটে জন্ম নিলাম, বাল্যকাল কাটিয়া যাইতে যাইতে ষোলবৎসর বয়সে বিবাহ হইল। স্বামীর ঘর করিতে গেলাম। সেখানে চারি পুত্রের মাতা হইলাম, ক্রমে প্রৌঢ়া হইয়া গেলাম। জন্মকাল হইতে সর্ব্বদা জানিতাম, আমি দেবকন্যা, দেবতা আমার স্বামী, তাই সদা এই প্রার্থনা করিতাম যেন স্বামীর সহিত মিলিত হইতে পারি। একদিন অসুখ করিল। কিছু দুঃখ ভোগ করিয়া মরিয়া গেলাম, তখন শরীর ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম। তার পর কি হইল জানিনা, সহসা জাগিয়া দেখিলাম, যে উপবন তরু হইতে পড়িয়া গিয়া-

ছিলাম, তাহার নীচে পড়িয়া আছি। আচলের ফুল ঘাসের উপর গড়াইতেছে। সে গুলি কুড়াইয়া লইয়া মালা গাঁথিয়া প্রভুকে পরাইতে আসিয়াছি, কতখানি সময় ইহার মধ্যে কাটিয়া গেল ইহা আমি বলিতে পারি না সত্য, কিন্তু খুব বেশী সময় যে লাগে নাই—ইহা আকার প্রকার দেখিয়া বুঝিতেছি।

দেবতা এই অভিনব কাহিনী শুনিয়া বড়ই আমোদ অনুভব করিলেন, 'বটে? এই খানিক সময়ের মধ্যেই মর্ত্তালোকে তোমার যৌবন কাটিয়া গেল? বেশ মজা ত! মানুষের জীবন এত ক্ষণিক। আচ্ছা যদি এমনি হইয়া থাকে, তবে মানুষ এই তিলমাত্র জীবন কাটায় কি করিয়া? তাহারা কি এক ঘুমেই জীবন ফুরিয়ে দেয়? অথবা পুণ্য অনুষ্ঠানে ক্ষণিক জীবনকে ভরিয়া তোলে?

প্রিয়ার্থিনী কহিল—'প্রভো, মানুষ জীবনকে ক্ষণিক মনেই করে না, তাহারা মনে করে। জীবন তাহাদের অফুরন্ত; তাই ভোগসুখে যথেচ্ছামোদে জীবনকে ফাঁকা করিয়া তোলে।'

মাল্যবিলাসী দেবতা বড়ই আশ্চর্য্য বোধ করিলেন, মানুষ এতখানি দুর্ব্বোধ? এত অল্প আয়ুকে চিরায়ু ভাবিয়া লয় এবং জন্ম মরণ নিশ্চয় জানিয়া কোন্ ভরসায় জীবনকে নিরর্থক করিয়া ফেলে! ইহাদের মুক্তির পথ তবে ত আর মিলিবার নয় দেখিতেছি!

প্রিয়ার্থিনীর স্বামী সম্মিলন কথা সমাধা করিয়া বুদ্ধদেব আবার নীরব হইলেন। শিষ্যবৃন্দ সে বচন-মধু পান করিতে করিতে বিস্ময়ে পুলকে শিহরিয়া উঠিতেছিল, আকাশের তারা ঘুমহারা শ্রোতার ন্যায় যেন নয়নের স্পন্দন হারাইয়াছিল। এই নীরবতার মধ্যে বুদ্ধদেব পুনরায় ধ্যান সমাহিত হইলেন।

আবার চক্ষু মেলিলেন। ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'আমাদের মর্ত্তালোকের একশত বৎসরে মাল্যবিলাসী দেবতার একদিন একরাত্রি হয়, এমনি হিসাবে তাহাদের মাস ও বৎসর হয়। সুতরাং বুঝিতেছ– আমাদের আয়ু কতটুকু! মানুষ জীবনে ভোগের উৎসে ডুবিয়া থাকিতে থাকিতে মৃত্যু আসিয়া ভোগের হাট ভাঙ্গিয়া দেয়, চলিয়া যাইতে হয়, আবার আসিতে হয় ভোগ ত নিভিবার নয়! তপস্যায় ইহার নির্ব্বাণ!

মাটির ঢেলা

শ্রীহেমলতা দেবী

পাড়া জুড়ে শাঁখের আওয়াজ
ঘন ঘন হাঁক্
দুয়ার জুড়ে দাঁড়িয়ে হোথা
নূতন খোকার বাপ্,
বাড়ী জুড়ে দাপাদাপি
করে ছেলের দল
নূতন খোকা—নূতন খোকা
দেখ্‌তে যাবি চল্
আজকে ভোরে এল ঘরে
ঐ যে নূতন খোকা,
এক্‌কালে সে মানুষ হবে,
নাইক লেখা জোকা
আন্‌বে কত টাকা কড়ি,
করবে কতই দান্
হাজার গুণে বাড়িয়ে দেবে
পরিবারের মান্।
ঠাকুর মা তার বেড়িয়ে এল
হাতে নামের ঝুলি
উঁকি মারে, "ভাগ্যে মেয়ে
হয়নি" মুখে বুলি।

"কোন্ দেবতার আশীস্ রে তুই
　　কোন্ দেবতার বর
আমার ঘরে ঝাঁপিয়ে এলি
　　নূতন বংশধর।"
হায় অদৃষ্ট, হায় মেয়ে তোর
　　এতই অবহেলা
মানুষ হওয়ার নাই কি শক্তি,
　　শুধুই মাটির ঢেলা।
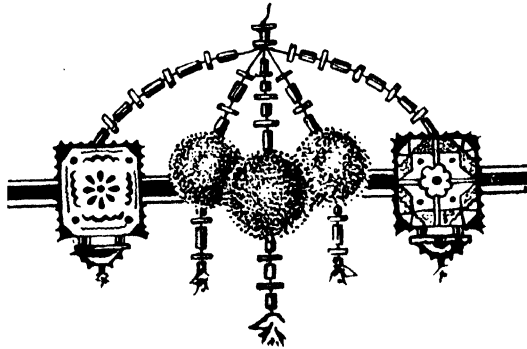
আহেরিয়া

শ্রী...........

চিতোরে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

আজ আহেরিয়া—

চিতোরের গৃহে গৃহে আজ উৎসব। চারিদিক ছেলেবুড়ার কলরবে মুখরিত। প্রত্যেক বাড়ীর সম্মুখে মঙ্গল ঘট স্থাপন করা হইয়াছে।

নাগরিকেরা আমোদ প্রমোদে মত্ত।

ক্রমে দিবা দ্বিপ্রহর আগত প্রায়। সহসা রাজতোড়নে দামামা ধ্বনিত হইল। সে শব্দ শ্রবণমাত্র প্রতি গৃহ হইতে যুবকেরা অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া রাজপ্রাসাদের সম্মুখে সমবেত হইল। তাহাদের বাম হস্তে ঢাল, দক্ষিণ হস্তে বর্শা, কটিদেশে তরবারী।

মহারাণাও যথাসময়ে অস্ত্রভূষণে সজ্জিত হইয়া প্রাসাদ হইতে বাহিরে আসিলেন। মহারাণাকে দেখিবামাত্র সকলে বলিয়া উঠিলেন—"জয় চিতোরেশ্বরের জয়,—জয় মহারাণার জয়"

তার পর সকলে মহারাণাকে অগ্রে স্থাপন করিয়া বনের দিকে চলিলেন।

সকলেরই হৃদয় আজ শঙ্কাকুল। আজিকার মৃগয়ার উপর বৎসরের ফলাফল নির্ভর করিবে। আজ যদি তাহারা বিফলকাম হয় তবে চিতোরের রাজলক্ষ্মী বিমুখ হইবে। দেশবাসীর দুর্দ্দশার অন্তঃ থাকিবে না। তাহাদের মনে পড়িল—আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণ ও পদ্মিণীর জহর ব্রতের কথা! সে বৎসর আহেরিয়ার দিন বিফল হইয়াছিল।

ক্রমে তাহারা গভীর বনে প্রবেশ করিল। কিন্তু কোথাও একটি শীকারও মিলিল না। মহারাণা অনিশ্চিত বিপদাশঙ্কায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি শীকারীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে চিতোরের বীর প্রজাগণ, আজ আমাদের বড়ই দুর্দ্দিন উপস্থিত। যে বনে প্রবেশ করিলে শত শত মৃগ পাওয়া যায়, আজ সেখানে একটা শশকও দেখা যাইতেছে না। তোমরা সবে এক কাজ কর। নানা দলে বিভক্ত হইয়া চারিদিকে শীকারের অনুসন্ধান কর। আজ যেন কিছুতেই আমরা বিফমকাম না হই।"

মহারাণার কথা শুনিয়া তাহাদের মনে নববলের সঞ্চার হইল। তাহারা দলে দলে এক এক দিকে চলিলেন। মহারাণার সঙ্গে চলিলেন যুবরাজ ও তাঁহার অনুচরগণ।

কিন্তু তথাপি তাঁহারা শীকার পাইলেন না। ক্রমে দিবা অবসান হইল। সন্ধ্যাদেবী আসিয়া আকাশে তার তাঁরা আঁকা আঁচলখানা বিছাইয়া দিলেন।

শীকারীগণ পরিশ্রান্ত। মহারাণা পাগল প্রায়। সহসা যুবরাজের কাছ দিয়া একটা বন্য বরাহ তীরবেগে অতিক্রম করিয়া গেল। যুবরাজ ক্ষিপ্রহস্তে বর্শা নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল। শীকারীরা "হায় হায়" করিয়া উঠিল।

মহারাণা ক্রোধে ক্ষিপ্ত প্রায় হইলেন। তিনি তরবারী উদ্যত করিয়া বলিলেন—"অকর্ম্মন্য, অপদার্থ, শিশোদীয়া কুল কলঙ্ক তুই। আজ তোর অকর্ম্মন্যতায় চিতোরের ভাগ্যলক্ষী শিশোদীয়া কুলকে পরিত্যাগ করিবে। তোর মত অপদার্থ পৃথিবীর ভার মাত্র। তোর শেষ মুহূর্ত্ত আগত প্রায়। তুই ঈশ্বরকে স্মরণ কর।"

এই বলিয়া মহারাণা যুবরাজকে হত্যা করিবেন—এমন সময় পশ্চাৎ হইতে উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারিত হইল—মহারাণা স্বহস্তে পুত্র হত্যা করিয়া ঘাতকাধম হইবেন না। এই নিন যুবরাজের লক্ষ্যভ্রষ্ট বরাহ। ইহা আমি মহারাণাকে উপহার দিলাম"

মহারাণা পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন সত্যই এক সুদর্শন যুবক বরাহ স্কন্ধে এদিকে আসিতেছে।

যুবক ক্রমে মহারাণার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন—এখন নিশ্চয়ই চিতোরের রাজলক্ষী সুপ্রসন্ন হইবেন। এই বরাহের পরিবর্ত্তে আমাকে যুবরাজের প্রাণ ভিক্ষা দিন ইহাই আমার প্রার্থনা।

মহারাণা উল্লাসিত হইয়া বলিলেন—যুবক তুমি আজ রাজপুত কুলের মান রক্ষা করিলে। আজ তোমা হইতে রাজবংশ চিতোরেশ্বরীর কোপ হইতে রক্ষা পাইল। আমি তোমাকে কি দিয়া পুরস্কৃত করিব স্থির করিতে পারিতেছি না। বল কি তোমার যোগ্য পুরস্কার?"

"আমাকে যুবরাজের প্রাণ ভিক্ষা দিন—ইহাই আমার যোগ্য পুরস্কার। আমি অন্য কিছুই চাই না।

মহারাণা যুবরাজের দিকে রোষকষায়িত লোচনে চাহিয়া বলিলেন—"যা অপদার্থ তুই দূর হ'। আজ হইতে তুই আমাপক্ষে মৃত—চিতোরে তোর আর স্থান নাই। আমি তোকে নির্ব্বাসন দিলাম"

যুবক বলিলেন—"মহারাণা আমার একটি আবেদন আছে। আদেশ পাইলে নিবেদন করিতে পারি। আমার পুরস্কার পাইলাম। আমার আরও কিছু প্রাপ্য আছে। আমি ঘোর অপরাধে অপরাধী।" মহারাণা বিস্মিতের মত যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

যুবক বলিতে লাগিলেন—আমি ঘোরতর অপরাধ করিয়াছি। আপনি বোধ হয় লক্ষ্য করেন নাই। আমি ভীল, আজ ভীলদের শীকারের জন্য নির্দ্দিষ্ট সীমায় প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমা হইতে আইন অমান্য হইয়াছে। আমিই যুবরাজের সেই হতভাগ্য বন্ধু, যাহার জন্য মহারাণা তাঁহাকে কতই না তিরস্কার করিয়াছেন। তিনি তিরস্কারকে ভয় না করিয়া আমার সহিত মিশিতেন, আমিও সেইরূপ প্রাণের ভয় না করিয়া, বনভূমিতে তাঁহাকে গোপনে অনুসরণ করিয়াছি। যদিও জানিতাম যে বনরক্ষীগণের হাতে পড়িলে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য ; তথাপি তাঁহাকে অসহায় ভাবে পাঠাইতে সাহস করি নাই। আমার অপরাধ ভয়ানক। আমার এই অপরাধের যোগ্য শাস্তি দিন"

"হাঁ যুবক, তোমাকে যোগ্য শাস্তিই দিব। এমন আদর্শ শাস্তি দিব যাহা তোমাকে চিরদিন বহন করিতে হইবে। আজ হতে তুমি চিতোরের যুবরাজ। তুমি আজ চিতোরের রাজলক্ষ্মী রক্ষা করিয়াছ। এ রাজ্য তোমারই প্রাপ্য।"

"মহারাণা আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। যদি এ রাজ্য আমার প্রাপ্য হয় তবে যৌবরাজ্য চাহি না। অতি লোভী আমি—আজই মহারাণা হতে চাই।

সকলে "হায় হায়" করিয়া উঠিল। এ উদ্ধত যুবক বলে কি ? মরণ শিয়রে না আসিলে কি যুবক মহারাণার মুখের উপর একথা বলিতে সাহস পায় ? এখনি হয়ত তাহার ছিন্নমুণ্ড ভূমি স্পর্শ করিবে। তাহারা রুদ্ধশ্বাসে ফলাফলের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মহারাণা বহুক্ষণ নতমস্তকে চিন্তা করিয়া বলিলেন, "উত্তম যুবক ! আমি ভাবিয়া দেখিলাম, তোমার কথাই ঠিক। মা চিতোরেশ্বরীর আর ইচ্ছা নয় যে শিশোদীয়বংশ চিতোরে রাজত্ব করে। আমি রাজ্যের লোভ ত্যাগ করিতে না পারিয়া, তোমাকে মহারাণার পদ না দিয়া ভুল করিয়াছিলাম। এই নাও রাজকীয় উষ্ণীষ আর তরবারী। আজ হ'তে তুমি চিতোরের মহারাণা। সকলে উচ্চৈঃস্বরে বল—জয় চিতোরেশ্বররীর জয় ! জয় চিতোরের নব মহারাণার জয় !!"

সকলে যন্ত্রচালিতের মত মহারাণার বাক্য প্রতিধ্বনিত করিল।

যুবক নতমস্তকে উষ্ণীষ এবং তরবারী গ্রহণ করিয়া বলিল—আজ হতে আমি চিতোরের মহারাণা। যুবরাজের নির্ব্বাসন দণ্ড প্রত্যাহার করিয়া তাঁহাকে পুনঃ স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিলাম। আর ভূতপূর্ব্ব মহারাণা, আজ হতে আপনি আমার প্রজামাত্র। আপনি নিশ্চয়ই আমার আদেশ পালন করিতে বাধ্য ?"

মহারাণা করযোড়ে বলিলেন—"হাঁ, মহারাণা, আমি আজ হইতে আপনার প্রজা মাত্র ; আর আপনার আদেশ পালন করিতে বাধ্য।"

"তবে শুনুন মহারাণা, আমি আপনাকে আদেশ করিতেছি, আপনি রাজকীয় তরবারী ও উষ্ণীষ গ্রহণ করুন"

সকলে বিস্ময়ে অবাক হইল। এ যুবক পাগল নাকি? এ বলে কি? চিতোরের মত একটা রাজ্য হাতে পাইয়া পায়ে ঠেলিল। এ নিশ্চয়ই বদ্ধ উন্মাদ।

মহারাণা উষ্ণীষ ও তরবারী গ্রহণ করিলেন।

যুবক তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া বলিল—মহারাণা, আপনার চরণে অনেক অপরাধ করিয়াছি। আমায় শাস্তি দিন। আমি জানিতাম, আপনার আদেশ পর্ব্বতের মত অটল। যুবরাজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আপনার সহিত এরূপ ব্যবহার করিয়াছি। শীঘ্র আমার মুণ্ডপাত করিয়া এ ঔদ্ধত্যের শাস্তি দিন।"

"তোমায় শাস্তি দিব? আমায় মাপ কর যুবক। আমি জানিতাম না তুমি এত মহৎ, তোমার বন্ধুত্ব এত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত যে, তুমি বন্ধুর জন্য হেলায় রাজ্য পর্য্যন্ত ধূলি মুষ্টির মত পরিত্যাগ করিতে পার—তাই যুবরাজকে তোমার সহিত মিশিতে বারণ করিতাম। বৎস তোমায় কি পুরস্কার দিব? আমার রাজভাণ্ডারে এমন রত্ন নাই যাহা দিয়া তোমাকে পুরস্কার দিতে পারি। হ্যাঁ, তবে এক ধন আছে; জানি না তুমি তাহা গ্রহণ করিবে কি না? আজ হতে আমার নয়ন পুত্তলী, রাজস্থানের কুসুম—কুসুমকুমারী তোমার। আমার এ দান নিয়ে আমায় ঋণমুক্ত কর বৎস—এই বলিয়া মহারাণা যুবকের হস্ত চাপিয়া ধরিলেন।

"মহারাণা আজ অপাত্রে রাজকুমারীকে ন্যস্ত করিতেছেন। জানি ইহা বানরের গলায় মুকুতার মালার মত, অশোভন হইবে। তথাপি তাহাকে আমি গ্রহণ করিলাম, কারণ ইহা আপনার স্বেচ্ছাকৃত দান।"—এই বলিয়া যুবক মহারাণার পদতলে প্রণত হইল।

অমনি চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করিয়া ধ্বনিত হইল "জয় চিতোরেশ্বরীর জয়! জয় মহারাণার জয়!"
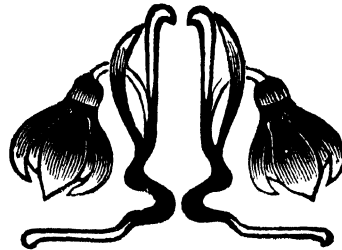
রাজা রামমোহন রায়

শ্রীকুমুদিনী বসু।

রাজা রামমোহন রায় ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে এই দুর্ভাগা ভারতের অন্তর্গত বাংলা দেশের অন্তঃপাতী রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার জন্মের ১৭ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে, পলাসীর যুদ্ধে ইংরাজ জাতি, লর্ড ক্লাইভের নেতৃত্বে, এই বাংলা দেশ অধিকার করেন। সুতরাং দেশের চারিদিকে তখন গোলমাল ও অরাজকতা। তখন মোগল রাজত্বের অবসান হইয়াছে এবং ইংরাজ রাজত্ব সবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় ৬ শত বৎসরের পরাধীনতার ফলে এ দেশবাসীর ধর্ম্ম, শিক্ষা, ও রাষ্ট্রের ঘোরতর অধঃপতন হইয়াছিল।

কুসংস্কার, অজ্ঞানতা ও অধর্ম্মের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া, ভারতবর্ষ যখন মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, উপনিষদকার ঋষিদের তপস্যালব্ধ ব্রহ্মজ্ঞান যখন কেবল বাহ্যিক আচার বিচারের মধ্যে ডুবিয়া লুক্কায়িত হইয়া গিয়াছিল, তখন ভারতের শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া এই অলৌকিক প্রতিভাশালী মহাপুরুষ আবার এই ভারতে ব্রহ্মজ্ঞানের মহাবার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন, আবার এই ভারতের নরনারীর সর্ব্বপ্রকার শৃঙ্খল মোচনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ভারতের সেই শ্মশানবক্ষে সেই মহাপুরুষ একাকী ব্রহ্মজ্ঞানের বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া ভারতের সর্ব্বপ্রকার মুক্তির সুসমাচার প্রচার করিয়াছিলেন।

তাঁহার সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত একশত বৎসরের অধিক অতিবাহিত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে আমাদের দেশের ধর্ম্ম, শিক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্রের যে উন্নতি হইয়াছে তাহার মূলে রাজা রামমোহন রায়ের আত্মোৎসর্গ। সেই জন্য এই যুগ "রামমোহনের যুগ" নামে অভিহিত। এই এক শতাব্দীর মধ্যে এ দেশের সমুদয় বিভাগে যে উন্নতি দেখা যাইতেছে, তাহার সূত্রপাত তিনিই করিয়া গিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সব উন্নতির কথা বিস্তৃত ভাবে বলা সম্ভবপর নহে। সে সব কথা জানিতে হইলে প্রত্যেকেরই তাঁহার জীবন-চরিত পাঠ করা উচিত। বস্তুতঃ, তাঁহার জীবন-চরিত পাঠ না করিলে এই বাংলা দেশের উন্নতির ইতিহাস অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে।

ভারতের সেই অন্ধকারময় যুগে, রাজা রামমোহনের জন্ম বিধাতার এক অদ্ভুত লীলা। বিধাতা ভারতবর্ষকে ধ্বংস করিবেন না, তাই তাহার ঘোর দুর্দ্দশার সময়ে রামমোহনের ন্যায় মহামানবকে এ দেশে পাঠাইয়া, তাহার রক্ষার উপায় করিয়াছেন।

সেই তমসাচ্ছন্ন যুগে নারী সমাজের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় ছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সেই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে নারীদের দলিয়া পিষিয়া রাখাই তখনকার সমাজের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ভাবিলে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাই, যখন দেখি যে সেই ঘোর দুর্দ্দশাগ্রস্ত সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং বর্দ্ধিত হইয়াও, একমাত্র তাঁহারি মহাপ্রাণ এই দলিতা লাঞ্ছিতা নারী জাতির উদ্ধারের জন্য আকুল হইয়াছিল। সমগ্র দেশ যখন নারীকে নির্য্যাতন করিয়া জীবন্ত দগ্ধ করিতে উৎফুল্ল, তখন একমাত্র এই মহামানবের বিশাল অন্তরই তাহাদের মুক্তির জন্য কাঁদিয়াছিল।

সেই দুর্দ্দিনে, যখন দেশের লোকের নিকট নারীগণ অবজ্ঞার পাত্রী ছিলেন, তখন এই লাঞ্ছিতা নারীদের সম্বন্ধে রাজা তাহার সতীদাহ নিবারক পুস্তকে বলিতেছেন—"প্রথমতঃ স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন যে, অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে, পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়। আপনারা বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয়, ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রের পারগরূপে বিখ্যাত আছেন। বিশেষতঃ, বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে যে, অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন।"

"দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদিগকে অস্থিরান্তঃকরণ কহিয়া থাকেন। ইহাতে আশ্চর্য্যজ্ঞান করি; কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য দ্বারা স্বামীর উদ্দেশে অগ্নিপ্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন যে তাহাদের অন্তঃকরণে স্থৈর্য্য নাই।"

এই ভারতের দুঃখিনী, পদদলিতা, পরমুখাপেক্ষিনী নারী সমাজের প্রতি এত করুণা, এত প্রেম ঐ মহামানব রামমোহনেরই বিশাল অন্তর ধরিতে পারিত, আর কাহারো পক্ষে তাহা সম্ভব ছিল না।

আজ তাঁহার সময়ের নারীদের অবস্থার সহিত এখনকার নারী সমাজের উন্নত অবস্থার কথা ভাবিয়া প্রাণ কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠে।

ভারতের ভাগ্য বিধাতা অশেষ কৃপা করিয়া এ দেশের উদ্ধারের জন্য তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। আজ তাঁহার কৃপার জয়গান করিয়া বলি, "ধন্য! তোমার দয়া! ধন্য তোমার পুত্র রামমোহন।"

দেহের সৌন্দর্য্যে ব্যায়াম

শ্রীরাম কিঙ্কর সাহা বি, এ

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধটা বড়ই কাছাকাছি। একটাকে বাদ দিলে অপরটার খোঁজ পাওয়া বড়ই কঠিন। তা'রা যেন পরস্পর জমজ ভাইবোনের মত এই পৃথিবার বুকে নেমে এসেছে। সংসারে নারী মাত্রেরই সাধ সে সুন্দরী ব'লে সববাইর কাছে আদর পায়। কিন্তু সবার পক্ষে তা' হ'য়ে উঠে না; অনেকে ক্রীম্, পাউডার প্রভৃতি মে'খে, নিজেকে সুন্দরী ব'লে জাহির কর্ত্তে চান্। আসলে, আসল সৌন্দর্য্য যেটা, তা' শরীরের বর্ণের উপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা নির্ভর করে তার স্বাস্থ্যের উপর। একথা সত্য না হ'লে সাঁওতালী মেয়েরা বর্ণ কালো বলে সুন্দরীদের সমাজ থেকে চিরদিনের মত নির্ব্বাসিত হতো।

আজকালকার দিনে দেশের যা, অবস্থা পড়েছে, তা'তে ক'রে মনে হয়, প্রত্যেক মেয়েরই শরীর চর্চ্চায় মন দেওয়া দরকার। শরীর চর্চ্চা কেবল দেহের বলই বৃদ্ধি করে না। তা'তে মানসিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে দেহের সৌন্দর্য্যও বাড়িয়ে তুলে, যে সব মেয়েরা পাড়াগাঁয়ে থাকে, তাদের জলতোলা, বাট্না বাটা, রান্না করা প্রভৃতি কাজে যথেষ্ট শারীরিক পরিশ্রম হয়। কাজেই তাদের ব্যায়াম করা ততটা দরকার নয়, যতটা দরকার সহুরে মেয়েদের। শরীর-চর্চ্চার অভাবে সহরের মেয়েরা দিনদিন স্বাস্থ্যহীন হ'য়ে পড়্ছে। স্বাস্থ্য ভাল না থাক্লে, মনও ভালো থাকে না। কোন কাজে উৎসাহ যায় না। বর্ত্তমান নারী, প্রগতির যুগে প্রত্যেক মেয়েরই মনে রাখা উচিত, যে সমাজ বিদ্যা ও বুদ্ধিতে, বলে ও স্বাস্থ্যে, অন্য সমাজের সমান না হ'তে পারে, সে সমাজ পড়ে
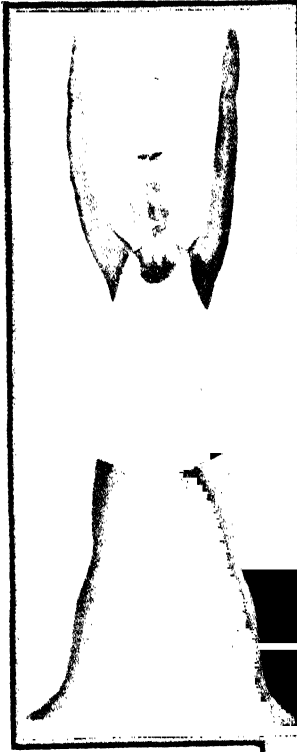
১ম চিত্র।

প্রথমে 'সোজা' হইয়া দাঁড়াও (ইংরাজীতে যাকে attention 'এটেনসন্' বলে) তারপর হাত দুটি পাশ দিয়া মাথার উপরে তোল, সঙ্গে সঙ্গে ছবির মতো পা দুটোকে যতদূর পার ফাঁক কর, তারপর আবার পূর্ব্বের মতো 'সোজা' হইয়া দাঁড়াও—হাত দুটো নীচে নামাও। এইরূপে দৈনিক দশ হইতে পনের বার কর।

২য় চিত্র।

পূর্ব্বের মতো "সোজা" হইয়া দাঁড়াও। হাত দুটো মাথার উপরে তোল; এবং সঙ্গে সঙ্গে গোড়ালি তুলিয়া পাতার উপর ভর দিয়া হাটু গাড়িয়া বসিতে চেষ্টা কর। এইরূপে ৫ হইতে ৮ বারকর।

তৃতীয় চিত্র।

পা দুটো ফাঁক করিয়া দাঁড়াও। হাত দুটো কাঁধের সমান উচু করিয়া দুইদিকে ছড়াইয়া দাও। তারপর শরীর ডানদিকে ঘুরাও এবং ডান পায়ের কাছের মাটি বাম হাত দিয়া স্পর্শ করিতে চেষ্টা কর। তারপর আবার পূর্ব্বের মত দাঁড়াইয়া শরীর বামদিকে ঘুরাইয়া ডানহাতের আঙ্গুলের ডগা দিয়া বাম পায়ের দিকের মাটি স্পর্শ করিতে চেষ্টা কর। এইরূপ অন্ততঃ ৩ হইতে ৫ বার চেষ্টা করা।
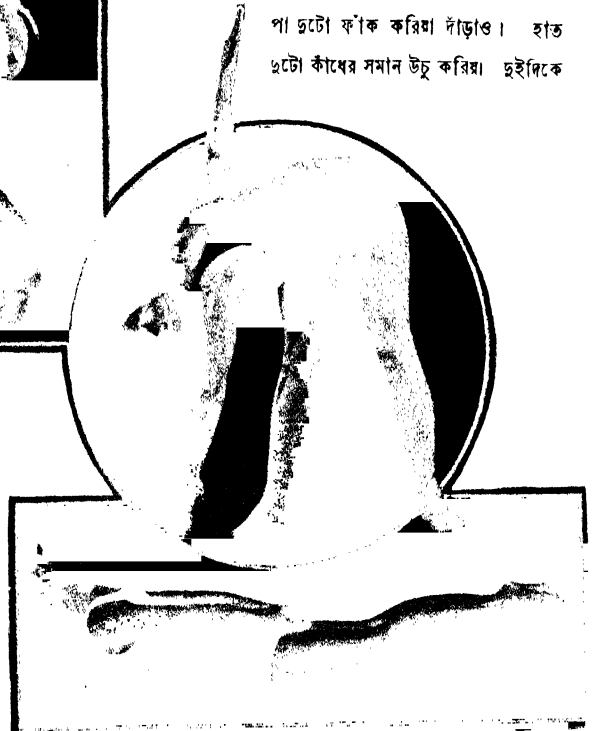
৪র্থ চিত্র।

মাটিতে উপুড় হইয়া শয়ন কর। পিঠের উপর ডান হাত দিয়া বাম হাত চাপিয়া ধর, পা দুটো একত্র করিয়া রাখ। পায়ের পাতা যতটুকু পার পায়ের সহিত সমান সোজা করিতে চেষ্টা কর। তারপর যতদূর পার মাথা ও পাগুলি এক সঙ্গে উপরের দিকে তুলিয়া ধনুকের মত হইতে চেষ্টা কর। আবার পূর্ব্বের মত শয়ন কর। আবার চেষ্টা কর। এইরূপে ৩।৪ বার কর।

পঞ্চম চিত্র।

পা, দুটো একত্র করিয়া সোজাভাবে দাঁড়াও। হাত দুটো পিছনে নিয়া বাম হাত দিয়া ডান হাত চাপিয়া ধর। তারপর শরীর একবার ডান দিকে একবার বাম দিকে ঘুরাও। এইরূপ অন্ততঃ ১০ হইতে ১৫ বার কর।

ষষ্ঠম চিত্র।

পূর্ব্বের মতো পেছনে হাত নিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও। তারপর শরীর সম্মুখের দিকে নত কর। মাথা যেন শরীরের সঙ্গে সঙ্গে নত হয়। এইরূপে ৮ হওতে ১০ বার কর।

৭ম চিত্র।

মেঝেতে চিৎ হইয়া শয়ন কর। তারপর সাইকেল চালাইতে যেরূপ পা ঘোরায় সেইরূপ ভাবে পা' ঘোরাও (ইহা তলপেটের ভাল ব্যায়াম) এই প্রণালী ১৫ হইতে ২০ বার অন্ততঃ কর।

৮ম চিত্র।

মাটিতে ছবির দুই মত হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলির উপর ভর করিয়া থাক। তারপর কনুই বাঁকা ও সঙ্গে সঙ্গে শরীর নত করিয়া বুক দিয়া ভূমি স্পর্শ কর। আবার পূর্ব্বের মত হও। এইরূপ ৫ হইতে ১০ বার কর।
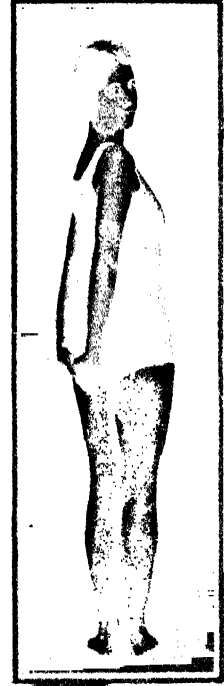
আমাদের দেশে ইহাকে বুক ডন বলে

পিছিয়ে। কিছুদিন আগে আমাদের দেশেরও ছিল সে অবস্থা। পুরুষকে সব বিষয়ে মেয়েদের বাদ দিয়ে চল্‌তে হোত। ফলে এই দাঁড়িয়েছিলো যে, আমাদের দেশটা পড়ে ছিলো অন্যদেশের চাইতে বহু পেছনে। এইতো সেদিন জাপান ছিলো একটা অর্দ্ধ-সভ্য দেশ; কিন্তু সেদেশের মেয়ে পুরুষে মিলে দেশটাকে আজ এমন্ ক'রে গড়ে তুলেছে যে আজ তারা সমস্ত সভ্যজাতির সমকক্ষ।

এখন আমাদের দেশেরও চোখ ফুটেছে। দেশ বেশ বুঝ্‌তে পেরেছে, যে নারীদের বাদ দিলে, কিছুতেই দেশের কল্যাণ নেই। তাই আজ আমরা দেখি যে মেয়েরাও কি রাজনীতি, কি সমাজ, কি দেশ সেবা—সব বিষয়েই পুরুষদের সহযোগিতা করচে। এইতো এবার অসহযোগ আন্দোলনের সময়, শত শত নারী, পুরুষদের সঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে, সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ সহ্য করেছে, এমন কি, জেলে পর্য্যন্ত গিয়েছে। মেয়েদের এই সহযোগিতায় দেশের বল শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এরূপ সহযোগিতা কর্ত্তে হলে মেয়ে পুরুষ সবাইকে উপযুক্ত হ'তে হবে, বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে—বলে ও স্বাস্থ্যে। বিদ্যা ও বুদ্ধিতে সমকক্ষ হলেও মেয়েরা একদিকে পড়ে আছে বড়ই পেছনে,—সে হলো স্বাস্থ্যের দিক। তারা শরীর চর্চ্চায় খুব মন দিচ্ছেনা; ভাবছে শরীর চর্চ্চাটা পুরুষদেরই একচেটে সম্পত্তি। কিন্তু তা' নয়। এবিষয়েও মেয়েদের সমান অধিকার। তাদের হতে হবে শারীরিক বলে দুর্জ্জয়, অসীম। হিন্দুশস্ত্র বলে, নারী শক্তির আধার—আধার যদি শক্তিশূন্য হয়, তবে শক্তি আস্‌বে কোথা হতে?

আজকাল বহু জায়গায় মেয়েরা লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, প্রভৃতি শিক্ষা কচ্ছে। সে সুলক্ষণ সন্দেহ নেই। কিন্তু দেশ-জোড়া সকল মেয়েদের তো লাঠি বা ছোরা খেলার যথেষ্ট সুবিধে নেই। তবে কি তারা চিরদিন দুর্ব্বলাই থাকবে? তা কখনো হ'তে পারেনা। পূর্ব্বেই বলেছি যারা জল তোলা, বাসন মাজা ইত্যাদি নানাপ্রকার ঘরকন্নার কাজ করে, তাদের ব্যায়াম করার খুব দরকার নেই। এ সব কাজ করা যাদের অভ্যেস বা সুবিধে নেই, তাদের উচিত কতকগুলি অতি সাধারণ ব্যায়াম করা। ব্যায়াম যে কেবল শক্তির আধার তা নয়, তাতে দৈহিক সৌন্দর্য্যও বৃদ্ধি করে, একথাও আগে বলেছি। আমাদের দেশের মেয়েরা স্বাস্থ্যচর্চ্চা করেনা বলেই অতি অল্প বয়সে তাদের সৌন্দর্য্য নষ্ট হ'য়ে যায়। অথচ অন্য দেশের মেয়েরা প্রায় চল্লিশ পয়তাল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত অটুট সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী থাকে। তা'রা বৃদ্ধ বয়সেও টেনিস-খেলা, গল্‌ফ-খেলা অশ্বারোহণ প্রভৃতি ক'রে থাকে। আজ কাল ইয়োরোপের মেয়েরা হকি, ক্রীকেট্ প্রভৃতি খেলাতেও যোগ দিচ্ছে। আমাদের দেশের মেয়েদের স্বাস্থ্য কবে সেরূপ হবে?

পাশে একটী ব্যায়াম কুশলা নারীর চিত্র দেওয়া হলো, তা' থেকে বেশ বুঝা যাবে যে ব্যায়াম কিরূপে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি বৃদ্ধি ক'রে শারীরিক সৌন্দর্য্যকে বাড়িয়ে তুলে, পুরুষ ও নারীদের ব্যায়াম প্রণালীর বিভিন্নতা আছে। পুরুষদের পক্ষে যেগুলো উপযুক্ত, মেয়েদের পক্ষে হয়তো সেগুলো অনিষ্টকর। প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্রসহ কতকগুলো মেয়েদের উপযোগী ব্যায়াম প্রণালী দেওয়া হলো। প্রত্যহ অন্ততঃ দশপনের মিনিট নিয়মানুযায়ী ব্যায়াম কর্লে' শারীরিক সৌন্দর্য্য ও শক্তি দুটোই বৃদ্ধি পাবে সন্দেহ নেই।

ঘাসফুল

শ্রীসুধীররঞ্জন রায়চৌধুরী

ছোট্ট ঘাস্‌ফুল্‌ সহসা ফুট্‌ল
পথটির কিনারে।
রাঙা রবি ধীরি ধীরি আকাশে উঠ্‌ল
বাজিয়ে বীণারে।
শুনে তাই তুল্‌ তুল্‌ লালে লাল্‌ ঘাসফুল্‌
তুল্‌ল মুখ্‌টি
কাননে গানে গানে দধিকূল্‌ বুল্‌বুল্‌
ভরল বুকটি
রাঙা রাঙা পাচ্‌টি পাপ্‌ড়ির্‌ চেলী তার্‌
রয়েছে পড়্‌নে।
শিশিরের ক্ষীর্‌জালি মালাটী মুক্তার্‌
অপরূপ্‌ গড়নে।
জুট্‌ল সখি তার্‌ নীলবাস্‌ মক্ষি
ঘিরে তায় ধর্‌ল।
মন্‌চোরা হাসিটীর্‌ শত শত সাক্ষী
বাসর ভর্‌ল।
ঘাস্‌ রচে চৌদোল্‌ কাঁপে তার্‌ শীষ্‌টী
গান্‌ গায় ভোম্‌রা।
চেয়ে দেখ ঘাস্‌ফুল্‌ করে শুভদৃষ্টি
আঁখি মেল তোম্‌রা

কন্যা

শ্রীসুরুচি দেবী

[১]

সমস্ত আকাশ ঘন মেঘে ছাইয়া গিয়াছে। ভাদ্রের ভরা বাদর। সন্ধ্যার পর কলিকাতায় শ্যামবাজার অঞ্চলের অপরিসর নোংরা সঁ্যাতস্যাতে গলিগুলি কেরোসিনের বাতির মৃদু আলোতে আরো কুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিক হইতে আবর্জ্জনার পচা দুর্গন্ধ বাহির হইতে ছিল। গলির একপাশে "ডাষ্টবিনের" সামনে কতগুলি কুকুর উচ্ছিষ্ট পাতা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে করিতে চীৎকার করিতেছে। একটী লোক—বলিষ্ঠ দেহ, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, রং ফরসা, চক্ষু দুটী উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ,—এদিক ওদিক চাহিয়া সন্তর্পনে বড় রাস্তা হইতে গলিতে প্রবেশ করিল। তাহার মাথায় ছাতা বা অন্য কোন আবরণ ছিল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া জল গড়াইয়া পড়িয়া আবার বৃষ্টির ধারার সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছিল। তখন রাস্তায় জনসমাগম খুব কম। গলির ভিতর খানিক দূর গিয়া লোকটী পিছন ফিরিয়া চাহিল, তারপর আরো একটী ছোট গলিতে খানিক দূর গিয়া একটী জীর্ণ দরজায় আঘাত করিল।

ভিতর হইতে মেয়ে গলায় প্রশ্ন হইল "কে ?"—

লোকটী চাপাস্বরে বলিল "ধুনি! আমি,—শিন্নির।

তারপরেই দরজা খুলিয়া গেল লোকটী আর একবার চারিদিকে চাহিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

ঘরটী অত্যন্ত ছোট। এক পাশে একটী আধভাঙ্গা তক্তপোশ, তার উপর ময়লা বিছানা পাতা। মাঝখানে একটী চট্ টাঙ্গাইয়া ঘরটীকে দুই ভাগ করা হইয়াছে। অন্য পাশে আর একটী ছোট তক্তপোষ এবং তার কাছে উনুন, পাশে থালা বাটী প্রভৃতি রান্নার সরঞ্জাম। লোকটী একটি পিড়ির উপর শ্রান্তভাবে বসিয়া পড়িল।

একটী অপরিষ্কার, ছেঁড়া কাপড়ে কোনরকমে গা ঢাকিয়া একটী পরমা সুন্দরী মেয়ে আগাইয়া আসিয়া লোকটীর গায়ে হাত দিয়াই বলিল—"ঈস্ একেবারে ভিজে চুপসে গেছ বাবা—অসুখ করবে যে।"

লোকটী মৃদুস্বরে বলিল—"আস্তে কথা ক ধুনি! পুলিশ্"

বিস্মিত দৃষ্টি পিতার মুখের উপর রাখিয়া সুরধুনী বলিল—"পুলিশ? পুলিশ, কেন বাবা ?"

লোকটী রুদ্ধস্বরে বলিল—"কি জিজ্ঞেস করছিস্ ধুনি ?"

ধুনী আবার বলিল—"পুলিশ তোমার পেছনে কেন বাবা ?"

পিতা বলিল "আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ করলেই পেছনে পুলিশ আসে মা !"

ধুনী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "তুমি আইনের বিরুদ্ধে কি কাজ করেছ ? এই অবস্থায় আছি তাও শান্তিতে থাকতে পারবো না ? কি করেছিলে তুমি বাবা ?"

লোকটী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপরে ধীরে মুখ তুলিয়া বলিল "কি করেছি ধুনি ? তবে শোন্ বলি, তোর কাছে আর লুকোবো না। ঐ তক্তপোষে কে প'ড়ে রোগের যন্ত্রনায়, বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে মারা গেছে— ? মনে পড়ে তোর মাকে ? ছুটেছিলুম কয়েকটী পয়সার একটু সাবুদানার জন্যে। গ্রামে ভিক্ষে ক'রে ক'রে কারো কাছে পাইনি, শেষে চুরী করেছি, সেই চুরী করতে গিয়ে খু— "

ধুনী অস্ফুট স্বরে বলিল "খুন— ?"

লোকটী বলিল—"হ্যাঁ ধুনি ! খুন ! অমন ক'রে বলিস্‌নে। বল আমার দোষ নয়, রামলালের ছুরিতে সে মরেছে।—কিন্তু এতদিন কি ক'রে তোকে মানুষ করেছি,—কি খাইয়ে অত বড় করেছি তা যদি জান্‌তিস !"

ধুনী কয়েক পদ পিছাইয়া গিয়া বলিল—"ছি—বাবা !"

"আজ তুই 'ছি' ব'লে দূরে স'রে গেলি কিন্তু যদি বুঝ্‌তিস তোরা, যে শুধু সন্তানের মুখে এতটুকু সুখের হাসি ফুটিয়ে তুলবার জন্য বাপ্ মা কত নীচ জঘন্য কাজ করতে পারে।"

"বাবা ! তবু আর কি আমাকে বাঁচিয়ে তুলবার অন্য উপায় ছিল না ?"

"ছিল না মা, ছিল না। সামান্য চাকরী করতুম। তোর মা পড়লো অসুখে—তার চিকিৎসায় সমস্ত মাইনের টাকা ব্যয় হ'য়ে গেল—তার'পর তার চিকিৎসা আর তোর খাবার ভাবনা। কি করি, খরচ কুলোতে না পেরে একদিন বড়বাবুর পকেট থেকে শ' দুয়েক টাকা নিয়ে নিরুদ্দেশ হলুম, মানে এই বাড়ীতে লুকিয়ে রইলুম।

ধুনী তখনো বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল।

সে বলিল—"কিন্তু বাবা খুন ?

"খুন হয়ে গেছে ধুনী, সইতে পারিনি, নিজেকে রোধ করতে পারি নি। একবার খুন করেছি ব'লে আমি অমানুষ নই। ধুনী দেখ আমার পিতৃত্বের, আমার স্বামীত্বের অপমান আমি করিনি মা ! কাছে আয়।"

সে কন্যার প্রতি হাত বাড়াইল।

সুরধুনী পিতার কোলে, ঝাঁপাইয়া পড়িল না। সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ধীরে প্রসারিত হাত সরাইয়া লইয়া পিতা বলিল—"ধুনি তুইও ঘৃণা করে মুখ

ফেরালি? কিন্তু তোদের জন্যই যে আজ আমার এই অবস্থা। কুকুরের মত তাড়া খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি আজ আমি অনাহারে অনিদ্রায়—শুধু তোদের জন্য। তুইও শেষে মুখ ফেরালি?"

স্থিরস্বরে সুরধুনী বলিল—"কিন্তু বাবা! আমরা তো বলে দিইনি তুমি চুরী কর, খুন কর। আরো তো অন্য উপায় বেছে নিতে পারতে বাবা!"

সে উঠিয়া দাঁড়াইল—ভিজা কাপড় তখন একটু শুকাইয়া গিয়াছে। দাঁড়াইয়া সে শুষ্কস্বরে বলিল—"ধুনি! বুঝেছি সংসারের রীতি এই। ছেলে মেয়ে বাপের দুঃখ বোঝে না, মর্ম্ম ব্যাথা জানতে চায় না, কিন্তু তবুও পিতা তাদের মায়া ছাড়তে পারে না। সন্তানের শত ঘৃণা সত্ত্বেও বাপ মা বুক দিয়ে যেন অকৃতজ্ঞ সন্তানকেই আগ্‌লে রাখতে চায়। সংসারের মোহ আমার কেটে গেছে। আমি চললুম। আর এখানে ফিরে আসবো না, আমার পোড়া মুখ আর দেখাব না তোকে। তোর ধর্ম্ম, তোর অভিমান নিয়ে তুই থাক্ ধুনি! যদি ধরা না পড়ি তবে অলক্ষ্যে থেকে বিতারিত হয়েও, স্নেহদৃষ্টি আমার তোরই ছায়া অনুসরণ ক'রে ঘুরে বেড়াবে। আর যদি ধরা পড়ি,—হ্যাঁ, আর এক কথা কাল কয়েক শো টাকা এনেছিলুম একজনার কাছ থেকে, সে টাকা একটী রুমালে বাঁধা ঘরের ঐ কোণে দেয়ালের ফাটালে আছে, ঐ টাকা নিয়ে তুমি যতদিন পার খেয়ো —তারপরে অদৃষ্ট—"

সে আর কোন কথা না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নিমিষে কোথা হইতে কি হইয়া গেল, সুরধুনী বুঝিতে পারিল না। একদিন দরিদ্র পিতার স্নেহের ঐশ্বর্য্যে সে বেশ সুখে শান্তিতে ছিল, আজ সে কি নিদারুণ কথা শুনিল? তাহার শান্তিময় দীনতা ঘেরা গৃহ কাহার অভিশাপ ভরা বুকের রক্তে জ্বালাময় হইয়া উঠিল? কাহার শত তপ্ত দীর্ঘশ্বাস তাহাকে দহন করিতে চায় বেদনার তীব্র দহনে? ছি! ছি! তাহার সমস্ত অস্তিত্ব,—রক্ত, মাংস পুষ্টি—ঐ দীর্ঘশ্বাসে গঠিত হইয়াছে। কত জনের বুকের রক্ত জমাট করা অর্থে তাহার এই জীবন! ঘৃণায় তাহার সারা অন্তর ভরিয়া উঠিল। পিতা—পিতা! সে যে তাহাকে দেবতার মত ভক্তি করিত "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ" মনে মনে বলিয়া সে যে নিত্য তাহার উদ্দেশে প্রণাম করিত। সে এই? তবু—তবু সে পিতা।

সুরধুনী আর্ত্তস্বরে "বাবা" বলিয়া ধূলিবিজড়িত গৃহতলে লুটাইয়া পড়িল।

[২]

অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান হইলে সুরধুনী উঠিয়া বসিল। তখন সকাল হইয়াছে।

মায়ের দ্বারে

ভবানীচরণ লাহা

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস, লিমিটেড।

চারিদিকে চাহিয়া দেখিল সত্যই তাহার জীবনে কি যেন একটা উলট পালট হইয়া গিয়াছে, সত্যই তাহার ঘর খালি—তাহার পিতার ছিন্ন মলিন বিছানা শূন্য।

প্রথমে তাহার মনে হইল পিতা আবার ফিরিয়া আসিবে—কিন্তু সে আসিল না।

সুরধুনী পিতার অপেক্ষায় বসিয়া বসিয়া কতক্ষণ কাটাইয়াছিল তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। যখন সূর্য্যরশ্মি বহুকষ্টে কয়েক মিনিটের জন্য ঐ অন্ধকার জমানো গলির ভিতর উঁকি মারিয়া সেই দিনের মত সরিয়া গেল, তখন সুরধুনী ক্লান্ত হইয়া সেইখানে ঘুমে ঢুলিয়া পড়িল।

সে ভাবিয়াছিল পিতা ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু সত্যই সে আসিল না। অভিমানের কঠিন আবরণে স্নেহ মমতা আবৃত করিয়া পিতা সন্তানকে ত্যাগ করিল।

কয়েকদিন চলিয়া গেল পিতা আসিল না।

সুরধুনীর মন পিতার জন্য কাঁদিয়া উঠিল। শত দোষ করিলেও সে পিতা, তাহার প্রাণদাতা। এইটুকুই যে তাহার যথেষ্ট পরিচয়—এর পর তাহার আর দোষগুণের বিচার চলিতে পারে না, তাহার অন্য কোন পরিচয় থাকিতে পারে না, সে ঈশ্বরেরই মত সর্ব্বদোষ গুণের অতীত—সে শুধু পিতা—পিতা।

ভরা বর্ষার অবিরাম জলধারা অনবরত পড়িয়া পড়িয়া শ্রান্ত হয় না; কিন্তু সুরধুনি বসিয়া বসিয়া শ্রান্ত হইয়া উঠে। ঐ বুঝি দরজায় কে আঘাত করিল? ঐ বুঝি তাহার অভাগা পিতার চির পরিচিত কণ্ঠস্বর "মা দরজা খোল।" বলিয়া ডাকিয়া উঠিল।

সে দরজা খুলিয়া দেখে—কোথায় কে?

তাহার মনে হয়, এই রকম বর্ষার সন্ধ্যায় মেঘের ডাকে ভয় পাইয়া, পিতার বুকে মুখ লুকাইয়া সে কত গল্প শুনিয়াছে। ছোটবেলা কতদিন আবদার করিয়া কোলের উপর সারারাত্রি ঘুমাইয়াছে আর পিতা বসিয়া ঘুমন্ত কন্যার তৃপ্তিভরা মুখের দিকে চাহিয়া হাসিমুখে বিনিদ্র অবস্থায় রাত্রি কাটাইয়া দিয়াছে। তাহার সেই পিতা অম্লান বদনে তাহাকে ত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া গিয়াছে। তবু সে পিতা। আজ সে কোথায় অনাহারে পুলিশের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়া লুকাইয়া বেড়াইতেছে। তাহার অন্তর ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়। সে উচ্ছ্বসিত চোখের জলে বুক ভাসাইয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠে "বাবা! "বাবা!"

তাহার মাছ তরকারী আনিবার কেহ নাই। ঘরে যা চাল ডাল ছিল তাহাই সে রোজ সিদ্ধ করিয়া খায়।

কিছুদিন এইভাবে কাটাইয়া সে হতাশ হইয়া পড়িল। সে নিশ্চয় করিল—পিতা তাহার আর আসিবে না। আজ হইতে বিশাল সংসারে সে একা। সুরধুনী কি করিবে

কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। নিজের জীবনের ভারে সে নিজেই অত্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠিল।

বাপের অসদুপায়ে লব্ধ টাকা তাহার আর লইবার প্রবৃত্তি রহিল না। ক্রমে সে একবেলা খাইতে লাগিল।

সে অত্যন্ত সঙ্কিত হইয়া উঠিল—তাহার চলিবে কিসে? ভিক্ষা সে করিতে পারিবে না, তবে যদি চাকুরী করিতে পারে।

[৩]

প্রকাণ্ড স্কুল, মস্ত বড় বাড়ী, বহু ছাত্রী।

তখনো ক্লাশ বসে নাই।

একটী মেয়ে বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়া একদৃষ্টে বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল। সুদৃশ্য একখানি মোটর ফটকের ভিতর ঢুকিতেই মেয়েটী রেলিঙ ছাড়িয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। মোটর বারান্দার সামনে থামিতে বই হাতে একটী মেয়ে নামিয়া হাসিমুখে বলিল "আজ একটু দেরী হয়ে গেছে বুঝি, ক'টা বেজেছে ভাই?

অন্য মেয়েটী বলিল "আজ একটু দেরী হয়েছে বই কি, বেশীক্ষণ গল্প করা হবে না। ঘণ্টা পড়বার আর মোটে পনেরো মিনিট বাকি।"

দুইজনে ক্লাসের দিকে যাইতে যাইতে নবাগতা মেয়েটী বলিল, "আজ বাড়ীতে অনেক লোকজন এসেছিল তাই দেরী হয়ে গেল।"

সুরধুনী বলিল "আমি ভাই তোমার দেরী দেখে ভাবছিলুম। প্রথম ক্লাস মিস জোন্‌সের, কারো একটু দেরী দেখলেই তিনি একবারে খাপ্পা হয়ে উঠেন।"

মনীষা বলিল "তাই নাকি? আজ মিস জোন্‌সের ক্লাশ? রুটীনটা মনেই ছিল না। পড়াও তো শিখিনি ভাল, কি হবে?"

সুরধুনী বলিল "আমি শিখেছি চল আমি তোমাকে এক্ষুনি মুখে মুখে বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

মনীষা ক্লাশে বই রাখিয়া সুরধুনীর সঙ্গে বাহিরে চলিয়া গেল।

ক্লাশ ঘরে তখন অনেকে ছিল। একটী মেয়ে বলিল "মনীষা মেয়েটী এতো proud—আমার মোটে ভাল লাগে না।"

মনীষার সঙ্গে সুরধুনীর গলাগলি বন্ধুত্ব। মনীষা ধনীর মেয়ে, বাপ নামজাদা বড়লোক, তার উপর ব্যারিষ্টার। সে রোজ দামী কাপড় গহনা পরিয়া, দামী মোটর

চড়িয়া স্কুলে আসে। আর সুরধুনী পিতৃপরিত্যক্তা, অনাথা, তবুও তাহাদের ভিতর সদ্ভাবের অভাব কখনো হয় নাই।

সুরধুনী যে কোন দিন এইভাবে থাকিতে পারিবে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। কিন্তু মানুষের অদৃষ্টলিপি অদৃশ্য বিধাতা পুরুষ কি ভাবে লেখেন তাহা কে কেমন করিয়া বুঝাইবে ? সে ভাবিয়াছিল তাহাকে চিরজীবন ঐ ছোট গলিতে, ছোট ঘরটীতে কাটাইয়া দিতে হইবে, অথবা কোথাও গিয়া কাহারো চাকরী করিতে হইবে। এই ভাবিয়া সে অনেক খানি বুক বাঁধিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু একদিন কোথা হইতে দেবতা প্রেরিত হইয়াই যেন তাহার দাদামহাশয় আসিয়া হাজির হইলেন। তাঁহাকে সে শৈশব অবস্থায় একবার দেখিয়াছিল মাত্র।

সরল উদার প্রকৃতি ধার্ম্মিক বৃদ্ধ বহুদিন আগে তীর্থ ভ্রমণে গিয়াছিলেন। দেশে আসিয়া প্রথমে মেয়েকে দেখিতে গিয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া নাতিনীকে বুকে টানিয়া লইলেন।

তিনি দেখিলেন, তাহার কন্যার সুখের সংসার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অদৃশ্য কাহার অভিশাপে সে শান্তির কুঞ্জে আগুন লাগিয়াছে।

নাতিনীর মুখে সব শুনিয়া বৃদ্ধ চোখের জল মুছিয়া বলিলেন "দিদি। কারো হাত নেই ভাই সব দোষ অদৃষ্টের।" বৃদ্ধ মনে মনে বলিলেন কিন্তু ভগবান! এতদিন কি শুধু ভুত সেবা করলুম, আমার জন্যই কি এই ভয়ানক শাস্তির বিধান করে রেখেছিলে ঠাকুর! কার দোষে, কোন্ অপরাধে ?

সেদিন দুইজনে অনেক কাঁদিল।

সেইখানে কয়েকদিন থাকিয়া বৃদ্ধ সুরধুনীকে বলিলেন—আমার তো একটা সংসার বোন, তোকে কোথায় রাখি ? ইস্কুলে যাবি ?"

সুরধুনী সাগ্রহে সায় দিল—"যাবো দাদু।"

দাদামহাশয় বলিলেন—"দিদি! সবই অদৃষ্টের ফের নইলে তোর বাপ শেষে এই হ'ল ? কিন্তু একবার মানুষের পতন হলেও তার ভিতরের ভালোর দিকটা একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায় না—কোনদিন তারও মনের ভুল ভেঙ্গে যায়, প্রাণের ময়লা কেটে যায়। সে বোধহয় ভালোই আছে আর আমার মনে হয় সে আবার ফিরে আসবে তোরা যে তার প্রাণ ছিলি দিদি।

তারপর হইতে সুরধুনী বোর্ডিংএ ভর্ত্তি হইল। তাহার সমস্ত খরচ দাদামশায় বহন করিতে লাগিলেন।

পিতার সেই টাকা সেইখানেই রহিয়া গেল সুরধুনী তাহা স্পর্শও করিল না।

বোর্ডিংএর শান্তিময় জীবন তাহার খুব ভাল লাগিল—সে মনে মনে তাহার অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিল। এ যেন অন্য রাজ্য ; ভিন্ন জীবন। কিন্তু তবুও অন্তর তাহার মাঝে মাঝে কাঁদিয়া উঠিত তাহার বিতাড়িত অপরাধী পিতার জন্য।

ক্রমে সে মনীষাকে বন্ধুভাবে পাইয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া গেল।

শনিবারে মনীষা বলিয়া কহিয়া বোর্ডিংএর কর্তৃপক্ষের কাছে ছুটী লইয়া বন্ধুকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল।

ধুনী অতবড় বাড়ী, শতশত আসবাব ও বিলাসের নানা আভরণ দেখিয়া খানিকক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

এতো সুন্দর সুন্দর জিনিস সংসারে আছে তাহা সে জানিত না।

তাহার ইচ্ছা হইতেছিল ঘরের মেঝেতে পাতা সুন্দর কার্পেটটার উপর একবার গড়াইয়া লয়—সাটিনের গদি আঁটা কৌচগুলাতে একবার সে বসিয়া পড়ে। সবার চাইতে ভাল লাগিল তাহার মনীষার মাকে। কি সুন্দর স্নেহভরা সৌম্য, শান্ত মূর্ত্তি; অনেকটা তাহার নিজের মায়ের মত। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল প্রাণ ভরিয়া "মা" বলিয়া ডাকিয়া তাহার বুকে মাথা রাখিয়া তৃপ্ত হয়।

সারাদিন সে সেইখানে কাটাইল। মনীষার সঙ্গে খাইল, এক বিছানায় সারাদিন শুইয়া গল্প করিল।

বহুমূল্য পালঙ্কে শুইয়া তাহার চোখের সামনে বার বার ভাসিয়া উঠিতেছিল তাহাদের জীর্ণ ঘরের ভাঙ্গা তক্তপোষের ছবি।

সে মনে মনে ভাবিল—বন্ধুকে তাহার সকল পরিচয় খুলিয়া বলিবে—কিন্তু তাহার পিতা যে পরস্বাপহারী হত্যাকারী তাহা সে কিছুতেই বলিতে পারিল না। বার বার তাহার ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে এ কথা ফিরিয়া গেল। তবে কি তাহার প্রকৃত পরিচয় লুকাইয়া সে ইহাদিগকে প্রতারণা করার অপরাধে অপরাধী হইতেছে? সে স্থির করিল একদিন সে মনীষাকে সব খুলিয়া বলিবে তাহাতে সে তাহাকে ঘৃণা করে করুক।

বৈকালে মনীষার মা দুইজনের চুল বাঁধিয়া দিলেন, তারপরে মনীষার একখানি দামী সাড়ী ধুনীকে দিয়া বলিলেন—"তুমি যখন মনীর বন্ধু তখন তুমি আমার মেয়ের মতো, এই সাড়ীটা মাঝে মাঝে পরো।" ধুনী লজ্জিত হইয়া সঙ্কোচভরে বলিল—"সাড়ী নেবো না মা, বোর্ডিংএ বকবেন।"

মা বলিলেন—"না, না, বকবেন না, আমি চিঠি লিখে দেবো এখন।"

এমন সময় মোটরের হর্ণ শুনিয়া মনীষা লাফাইয়া উঠিল—"ঐ বাবা এসেছেন"

মাকে বলিল "মা, ধুনীর কথা আমার কাছে শুনে শুনে বাবা অনেক দিন থেকে ওকে দেখতে চেয়েছিলেন, তুমি আগে কিছু বলো না মা, আমি বাবাকে অবাক ক'রে দেবো।

মা কোন কথা বলিলেন না, স্নেহভরে কন্যার দিকে চাহিয়া হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

মনীষা বলিল "ধুনি! সাড়ীটী পরনা ভাই।"

ধুনী এমন সাড়ী জীবনে কখনো স্পর্শ করিবারও সুযোগ পায় নাই। তাহার অন্তর তখন কি এক ব্যাথায় ভরিয়া উঠিয়াছে। মনীষার প্রতি হিংসায় নহে, কিন্তু তাহার সারা প্রাণ শুধু লুব্ধ আর্ত্তনাদে চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল, সে কেন মনীষা হইল না।

মনীষা আবার বলিল, "শিগ্‌গির প'রে নে ধুনি, নইলে মা মনে বড় কষ্ট পাবেন। তারপর তোকে বাবার কাছে নিয়ে যাবো।"

ধুনী আর আপত্তি না করিয়া সাড়ীখানী পরিল।

মনীষা উচ্ছসিত হইয়া বলিল "বাঃ! চমৎকার মানিয়েছে।"

মনীষার বাবা আসিয়া তাঁহার বিশ্রাম ঘরে বসিলেন। তাঁহার চুলগুলি দেখিয়া মনে হয়, তিনি প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিয়াছেন অনেকদিন আগে। কিন্তু মুখখানি সরলতা ও উদারতায় ভরা। মুখে তাঁ'র শিশুর মত প্রাণখোলা হাসি। সুরধুনী ভাবিয়াছিল মনীষার বাবা খুব রুক্ষ মেজাজি খিট্‌খিটে গোছের লোক হইবে, কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিয়া সে খুব বেশী আশ্চর্য্য হইয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সারা প্রাণখানি আনত হইয়া লুটাইয়া পড়িল বৃদ্ধের পায়ের উপর।

তিনি সুরধুনীকে দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন এবং অনেক আদর করিয়া বলিলেন "আজ আর একটী মেয়ে পেলুম, ঠিক যেনো লক্ষ্মীর প্রতিমা।"

খানিক পরে প্রকাণ্ড মোটরে পিতার সহিত মনি ও ধুনী বেড়াইতে বাহির হইল। ধুনী অনেক রকমের খেল্‌না, চক্‌লেট ইত্যাদি লইয়া রাত্রে বোর্ডিংএ নামিল। সেদিন বোর্ডিংএর মেয়েরা সকলে ধুনীর কথা লইয়া অনেক আলোচনা করিল।

ধুনী ক্রমে ক্রমে মনীষার বাবার অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিল। প্রত্যেক শনি রবিবার সে মনীষাদের বাড়ীতে থাকিত। ধুনী তাহাদের কাছে পিতামাতার স্নেহ যত্ন পাইয়া সকল দুঃখ ভুলিল। তাহার মন সুখ শান্তিতে ভরিয়া উঠিল।

তাহার কেবল মনে হইত যদি সেও তাহার পূর্ব্ব পরিচয় মুছিয়া তাহাদের মেয়ে হইতে পারিত। সে ঐশ্বর্য্য চায় না, টাকা চায় না, চায় শুধু মনীষার মত বাপ-মা। আজ যদি মনীষা সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিয়া তাহার বাপমায়ের স্নেহের দাবী ছাড়িয়া দিত, তাহা হইলে সে মনীষা হইতেও নিজেকে অধিকতর ঐশ্বর্য্যশালিনী মনে করিত।

[৪]

এইভাবে কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে ধুনী ও মনি তখন বি এ পড়িতেছিল।—

হঠাৎ একদিন ধুনী শুনিল সে অনেক টাকার অধিকারিণী হইয়াছে। তাহার দাদামহাশয় মৃত্যুর সময় উইল করিয়া তাহার সমস্ত সম্পত্তি তাহাকে দিয়া গিয়াছেন। সেইদিন তাহার অন্তর জ্বলিয়া উঠিল, দাদামহাশয়ের উপর রাগ হইল, অভিমান হইল। সে টাকা লইয়া কি করিবে? তাহার পিতা যখন পরের টাকা লইয়া তাহাকে প্রতিপালন করিল, যখন দারিদ্রের যন্ত্রণায় পাগল হইয়া খুন করিয়া নিজের সারা জীবনকে অভিশপ্ত করিয়া তুলিল, তখন কোথায় ছিল দাদামহাশয়, কোথায় ছিল তাঁহার টাকা? এখন টাকায় কি হইবে তাহার? জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ পিতৃ স্নেহে বঞ্চিত হইয়া, সম্মান মর্য্যাদা হারাইয়া আজ সে সম্পত্তি লইয়া কি করিবে? যাহার পিতার নামে দারুণ কলঙ্ক, যাহার পিতা আজ পথের ভিক্ষুকের চাইতেও হীন, তাহার টাকা লইয়া কি লাভ? দাদামহাশয়ের এ অর্থ যে তাহাকে আরো ভীষণ অনুতাপের আগুণে পুড়াইয়া মারিবে আজীবন। না, না, সে নিজের পরিচয় লুকাইয়া ঐশ্বর্য্যের কোলে আপনাকে বিলাইয়া দিতে পারিবে না। দাদামহাশয়ের যক্ষের ধন তাঁহারই থাকুক, অই রক্ত-জমানো টাকায় তাহার কোন আবশ্যকতা নাই।

কিন্তু ধুনী জানিল না যে তাহার দাদামহাশয় এ সম্পত্তি মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে উত্তরাধিকারী সুত্রে পাইয়াছিলেন, এবং তিনিও সম্পত্তি পাইয়া সেদিন হাসির বদলে কান্না দিয়া ঐ ঐশ্বর্য্যের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহারও মনে হইয়াছিল, বৃথা আজ কেন এ বোঝা? তাঁহার কন্যা বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে মরিয়াছে, জামাতা হত্যাকারী—চোর, তবে বৃথা এ অর্থে আজ তাঁহার কি প্রয়োজন? তিনি এ অর্থের একটী কপর্দ্দকও নিজে একদিনের জন্য স্পর্শ করেন নাই। ধুনীও এ সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিল না। সে যেমন ছিল তেমনি রহিয়া গেল।

একদিন সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে এক খবর দেখিয়া ধুনী অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল।

মনীষা ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—"ধুনি! কি হয়েছে ভাই? অসুখ করেছে"?

ধুনী উত্তর দিতে পারিল না, তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ মাটীর উপর লুটাইয়া পড়িল।

কয়েকদিন সে বিছানা হইতে উঠিতে পারিলনা। তারপর সে একদিন হঠাৎ ভিন্ন এক বাড়ীতে গিয়া সংসার পাতিয়া বসিল এবং দাদামহাশয়ের পরিত্যক্ত টাকা ও সম্পত্তি পরিচালনের ভার নিজ হাতে গ্রহণ করিল।

সমস্ত সহর জুড়িয়া সাড়া পরিয়া গিয়াছে। বহুদিন নিরুদ্দিষ্ট সুবিমল রায়ের হত্যাকারী ধরা পড়িয়াছে।

কাগজে কাগজে আলোচনা হইতে লাগিল—যে এইরূপ নৃশংস ভাবে একটী নিরপরাধী যুবককে হত্যা করিয়াছে, তাহার উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত।

মনীষার বাবা সরকার পক্ষ হইতে মোকদ্দমা চালাইবার জন্য নিযুক্ত হইলেন।

সকলে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে কপর্দ্দকহীন হত্যাকারীর পক্ষেও অজস্র অর্থ ব্যয় হইতেছে এবং তাহার পক্ষ সমর্থনের জন্য সহরের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ উকীল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইয়া গিয়াছে!

সুরধুনী কলেজ যাওয়া বা কাহারও সহিত দেখা করা ছাড়িয়া দিল, এমন কি মনীষার সঙ্গেও।

অনেকদিন মোকদ্দমার চলার পর, রায় বাহির হইল—হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড না হইয়া, হইবে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

সুরধুনী সেদিন সমস্ত সম্পত্তি জেলের ফেরৎ গরীব দুঃখীদের সাহায্যের জন্য সরকারের হাতে তুলিয়া দিয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার সারা মন অপূর্ব্বভাবে ভরিয়া উঠিয়াছে। রাত্রিতে সে তৃপ্তির দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। অনেকদিন সে এত শান্তিতে ঘুমায় নাই।

পরদিন জাহাজ ঘাটে অনেক লোক জমিয়াছে। সুবিমল রায়ের হত্যাকারী আজ আন্দামান যাইবে।

মনীষার বাবা একটু দূরে গাড়ী রাখিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি চমকিয়া দেখিলেন, প্রহরীবেষ্টিত অপরাধীর অনতিদূরে সুরধুনী দাঁড়াইয়া আছে—তাহার রুক্ষ মুখ, মলিন বেশ।

তিনি কোন কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া সুরধুনীর কাছে গিয়া বলিলেন—"ধুনি! তুমি এখানে কেন মা?

ধুনী অবিচলিতস্বরে বলিল "বাবা! আমি দেশ ছেড়ে যাচ্ছি।"

"কেনো?"

"নিজের কর্ত্তব্য করতে। আপনার স্নেহের ঋণ আমি জীবনে শোধ দিতে পারবো না বাবা! মাকে বলবেন, আর মনীকেও বলবেন আমার কথা যেনো মাঝে মাঝে মনে করে।"

মনীষার বাবা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন "কিন্তু আমি যে কিছু বুঝিতে পারছিনা, ব্যাপার কি? কার প্রতি কর্ত্তব্য?

ধুনী বলিল—“কর্ত্তব্য আমার বাবার প্রতি।”

“কই কে তোমার পিতা ?

ধুনী নিঃশব্দে আঙ্গুল দিয়া প্রহরীবেষ্টিত বন্দীকে দেখাইয়া দিয়া ধীরে ভীড়ের ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল।

তাহার পিতৃতুল্য হিতৈষী বৃদ্ধ অনেক খুঁজিয়াও তাহাকে না পাইয়া যখন ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া হতাশ ভাবে এক পাশে দাঁড়াইলেন, তখন জাহাজের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে। তিনি দেখিলেন সুরধুনী জাহাজের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। ক্রমে জাহাজ জেটি পরিত্যাগ করিল।

চক্ষুর জলে বৃদ্ধের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া গেল।
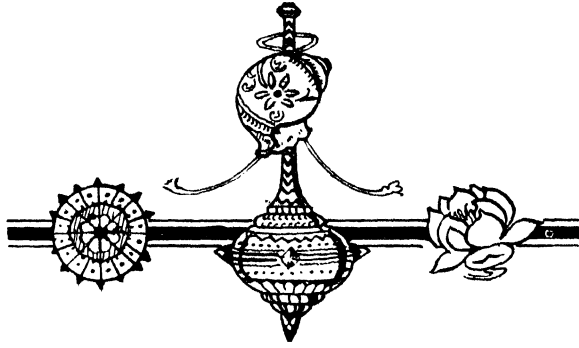
ঘুমপাড়ানি গান

শ্রীমমতা মিত্র

ঘুমো, আমার চাঁদের কণা ঘুমো,
দু'গালে তোর দিলাম্ দুটি চুমো।
ঘুমো যাদু ঘুমো, বসে তোর পাশে
রূপকথা যে রে কব মৃদু ভাষে।

রই অনিমেষে তোর মুখ চেয়ে,
স্নেহ দিয়ে তোরে চাই দিতে ছেয়ে।
কত সাধ আশা কি জানি কি সুখে
সুপ্ত আছে মোর মাণিকের বুকে।

সারাদিন খেলে শ্রান্ত বড় তুই,
আয় মোর কোলে মাথা তোর থুই।
গুন্ গুন্ করে গান গেয়ে রাতে
ঘুম এনে দিই দুটি আঁখি পাতে।

বুজে থাক্ চোখ, রজনীর শেষে
ভেঙে দেবে ঘুম হেসে উষা এসে।
দুটি গালে এই দিনু দুটি চুমো,
রাতটুকু মণি ঘুমো তুই ঘুমো।

দরদ

শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী

দেশে বড় দুর্দ্দিন; মহামারী, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষে চারিদিকে হাহাকার। ধনী সওদাগর জাফরও তা'র যথাসর্ব্বস্ব হারিয়েছে। একে একে তার বাড়ী-ঘর, ধন-দৌলত, জমি-জমা সব গেছে; আত্মীয় বল্‌তেও আর কেউ নাই। আছে শুধু তার সেই অতিপ্রিয় রুস্তম নামে ঘোড়াটি। সেটি তার প্রাণের সমান প্রিয় জিনিষ; যতক্ষণ তার প্রাণ ততক্ষণ রুস্তমও তার সঙ্গী।

সর্ব্বস্ব হারিয়ে ক্লান্ত শরীরে, বিষন্ন মনে সে নগরের রাস্তা দিয়ে চ'লেছে; ঘোড়ার লাগামটি হাতে ধরে তাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছে পিঠে চড়ে যাবার আর তা'র ইচ্ছা কর্‌ছে না। বহুক্ষণ এই ভাবে চলে অবসন্ন হয়ে শেষটায় সে সরাই খানায় এসে এক কোণে শুয়ে পড়্‌ল। ঘোড়ার লাগামটি তখনও তার হাতে; বিশ্বাসী ঘোড়াও প্রভুর পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে।

শরীর বড়ই ক্লান্ত, মনও ভেঙে পড়েছে; টাকা পয়সাও হাতে কিছুই নেই। জাফরের ছেলে বেলাকার বন্ধু হাফেজ এই সময় সেই সরাই খানায় এসে জাফরের অবস্থা দেখে তাকে বল্‌লে "ভাই তোমার এই অবস্থায় যদি আমার দ্বারা কোন উপকার হয় তো বন্ধুর ঋণ কতক পরিমাণে শোধ হ'তে পারে। তোমার ঘোড়াটি যদি আমাকে দাও তো আমি দশ হাজার মোহর এখনই দিই তোমাকে। একা মানুষের এই টাকায় জীবন কেটে যাবে,—কি বল?"

রুস্তম ছিল জাফরের প্রাণের সমান; এমন ঘোড়া আর সে মুলুকে মেলেনা। শতবার পরীক্ষায় প্রমান হয়েছে রুস্তমের সমকক্ষ কোন ঘোড়া সে দেশে নেই। সেই বহুকাল ধরে রুস্তম জাফরের নিত্য-সঙ্গী; ছেলের মতন সে ঘোড়ার যত্ন করে। সেই ঘোড়াকে বিক্রী করার কথা শুনে জাফর উত্তেজিত হয়ে বলে উঠ্‌ল, "যাও, যাও! এমন হীন প্রস্তাব আমার কাণে তু'লো না! রুস্তমের জুড়ি এ মুলুকে মেলে না; চিরদিনই এ সব ঘোড়ার সেরা; এর দাম কি টাকায় দেওয়া যায়? একে আমি কোন মতে ছাড়্‌ছি না।"

ঘোড়াটির প্রতি হাফেজের বিশেষ নজর ছিল; তাই সে দশ হাজার থেকে পনের, পনের থেকে কুড়ি—এমনি ক'রে পঞ্চাশ হাজার মোহর পর্য্যন্ত রুস্তমের দাম দিতে চাহিল ;—জাফর নিতান্ত তাচ্ছিল্যের ভাবে, তা'র কথায় কানই দিল না। শেষটায় নিরাশ হয়ে হাফেজ ফিরে গেল।

বাড়ী গিয়ে হাফেজ আবার ঘোড়াটির কথা ভাব্‌তে লাগ্‌ল ; সেই ঘোড়াটি তার চাই-ই। চুরি করাটা নিতান্ত নীচ জঘন্য কাজ; সেটা তার দ্বারা হ'তে পারে না। তবে কেমন ক'রে ঘোড়াটি পাওয়া যায়? না পেলেও তো চল্‌বে না। এখন কি উপায় করা যায়?—

হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। চুরি না করেও তো রুস্তমকে পাওয়া যেতে পারে! রুস্তমের বদলে যদি আরেকটি জবরদস্ত ঘোড়া জাফরকে দেওয়া যায়, তবে তো চুরি কর্‌বার আর দরকার হয় না।

কিন্তু, জাফর কি তাতে রাজী হবে?—মনে তো হয় না। ঘুমের মধ্যে যদি কাজটি সারা যায় তবে হ'তে পারে। তাতে দোষই বা কি? খুব ভালো ঘোড়া তো তাকে দেওয়া হবে। না হয় সেই ঘোড়ার সঙ্গে কয়েক হাজার মোহরও দেওয়া যাবে তা'কে—ঘোড়া-কে-ঘোড়া, টাকাকে-কে-টাকা, দুই-ই সে পাবে।

তখনই হাফেজ ঘোড়ার খোঁজে চল্‌ল। কোতয়াল আবদুল্লার ঘোড়া 'পাশা' রুস্তমের সঙ্গে পাল্লা দেবার উপযুক্ত যদিও সে রুস্তমকে হারাতে বা তার সমকক্ষ হ'তে পারেনি। পাশাকে পেলে মন্দ হয় না। না হয়, আরো দশ হাজার মোহরও তায় ধরে দেওয়া যাবে ;—অন্যায় কিছু হবে না।

আবদুল্লা "পাশার" দাম চল্লিশ হাজার মোহর হেঁকে বস্‌ল। হাফেজ কত দোহাই দস্তুর করল; কিছুতেই দাম একটি মোহরও কমাল না। শেষটায় নিরুপায় হয়ে, চল্লিশ হাজার মোহর দিয়েই পাশাকে কিনে নিল; তারপর পিঠে চড়ে সরাইখানার দিকে রওয়ানা হ'লো।

সরাইখানার কাছে গিয়ে, ঘোড়া থেকে নেমে, চুপি চুপি এগিয়ে গিয়ে হাফেজ দেখিল জাফর তখন ঘুমোচ্ছে। পাছে কেউ রুস্তমকে নিয়ে পালায়, তাই সে ঘোড়ার লাগামটি নিজের হাতের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে।

হাফেজ দেখ্‌ল, এই সুযোগ। তখনই সে পাশাকে আস্তে আস্তে নিয়ে এসে রুস্তমের পাশে দাঁড় করাল। অতি সন্তর্পনে রুস্তমের লাগাম কেটে ফেলে, কাটা লাগামে 'পাশার' লাগামটি বেঁধে, রুস্তমকে নিয়ে সে রওয়ানা হ'লো।

রুস্তমের ভাবনায় জাফরের ঘুম খুব হাল্কাই ছিল; তাই লাগাম কাটা খুব সন্তর্পনে

হ'লেও তার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলেই সে পাশাকে দেখ্‌তে পেল—তাকিয়ে দেখ্‌ল হাফেজ রুস্তমের পিঠে চ'ড়ে ছুট দিয়েছে। অমনি, আর কথাবার্ত্তা নেই; পাশার পিঠে চ'ড়ে সেও রুস্তমের পিছনে ছুট্‌ল।

রুস্তমের সঙ্গে দৌড়ে পারে এমন ঘোড়া সে মুল্লুকে ছিল না; পাশা তার সঙ্গে সমানে পাল্লা দেবার উপযুক্তই নয়। কিন্তু রুস্তমের একটি অভ্যাস ছিল;—তার কানে একটা মন্ত্র না বলে দিলে সে আসল বেগ কিছুতেই দেখাতে পার্‌ত না। চল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেই তার কাণে মন্ত্রটি বলা চাই;—নইলে আস্তে আস্তে তার এ তীরবেগ ক'মে আস্‌বে।

কাজেও তাই হলো। হাফেজ কিছু দূর গিয়েই টের পেল ঘোড়ার বেগ কমে আসছে চাবুকেও কোন কাজ হচ্ছে না; পাশা ক্রমে এগিয়ে এসে তাকে ধরে ফেলছে।

জাফরের মন কিন্তু একেবারে দমে গেছে। তার প্রাণ প্রিয় রুস্তম চিরদিনই প্রথম আজ কিনা সে মন্ত্র উচ্চারণ বিনা অন্য ঘোড়ার সমকক্ষ হয়ে পড়্‌ছে! সেটা তার সহ্য হয় কেমন করে? —কখনই সে তা হতে দেবে না!

পাশা যখন প্রায় রুস্তমকে ধর-ধর, জাফর পিছন থেকে চিৎকার করে বলে উঠলো, ওরে মুর্খ রুস্তমের কাণে মন্ত্র না দিলে কেমন করে সে দৌড়বে?—বলে সে মন্ত্রটি উচ্চারণ করল। বুদ্ধিমান হাফেজও সঙ্গে-সঙ্গে রুস্তমের কানের কাছে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করল।

যাহাতক মন্ত্র উচ্চারণ অম্‌নি রুস্তম তীর বেগে দে ছুট দিল—কোথায় রইল পাশা, কোথায় রইল জাফর— দেখতে দেখতে হাফেজ আর রুস্তম অদৃশ্য হয়ে গেল। জাফর শুধু একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বলল রুস্তম আমার চিরদিনই প্রথম;—তাই আজও সে আমার মান রক্ষা করে আমারই মুখ উজ্জ্বল করে চলে গেল। পরাজয়ের আঘাত সে আমার বুকে লাগতে দেয় নি। দরদী বিদায় কালেও প্রাণের দরদ বোঝে!—

"অমৃতসহরে একদিন"

গত বৎসর বড়দিনের ছুটিতে আমরা দিল্লীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমের শীতে শরীরটাকে কিছু মেরামত করে নেওয়া এবং দিল্লীকে Head Quarter করে কাছাকাছি হিন্দুস্থানের দেশগুলিও দেখা।

স্বর্ণ-মন্দির অমৃতসহর

দিল্লীর বাদসাদের আমলের ফোর্ট ও কুতবমিনার, আগ্রার সৌন্দর্য্যের উপাসক সাজাহানের তাজ, অমৃতসহরের বিখ্যাত স্বর্ণ মন্দির প্রভৃতি কয়েকটী জিনিষ দেখবার লোভ অনেকদিন থেকেই ছিল। তাই দিল্লী থেকে লাহোর যাবার পথে শিখদের তীর্থক্ষেত্র অমৃতসহর এবং ফেরবার পথে হিন্দুর পরম তীর্থস্থান কুরুক্ষেত্র দেখে আসব বলে ঠিক কর্লাম।

২৭শে ডিসেম্বর সন্ধ্যার গাড়ীতে রওয়ানা হয়ে আমরা তার পরদিন ভোরবেলা অমৃত-সহরে পৌঁছলাম। ষ্টেশনের Waiting-roomএ চাকরের জিম্মায় সব জিনিষপত্র রেখে একটা Restaurantএ চা খেয়ে নিয়ে আমরা একটা "টঙ্গা" নিয়ে সহর দেখ্‌তে বেরিয়ে পড়লাম।

সহরে কোথায় কোথায় গেলাম এবং কি কি দেখলাম, বলার আগে অমৃত-সহর

সহরটীর ইতিহাস সম্বন্ধে এখানে দুই একটী কথা বলে নিই। "অমৃত সহর" সহরটী খুব পুরাতন নয়—মাত্র তিন পুরুষ আগেকার। অমৃত সহর শিখদের প্রধান তীর্থস্থান হলেও শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গুরুনানকের সঙ্গে এই সহরের কোন সম্বন্ধ নেই। শিখদের চতুর্থ গুরু রামদাসের সঙ্গে এই সহরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তিনিই ইহার প্রতিষ্ঠাতা।

স্থানটী সাধনোপযোগী দেখে গুরু রামদাস এই অঞ্চলে এসে একটী সরোবরের তীরে বাস করতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই সরোবরটী চতুপার্শ্বস্থ জমি সহ কিনে নেন্। কয়েক বৎসর পরে, সরোবরটী পরিষ্কার করিয়ে তার মাঝখানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ক্রমে শিষ্যদের বাসের জন্য সরোবরতীরে গৃহাদিও নির্ম্মিত হয়।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে জায়গাটী শিখদের একটী তীর্থস্থান হয়ে দাঁড়াল এবং মন্দিরটীর আশে পাশে অনেক লোকের বসতিও হল। কালক্রমে ইহা একটি ছোট খাট সহরে পরিণত হল। প্রথমে সহরটী "রামদাসপুর" নামেই পরিচিত ছিল, পরে ইহার নাম, "অমৃত সরোবরের" নামানুসারে "অমৃত সহর" হয়।

হিন্দুরা যে চক্ষে গঙ্গাকে দেখেন, শিখেরা এই অমৃত সরোবরটীকে দেখেন সেই চক্ষে। শুনা যায় সরোবরের একটী অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তাই বোধহয় ইহা অমৃত সরোবর নামে পরিচিত। কথাটা সত্য কি না জানি না, তবে এ সম্বন্ধে সুন্দর একটী কিম্বদন্তী আছে। সেটী পরে বল্‌ব।

শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জ্জন,—যিনি উহাদের "আদিগ্রন্থ" লিখেছেন—গুরু হয়ে এই সরোবরটীকে সংস্কৃত করিয়ে মন্দিরটীর অসম্পূর্ণ অংশ শেষ করেন। বর্ত্তমানে দর্শক-গণ অমৃত সহরে গিয়ে যে মন্দিরটী দেখেন, সেটী কিন্তু রামদাস ও অর্জ্জন নির্ম্মিত মন্দির নয়। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদ্ সা দুরাণী এসে সেটী নষ্ট করে দেন। এই ঘটনার তিন বৎসর পরে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে শিখগণ ঐ জায়গাতেই আবার নূতন একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন—সেইটীই বর্ত্তমান স্বর্ণমন্দির।

সরোবরটীর সম্বন্ধে যে সুন্দর গল্প আছে সেটী হচ্ছে এই—গুরু রামদাসের সময় এখানে নাকি একজন ধনী লোক বাস করতেন—তাঁর ছিল পাঁচ মেয়ে। বাপের ইচ্ছা ছিল তিনি তাঁর পাঁচ মেয়েকেই খুব বড় ঘরে বিয়ে দিয়ে পার্থিব সকলপ্রকার সুখসম্পদের অধিকারিনী করে যান। কিন্তু তাঁর ছোট মেয়ের প্রকৃতি ছিল একটু ভিন্ন ধরণের,—তাঁর পার্থিব ধনসম্পদের প্রতি কোন আকর্ষণই ছিল না। ধর্ম্মচিন্তা, ধর্ম্মালোচনা প্রভৃতি তাঁকে বেশী তৃপ্তি দিত। কন্যার এই সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য দেখে পিতা অত্যন্ত অপ্রসন্ন হতেন এবং নানা প্রকারে তাঁকে সংসারের দিকে টানতে চেষ্টা করতেন।

শেষে একদিন তিনি নিতান্ত বিরক্ত হয়ে, কন্যাকে জব্দ করবার জন্য এক খঞ্জ, গলিতাঙ্গ কুষ্ঠরোগীর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিলেন এবং বিয়ের পর নির্ম্মমভাবে মেয়েকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

মেয়েটী আর কি করে! সেই খঞ্জ, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত স্বামীকে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়্ল। যেখানে যায়, সেখানেই একটী বেতের চুব্ড়ীতে করে স্বামীকে বয়ে বয়ে নিয়ে যায়। এই ভাবে তাঁর দিন কাটে।

একদিন মেয়েটী স্বামীকে এই সরোবরের তীরে রেখে, মন্দিরের রন্ধনশালা থেকে কিছু খাবার আন্তে যায়। স্ত্রীর জন্য তখন অপেক্ষা কচ্ছেন এই রকম সময়ে স্বামী একটী আশ্চর্য্য ঘটনা দেখলেন। তিনি দেখলেন যে একটী কাল পাখী জলে ডুব দিয়ে যখন উঠ্ল তখন তার বর্ণ ধব্ধবে শাদা হয়ে গিয়েছে। তিনি ত এই ঘটনা দেখে অবাক। তারপর ক্ষণকাল চিন্তা করে তিনিও কোনরকমে সরোবরে নেমে স্নান করতে আরম্ভ করলেন। স্নান করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সকল রোগ সেরে গেল এবং অঙ্গ বিকৃতি দূর হয়ে পূর্ণ যৌবন ফিরে এল।
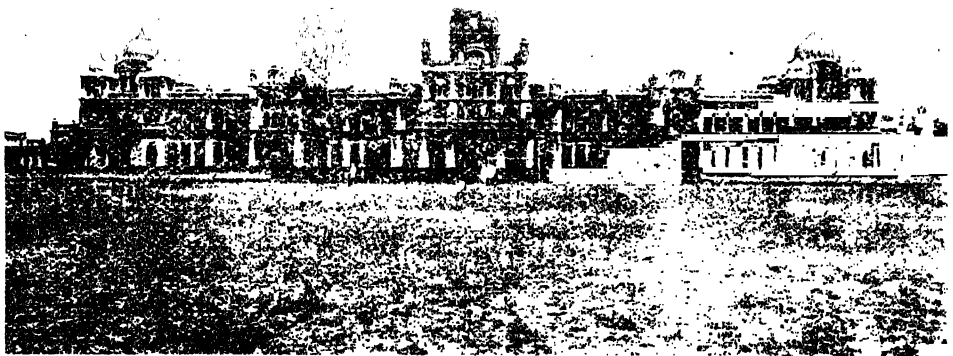
খালসা কলেজ

এই গল্পটী ছাড়া আর একটী কিংবদন্তী শোনা যায় এই সরোবরটী সম্বন্ধে। এই খানেই নাকি লব ও কুশদ্বারা রামের সমস্ত সৈন্যদল নিহত হয় এবং তারপর স্বর্গ থেকে অমৃতধারা বর্ষিত হয়ে মৃত সৈন্যদলকে সঞ্জীবিত করে তোলে।

যে কারণেই হউক সরোবরটীকে শিখগণ অতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন।

এই ত গেল অমৃত সহরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের কথা। এখন সহরে কি কি দেখলুম, সেই বিষয়ে তোমাদের কিছু বলি।

ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে আমরা সর্ব্বপ্রথম "দরবার সাহেব" দেখতে গেলাম। সোণার মন্দিরটীকে শিখগণ দরবার সাহেব বলে থাকে।

বাজারের কাছেই মন্দিরটীর সামনেই একটী Clock Tower—মন্দিরটী যে একটী সুবৃহৎ সরোবরের মাঝে অবস্থিত সে কথা ত আগেই বলেছি।

সরোবরটী বাঁধান এবং তার চারিপাশ দিয়ে গিয়েছে লোকচলাচলের জন্য চওড়া মার্ব্বেল পাথরের চত্বর।

এই চত্বরে নামবার আগে আবালবৃদ্ধবণিতা, স্বদেশীবিদেশী সকলকেই জুতা খুলে ফেলতে হয়। অধিকাংশলোকই খালি পায়ে মন্দিরে যায়, তবে যাঁদের অসুবিধে হয় তাঁদের মোজা প'রে যেতে দেয়। কিন্তু এর মধ্যে আর একটী কথা আছে মোজা জোড়া আন্‌কোরা নূতন হওয়া চাই সে শুধু পায়েই পরা হোক অথবা ব্যবহৃত যে মোজা পায়ে থাকে তার উপরেই পরা হোক! এই জন্য কাছেই দুই একটী লোককে অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে মোজাও বিক্রী করতে দেখলাম।

চত্বরে নামবার সিঁড়ির পাশেই একজন শিখ বসেই থাকে। তারই জিম্মায় সকলে জুতা রেখে যায়। তার জন্য তাকে কিছু দেবার কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নেই। দর্শকদের মধ্যে কেউ যদি বখ্‌শীষ স্বরূপ কিছু দেন ভালই তা'নাহলেও কিছু ক্ষতি নেই। তবে প্রায় সকলেই তাকে কিছু না কিছু বখ্‌শীষ দিয়ে থাকেন। আমরাও আমাদের জুতা তার কাছে রেখে গেলাম।

তারপর সিঁড়ি দিয়ে চত্বরে নেমে আমরা পশ্চিম মুখে গেলাম। কারণ এই দিকেই মন্দিরে যাবার সুপ্রশস্ত, সুন্দর শ্বেতপাথরের সেতুটী অবস্থিত। সেতুটীর দুই পাশে আলোর সারি এবং আমরা যেদিন গিয়েছিলাম ঠিক তার আগের দিন এঁদের উৎসব ছিল বলে সেতুটী আগাগোড়া গাঁদা ফুলের মালা দিয়ে সাজান দেখলাম।

সেতুর প্রবেশদ্বারটী "দরশনী দরওয়াজা" নামে খ্যাত। এখানে ঢোকবার আগে আবার একজনের কাছে ছাতা লাঠি ইত্যাদি রেখে যেতে হয় তার বদলে একটী নম্বরওয়ালা ধাতব চাকৃতি দেয়।

সেতুর উপর থেকে মন্দিরটীর দৃশ্য অতি মনোরম। মন্দিরটী আগাগোড়া সাদা মার্ব্বেল পাথর দিয়ে তৈরী এবং মাথার উপর একটী প্রকাণ্ড সোণালী গম্বুজ। গম্বুজটী তামার পাতের উপর সোণার জল করা বলে শুন্‌লাম। প্রভাতের সূর্য্যরশ্মি লেগে ইহা ঝল্‌মল্‌ কচ্ছিল।

চারিদিকের মার্ব্বেল পাথরের দেওয়ালের তলার দিকে, প্রায় ছয় ফুটের উপর পর্য্যন্ত নানা রংবেরংয়ের চমৎকার চমৎকার ফুল, পাতা, পাখী ইত্যাদি খোদাই করা এবং উপরের দিকে নানা ধর্ম্মশ্লোক লেখা রয়েছে।

"দরবার সাহেবের" সৌন্দর্য্যে আমরা সকলেই মুগ্ধ হলাম কিন্তু মন্দিরটীর বাহ্য সৌন্দর্য্যের থেকেও আর একটী জিনিষ আমাকে বেশী মুগ্ধ এবং চমৎকৃত করেছিল। সেটী হচ্ছে—সেখানকার স্বর্গীয়ভাব! কি পবিত্রভাব সেখানে! মাথা আপনাথেকেই নুয়ে পড়তে চায়। দলে দলে সহস্র সহস্র নরনারী আস্‌ছেন একসঙ্গে, পর্দ্দার কোন বালাই নেই। কেউ বা আস্‌ছেন হাত জোড় করে শ্লোক বল্‌তে বল্‌তে, কারও বা হাতে ছোট আকারের ধর্ম্মপুস্তক—এই রকম কত শত লোক যে দেখা গেল তার ঠিকানা নেই। রোজই নাকি এত লোক আসে।

প্রত্যেকের মুখেই একটী শান্ত সমাহিত ভাব। আমরা অবাক্ হয়ে তাই দেখতে লাগ্‌লাম। আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেখানে এত নরনারীর সমাগম হলেও একটুকু কোলাহল নেই, এতটুকু ধাক্কাধাক্কি নেই—কি অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ শান্তি বিরাজমান!

মন্দিরের ভেতরের দৃশ্য আরও মনোরম। মাঝখানে জলচৌকির উপর "গ্রন্থসাহেব"কে রাখা হয়েছে। গ্রন্থসাহেব মানে নানকের উক্তি সন্নিবেশিত পুস্তক। পুস্তকটী আগাগোড়া ফুলে ঢাকা। একজন দাঁড়িয়ে চামর ব্যজন কর্চ্ছে। ঘরের একপাশে একদল লোক হারমোনিয়ম সংযোগে ভজন গাচ্ছে। গ্রন্থসাহেব ছাড়া অপর কোন বই থেকে এদের ভজন গান করবার নিয়ম নেই। আর এক পাশে একটী লোক প্রকাণ্ড একটী থালায় হালুয়ার মত কি জিনিষ নিয়ে বসে আছেন। দেখলাম আগন্তুকদের প্রত্যেককে তিনি সেই প্রসাদ পরিবেশন কচ্ছেন। এখানেও একটুকু কোলাহল নেই; সব কাজ নিঃশব্দে হচ্ছে।

গ্রন্থসাহেবকে যে ঘরে রাখা হয়েছে, সে ঘরটী বিশেষ বড় নয়। তার চারিপাশ দিয়ে চওড়া বারান্দার মত আছে এবং তার বাইরে ঘোরান চত্বর। দর্শকদের মধ্যে সকলেই সেই বারাণ্ডা দিয়ে মন্দিরটী একবার প্রদক্ষিণ করলেন এবং যাবার সময় প্রায় সকলেই গ্রন্থসাহেবের উপরকার প্রসাদী ফুল এবং হালুয়া নিয়ে গেলেন। আমাদেরও প্রসাদী মালা দেওয়া হয়েছিল। অনেকে আবার ফুলের মালা এবং ফুল এনে অর্ঘ্যও দিলেন।

মন্দিরে এই রকম ভজন ও প্রসাদ বিতরণ সারাদিন চলে। রাত্রির বেলা মাত্র ঘণ্টা পাঁচেক ভজন বন্ধ থাকে। রাত্রি তিনটা থেকে ভজন আরম্ভ হয়ে সেই রাত্রি দশটা অবধি সমানে ভজন চলে।

বারাণ্ডার জায়গায় জায়গায় দেখলাম তুই একটী বৃদ্ধা তন্ময় হয়ে ভজন্ শুন্‌ছেন অথবা ধর্ম্মপুস্তক পড়ছেন। কি একাগ্রতা এবং তন্ময়তার ছাপ সকলের মুখে—অনির্ব্বচনীয় এই দৃশ্য!

তারপর আমরা দোতালায় গেলাম। পূর্ব্বদিকে সিঁড়ির পাশেই একটী ছোটঘর আছে, সেটী "শিসমহল" নামে পরিচিত। দিল্লী, আগ্রার ফোর্টের "শিসমহলের" ধরণেই এটী তৈরী। এইটী শুন্‌লাম শিখগুরুদের সাধন ভজনের ঘর ছিল—এখন অবশ্য খালিই দেখ্‌লাম। উপরে আর বিশেষ কিছু নেই। একটী বারাণ্ডা ঘুরে গেছে মাত্র।

অকাল তক্ত

"দরবারসাহেব" দেখে আমরা বাইরে এলাম। দর্শনী দরওয়াজার কাছেই তোষাখানা এবং প্রায় তার সামনেই "অকালতক্ত"। এই অকাল তক্ততেই রাত্রির বেলা ঘণ্টা কয়েকের জন্য গ্রন্থসাহেবকে এনে রাখা হয় এবং যাঁরা নূতন শিখধর্ম্ম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হন, তাঁদের এইখানেই দীক্ষা দেওয়া হয়।

দরবার সাহেবের মন্দিরের অনতিদূরেই "বাবা অটলে"র মন্দির। এই সাততালা সোণার চূড়াওয়ালা মন্দিরটী দর্শক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই মন্দিরটীর সঙ্গে একটী অতি করুণ ঘটনার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। অটল বাবা গুরু হরগোবিন্দের পুত্র ছোটবেলা থেকেই বালক এক অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী।

একদিন পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল; কাজেই অটল এবং অন্যান্য সঙ্গী সকলকেই খেলা অসমাপ্ত রেখেই সেদিনকার মত বাড়ী যেতে হল। কথা রইল পরের দিন সকালেই অসমাপ্ত খেলা শেষ করা হবে।

পরদিন প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠেই অটল তার সাথী মোহনের বাড়ী গেল তাকে ডাকতে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখে যে মোহন সর্প দষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে এবং বাড়ীর সকলেই শোকাচ্ছন্ন। এই দৃশ্য বালকের মনে অত্যন্ত আঘাত করল। সে তাড়াতাড়ি মোহনের কাছে গিয়ে তার মৃতদেহ স্পর্শ করে তাকে উঠ্তে বল্ল। মুহূর্ত্ত মধ্যে মৃতদেহের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হোল এবং মোহন উঠে বস্ল।

বাবা অটলের মন্দির

এই অলৌকিক ঘটনায় সকলের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না এবং লোক পরম্পরায় এই অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী ছড়িয়ে পড়তেও দেরী হলো না।

হরগোবিন্দের কাণে যখন এই ঘটনার কথা পৌঁছিল, তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে পুত্রকে ডেকে ভৎর্সনা করে বল্লেন, "গুরুদের এই ঐশ্বরিক ক্ষমতা ভোজবাজী দেখিয়ে অপব্যয় করবার জন্য নয় ;—ইহা তাদের পবিত্র ধর্ম্মভাবের এবং উন্নত জীবনের ভিতরই ফুটে ওঠা দরকার।"

পিতার এই ভৎর্সনায় অটল অতিশয় ক্ষুণ্ণ হয়ে বল্ল "আচ্ছা, একটী জীবনের ত প্রয়োজন হয়েছে, আমিই আমার নিজের জীবন দিচ্ছি।" এই বলে সেই খানেই বালক দেহত্যাগ করল।

এই অটল বাবার স্মৃতিস্বরূপ এই সাততলা মন্দিরটী নির্ম্মাণ করা হয়। দেহত্যাগ কালে অটলের বয়স মাত্র সাত বৎসর ছিল, সেই জন্যই মন্দিরটী সাততলা করা হয়।

সরোবরের চারিপাশে ছোট ছোট আরও অনেকগুলি মন্দির আছে। তাছাড়া এখানে অনেক অতিথিশালা, দাতব্যচিকিৎসালয় এবং প্রকাণ্ড একটী রন্ধনশালাও আছে। এখানে অন্নপ্রার্থী হয়ে এলে কাহাকেও নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হয় না। ধনী নির্ধন, দেশী বিদেশী জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকেই এখানে অন্ন বিতরণ করা হয়।

আর একটী জিনিষ আমরা লক্ষ্য করলাম সেটী হচ্ছে, ভিক্ষুকের উপদ্রব এখানে একেবারেই নেই। একটী দুটী বৃদ্ধ অন্ধকে ভিক্ষাপাত্র মেলে বসে থাকতে দেখেছিলাম বটে, তবে তারা দর্শকদের একেবারেই বিরক্ত কর্চ্ছিল না। আপনারা মনে মনে ভজন কর্চ্ছিল দর্শকগণ স্বেচ্ছায় যে যা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাই তারা প্রসন্ন মনে গ্রহণ কর্চ্ছিল।

শুন্‌লাম এখানে ভিক্ষা করা নিষেধ। এই রকম কোন প্রকার নিয়ম আমাদের হিন্দুতীর্থক্ষেত্রে মন্দিরে মন্দিরে করা হয় না কেন তাই ভাবি। কালিঘাট, মথুরা, বৃন্দাবন, জগন্নাথধাম, কাশী ইত্যাদি স্থানে যাত্রী এবং দর্শকগণের ভিখারীর উৎপাতে একেবারে পাগল হয়ে যেতে হয়।

অমৃতসহরের প্রসিদ্ধ মন্দির দেখে আমরা রণজিৎসিংএর সুপ্রসিদ্ধ বাগান "রামবাগের" দিকে চল্লাম। পথে বিখ্যাত জালিয়ানওয়ালাবাগ দেখে যাবার লোভ সাম্‌লাতে পার্লাম না আমরা। জালিয়ানওয়ালাবাগ দরবারসাহেবের মন্দির থেকে কয়েক মিনিটের পথ মাত্র।

বাগটী এখন কংগ্রেস কমিটি কিনে নিয়েছেন। একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের তত্ত্বাবধানে এটী এখন আছে।

আমরা দেখলাম বাগানের একদিকে একটী ছেলে জন কুড়ি ভলান্টিয়ারকে Drill শেখাচ্ছে! ছেলেটী পাঞ্জাবী বয়স খুব বেশী নয়। কিন্তু যাদের ড্রীল করান হচ্ছিল, তাদের কারুর বয়স ১২।১৩ বছর আবার কারুর বা তিরিশের কাছাকাছি বা তার চেয়েও বেশী।

জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগ্‌ দেখে আমরা "রামবাগ" দেখ্‌তে গেলাম। আগে এখানে শিখদের একটী অতি পুরাণো দুর্গ ছিল। রণজিৎসিংহ সে সব ভেঙ্গে সেই জায়গায় একটী সুন্দর বাগান তৈরী করেন। বাগানের ভেতর একটী চমৎকার প্রাসাদও তৈরী করা হয়। রাজপরিবারের রমণীগণ গ্রীষ্মের প্রখর তাপ থেকে অব্যহতি পাবার জন্য এখানকার সুশীতল ঘরগুলিতে আশ্রয় নিতেন।

এখন রণজিৎসিংহের আমলের ঘরবাড়ীগুলি, ক্লাব, লাইব্রেরী, সমিতি ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা হয়।

রামবাগ বাগানটী প্রকাণ্ড। এখনও তাহা সযত্নে রাখা হয়েছে, তবে তাতে অনেক স্থানেই আধুনিকতার ছাপ্‌ পড়েছে। পাঞ্জাবকেশরীর আমলে ইহা নিশ্চয়ই চমৎকার দেখ্‌তে ছিল। বাগানটী সবটা ঘুরে দেখে আমরা "গোবিন্দগড়" দুর্গে গেলাম।

এই দুর্গটিও রণজিৎসিংএর আমলের। 'অমৃতসহর' সহর এবং স্বর্ণমন্দিরটীকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা কর্ব্বার উদ্দেশ্যেই তিনি এটী নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। তবে সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকেই এটী ইংরেজের দখলে। বর্ত্তমানে এখানে তাঁদেরই Regiments আছে।

আমাদের এই দুর্গের ফটক অবধি যাওয়াই সার হোল—ভিতরে আর যাওয়া হোল না। আগে থেকে অনুমতি না নিয়ে রাখ্‌লে ভেতরে যেতে দেয় না। তখন আনিয়ে যাওয়া যেত, কিন্তু আমাদের হাতে বেশী সময় না থাকাতে আমরা আর তার চেষ্টা কর্‌লাম না।

ফোর্টের অনতিদূরেই একটী হিন্দুদের মন্দির আছে সেটীও আমরা দেখ্‌লাম।

অমৃতসহর কার্পেট ও শালের জন্য বিখ্যাত। অনেক Factory আছে এখানে। কাণপুর, ধারিয়াল এবং উত্তর ভারতবর্ষের আরও অন্যান্য জায়গা থেকে এখানে পশম আসে। এদের কার্পেট তৈরী কর্ব্বার প্রণালীটী নাকি একটী দেখবার জিনিষ। তাই আমরা সহর ছাড়বার আগে একটী কার্পেটের কারখানা দেখে যাব ভাবলাম।

গোবিন্দগড় ফোর্ট থেকে বার মাইল দূরে একটী বড় কারখানা আছে সেটী আমরা দেখ্‌তে গেলাম। অত কষ্ট করে যাওয়া সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের Factory দেখা হলো না, কারণ কারখানার কাজকর্ম্ম সেদিন সব বন্ধ ছিল। সেদিন যে রবিবার তা' আমাদের কাহারও খেয়াল ছিল না।

কারখানায় যাবার রাস্তাটী খুবই চমৎকার—বরাবর গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড্‌ চলে গিয়েছে।

পথে দ্রষ্টব্য আর বিশেষ কিছু নেই—তবে মাঝে প্রকাণ্ড একটী লাল ইঁটের বাড়ী সকলেরই চোখে পড়ে। সেটী হচ্ছে Khalsa College.

এই কলেজটী ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এখন ইহা সমগ্র পাঞ্জাবের মধ্যে একটী লব্ধপ্রতিষ্ঠ কলেজ। এই কলেজের সঙ্গে একটী Agricultural Farmও আছে।

অমৃতসহরে আর বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছু নেই যদিও সহরের ভেতর আরও কতকগুলি গুরদোয়ারা এবং বাগান আছে বলে শুনলাম। আমরা আর সেগুলি দেখতে পাইনি। কারণ তখনিই লাহোরে যাবার ট্রেন ধরবার জন্য ষ্টেশনে ফিরে এলাম।

দুই পথিক

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত।

জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর বেলা
দু'দিক দিয়ে এসে দু-জন পথিক;
গাছের তলায় পড়্‌লো ব'সে,
অবস্থাটা নেহাৎ বে-গতিক!
দুজনারই পেয়েছিল
এম্নি ক্ষিদে, এম্নি ধারা তেষ্টা,
ভাব্‌চে মনে—বিদেশ ভূঁয়ে,
পথের মাঝে, ম'রে যাবো শেষ্‌টা!
হঠাৎ তারা দেখ্‌লে চেয়ে,
একটি ছেলে নিয়ে যাচ্ছে কাঁটাল
কিন্‌লে সে-টা দুজন মিলে,
মস্তবটে, কিন্তু ছিল ফাটাল।
কাঁটালটারে ভেঙে নিয়ে,
প্রথম পথিক দ্বিতীয়রে শুধায়—
একেই বলে বিধির বিধান,
নতুবা যে মরে যেতুম ক্ষুধায়!
কাঁটালটা বেশ তোফা জিনিস্,
আপ্‌নি ওটা কেমন ভালোবাসেন?
দ্বিতীয় তার খাওয়া দেখে
অবাক্ হয়ে, মনে মনে হাসেন।
মুখে বলেন—ফলের রাজা,
গুণের কথা খুলে বলোবো কি তার;
আমার চেয়ে ও অধিক প্রিয়
ছিল ইহা, আমার মৃত পিতার।

তবে দেখছি পিতা আপ্‌নার
জীবিত নেই, আহা, একি বলেন !
কেমন করে, কি রোগেতে,
ক'দিন ভুগে, স্বর্গগত হলেন ?
এই না শুনে সুরু করলে
বোকাচন্দ্র দ্বিতীয় সে পথিক ;
আপন পিতার মরণ-কথা,
সকাতরে, আগাগোড়া, সঠিক।
এই ফাঁকেতে প্রথম পথিক
কাঁটালটারে ক'রে আন্‌লে সাবার !
দ্বিতীয় সে মনের ক্ষেদে
একেবারেই ভুলে গেছে খাবার !
হঠাৎ চেয়ে কাঁটাল পানে,
এতক্ষণে বুঝ্‌লে এতো ঠকায় !
নিজে খাচ্ছে আগাগোড়া,
ফন্দি করে মোরে দিয়ে বকায় !
আচ্ছা রোসো, বাকিটুকু
ফাঁকি দিয়ে, ক'র্ত্তেই হবে ভোজন।
তখন তুমি বুঝে নিবে,
তোমার চেয়ে কম নহে মোর ওজন !
শুধায় তারে—তোমার পিতা
কেমন করে দেহ রক্ষা করলেন ?
প্রথম পথিক বল্লে হেসে
"ঘরে এসে পড়্‌লেন কি আর মর্‌লেন !"
একটি কথায় প্রথম পথিক
কৌশলেতে সারা করে উত্তোর
বাকিটুকু খেয়ে বলে—
নেই যে কিছু, ফুরিয়ে গেলো ? দুত্তোর !

সাহিত্যে নোবেল্ প্রাইজ্

অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

'নোবেল্ পুরস্কার' আজ সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠ সম্মান বলে পরিগণিত। সুইডেনের 'আল্‌ফ্রেড্ নোবেল' তাঁ'র মৃত্যুকালে এই পুরস্কারের জন্যে একটা মোটা রকমের সম্পত্তি রেখে যান্; তা' থেকে প্রতি বছর 'সাহিত্য', 'পদার্থ বিদ্যা' 'রসায়ন শাস্ত্র,' 'চিকিৎসা বিদ্যা' এবং 'জগতে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা'—এই পাঁচটি বিষয়ে যোগ্যতম পাঁচজনকে—প্রায় এক লাখ বিশ হাজার টাকা ক'রে পুরস্কার দেওয়া হয়।

'আল্‌ফ্রেড্ নোবেল' নিজে ছিলেন বৈজ্ঞানিক। 'ডিনামাইট' আবিস্কার ক'রেই তিনি স্থায়ী কীর্ত্তি অর্জ্জন করেছিলেন; 'নোবেল্ পুরস্কার তাঁকে চিরস্মরণীয় ক'রেছে।

দেশ বিদেশের অনেক সাহিত্যিকই এ পুরস্কার পেয়ে সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করেছেন। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে সবাই এ পুরস্কার অবশ্য পান্‌নি, কিন্তু সম্ভবতঃ লেখকদের নূতন ভঙ্গিমা ও বৈশিষ্টের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে এ পুরস্কার এ পর্য্যন্ত দেওয়া হ'য়েছে। সাহিত্যিকদের যোগ্যতার বিচার করেন 'সুইডিশ্ একাডেমী' নামক বিদ্বৎসম্প্রদায়।

নর্‌ওয়ের 'বিয়র্ণ্‌সন্' এবং 'ন্যুট্ হাম্‌সন্' এ পুরস্কার পেয়েছেন,—কিন্তু ঐদেশেরই 'ইব্‌সেন্' এবং 'বোয়ের', পৃথিবী-বিখ্যাত সাহিত্যিক হয়েও পান্‌নি। বেল্‌জিয়মের কবি-নাট্যকার মেটারলিঙ্ক্ তাঁর 'নীল-পাখী' নামক নাটকের জন্য নোবেল্ পুরস্কার পেয়েছিলেন। ইংলণ্ডের কবি ও ঔপন্যাসিক 'রাডিয়ার্ড কীপ্লিং', আয়ার্ল্যাণ্ডের কবি-নাট্যকার 'ইয়েট্‌স্' ও সুবিখ্যাত নাট্যকার 'বার্ণাড্ শ' এ পুরস্কার লাভ করেছেন। সুইডেনের মহিলা-ঔপন্যাসিক 'সেল্‌মা লেগারলফ্' ও ইটালীর উপন্যাস লেখিকা 'গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা' ও 'সিগ্রিড্ আণ্ডসেট' এই পুরস্কার পেয়ে মহিলাকুলের সম্মান রক্ষা করেছেন। আমাদের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদের জন্য পুরস্কার প্রাপ্তির খবর সবাই জানে। সম্প্রতি পদার্থবিদ্যায় আবিস্কারের জন্য শ্রীযুক্ত রমণ এই পুরস্কার পেয়ে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। ফরাসী দেশের সুবিখ্যাত লেখক 'রমাঁ রলাঁ পেয়েছিলেন তাঁর 'জোঁক্রিস্তফ্' উপন্যাসের জন্য আর আনাতোল্ ফ্রাঁস তাঁর 'সিলভেষ্টার্ বণার্ডের অপরাধ' এর জন্য।

পোলাণ্ডের 'রেমণ্ট্' পেয়েছেন 'চাষী' নামক প্রকাণ্ড উপন্যাস লিখে। ঐদেশেরই 'সিঙ্কেভিচ্' পেয়েছিলেন 'কোথায় চলেছ ?' (Quo Vadis) বইয়ের জন্যে। 'জিযেলেরুপ্' ও'নৃটপ্পিডান্' পেয়েছিলেন একখানা ইতিহাসের উৎকৃষ্ট বই লিখে ও স্পেনের নাট্যকার 'জেসিন্তো বেনাভান্তে' পেয়েছিলেন তাঁর নাটকের জন্য।

আমেরিকা এবার এই প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়ে গৌরব অর্জ্জন কর্‌ল। সে দেশের 'সিন্‌ক্লেয়ার লুইস্' এবার পেয়েছেন তাঁর রচিত 'ব্যাবিট্‌স্' উপন্যাসের জন্য।

নরওয়ের 'বোয়ের' ইংলণ্ডের পরলোকগত 'টমাস্ হার্ডি', রুশিয়ার 'আন্‌দ্রীভ্, জাপানের 'নোগুচি,' বাংলার শরৎচন্দ্র প্রভৃতি এ পুরস্কার পান্‌নি, কিন্তু পৃথিবী তাঁদের পুরস্কার পাবার অযোগ্য ব'লে মনে করে না। তাঁরা সকলেই সাহিত্য রসিকদের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছেন।

ভবিষ্যতে আরও কত লেখক এই গুণের সমাদর লাভ করে উৎসাহিত হবেন ; বিদ্বৎসমাজ নোবেল্‌কে কৃতজ্ঞতা জানাবেন, একদেশের সুসাহিত্যিক সকল দেশের দৃষ্টি-আকর্ষণ কর্‌বেন, এবং ভাবের ক্ষেত্রে দুনিয়ার মিলন সত্য ও সার্থক হয়ে উঠতে থাকবে !
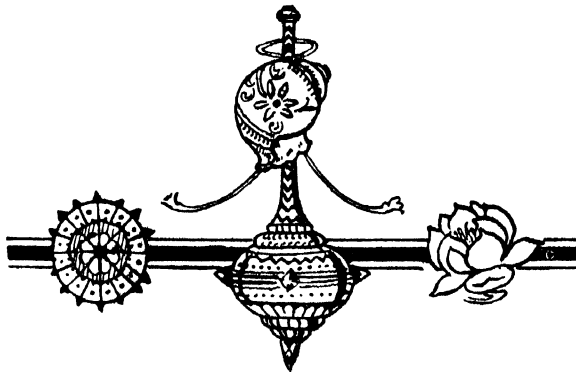
ভূতের ভয়

শ্রীকমলবাসিনী দেবী।

ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠে কেন জানিনা, বিমলার সঙ্গে ভাবের মাত্রটী আমার যেন একটু বেড়ে গেল। সে ছিল যেমন দুরন্ত তেমনি হাসিখুশী। সমস্ত দিন তার হাসি ও দুষ্টুমিতে সারা বোর্ডিংটী সরগরম হোয়ে থাক্‌ত। কিন্তু সন্ধ্যের পরেই তার সমস্ত হাসি ঠাট্টা এক্কেবারে চুপ্‌সে যেত—তার কারণ সে বেচারীর ছিল বড্ড ভূতের ভয়। বাগানের গাছে, বারান্দায়, ঘরের মধ্যে আলমারীগুলোর পেছনে, রাজ্যের ভূত যে তারি দিকে ওৎ পেতে আছে এ সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তার এই ভয়ের জন্য বোর্ডিং শুদ্ধ মেয়েরা তো তাকে ঠাট্টা করতই, তা ছাড়া শিক্ষয়িত্রীদের কাছ থেকেও তাকে কম ধমক খেতে হোতো না। এক একদিন আমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাকে এত বক্‌তেন যে, তা শুনে ভূতগুলোও হয়তো পালিয়ে যেতো, কিন্তু বিমলার ভূতের ভয় যেতো না।

বিমলার অবস্থা দেখে তার ওপর আমার ভারি মায়া হোতো। আমার কাছ থেকে সহানুভূতি পেয়ে সে একেবারে আমাকে পেয়ে বস্‌ল। রাত্রি হোলেই সে আর আমার সঙ্গ ছাড়্‌ত না। গায়ে গায়ে জড়িয়ে থাক্‌ত।

ব্যায়ামের মত ভয় জিনিসটাও ভয়ানক সংক্রামক। বিমলার সঙ্গে থেকে থেকে, আমারও একটু একটু কোরে ভূতের ভয় সুরু হোলো। অন্ধকার ঘরে ঢুকলেই মনে হতো, কা'রা যেন খাটের নীচে লুকিয়ে বসে আছে। অন্ধকারে এঘর থেকে ওঘরে যাবার সময় মনে হোতো কে যেন আমার পেছনে, পেছনে আস্‌ছে। পেছন ফিরে যে একবার চেয়ে দেখ্‌ব সে সাহসও হোতো না। মনে হোতো পেছন ফিরলেই হয়তো দেখ্‌তে পাবো, প্রকাণ্ড একটা বিকট চেহারা তার আগুণের গোলার মত দুটো জলন্ত চোখ দিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। তার দিকে চেয়ে দেখলেই হয়তো সে আমায় তার প্রকাণ্ড দুটো হাত দিয়ে ধরে টপ্‌ কোরে গিলে ফেল্‌বে।

একজনের ভয়ের জ্বালায়ই বোর্ডিংয়ের মেয়ে শিক্ষয়িত্রী সবাই ব্যতিব্যস্ত হোয়ে পড়েছিলেন, এবার দুজনের ভয় একেবারে সোণায় সোহাগা হোয়ে দাঁড়ালো। এতদিন ধরে ভয়ের জন্য শুধু বিমলাই একা বকুনী খেতো। এবার তার এই বকুনী খাওয়রো একজন ভাগিদার জোটাতে তার বকুনী খাওয়ার দুঃখটাও অনেকখানি লাঘব হোয়ে গেল।

মানুষের স্বভাবই এই যে যে দুঃখটী তাকে একা বহন করতে হয় সেটী তার বড্ড লাগে। কিন্তু সেই দুঃখের একজন ভাগিদার যদি থাকে তাহলে দুঃখের বোঝাটী অনেকখানি হাল্‌কা হয়ে যায়। বিমলা অনেকটা শান্তি পেলো। কারণ আমরা দুজন হওয়াতে শিক্ষয়িত্রীদের তিরস্কার ও মেয়েদের বিদ্রূপ তাকে আর তত বেশী কাতর করতে পারতো না।

আমরা ম্যাট্রিক ক্লাসের মেয়েরা থাকতাম তেতলায়। আমাদের বোর্ডিংয়ের জন্য নতুন বাড়ী তৈরী হচ্ছিল। এবাড়ীতে আমাদের বড্ড স্থানাভাব হোতো, সেজন্য তেতালায় এ ঘর থেকে ও ঘরে যাবার একটী ঢাকাবারাণ্ডায় দরজা, জানলা বসিয়ে সেটীকে একটী ঘরের মত করা হয়েছিল। কর্ত্তৃপক্ষেরা আমার শোবার ব্যবস্থা সেই ঘরেই করে দিয়ে ছিলেন। এবং আমাদের দয়াবতী মেমসাহেব প্রায়ই এসে আমায় এই কথা শুনিয়ে যেতেন যে, আমার কি সৌভাগ্য, আমি একলা একেবারে একটী আলাদা ঘর পেয়েছি। আমিও আমার এই দুর্ল্ভ সৌভাগ্যে এতদিন গর্ব্বই অনুভব করতাম, এবং আমার সেই ছোট্ট ঘরটীকে মনের মত করে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে, এতদিন ধরে মনের আনন্দেই সেখানে বসবাস করছিলাম। কিন্তু এই ভয় জিনিসটী মনের মধ্যে ঢোকার পর থেকেই ছোট্ট ঘরটী যেন আমার কাছে একটী ভূতের আড্ডা হোয়ে দাঁড়ালো। রাত্রে শোবার সময় মনে হোতো যে, আমায় একলাটী পেয়ে সব ভূতগুলো যেন পরামর্শ করে এই ঘরেই এসে আড্ডা জমিয়েছে আমাকে ভয় দেখাবার জন্য। মাঝে মাঝে মনে হোতো মেম সাহেবকে বলি—ধর্ম্মাবতার আমাদের ইস্কুল ও বোর্ডিংয়ের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা, অন্যান্য মেয়েদের ঘরে আমার জন্য একটু শোবার স্থান কোরে দিয়ে আপনার এ অনুগ্রহ থেকে আমায় মুক্তি দিন। তাহলে দুহাত তুলে আপনাকে আশীর্ব্বাদ করবো।

রাত্রে ঘরের মধ্যে একটী বেরাল লাফালে, কিম্বা কোন রকম খুট্‌খাট্ আওয়াজ হোলেই বিমলা, তড়াক্ কোরে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে একেবারে অন্য মেয়েদের খাটের ওপর গিয়ে হাজির হোতো। এবার থেকে দুজনে মিলে ঐরকম করতে সুরু ক'রলাম। এক রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব দোসর। মেয়েরা তো আমাদের দুজনের কাণ্ডকারখানা দেখে একেবারে অগ্নিমুর্ত্তি হোয়ে উঠতো; এবং রোজই রাত্রে আমাদের দুজনকে শাসিয়ে রাখতো যে সকাল হোক্, তারপর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলে আমাদের লজ্জা দেয়াবে। হয় তিনি আমাদের দুজনের শোবার ব্যবস্থা একেবারে আলাদা কোরে দিন, যাতে তাদের সঙ্গে আর আমাদের কোনও রকম সম্বন্ধ না থাকে শোবার সময়। তা না হোলে তারা কালই সবাই বোর্ডিং ছেড়ে চলে যাবে। প্রায় প্রত্যেকদিন রাত্রেই তারা এইরকম প্রতিজ্ঞা করতো। কিন্তু বড়ই সুখের বিষয়, যে ভোর হতেই আমাদের স্নেহপ্রবণ

স্নানান্তে

শিল্পী—পি. মল্লিক মহাশয়ের সৌজন্যে

বান্ধবীরা তা'দের ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা হয় একেবারে ভুলেই যেতো, তা না হোলে আমাদের ঐরকম বকুনী খাওয়ার উপর আবার আমাদের ঘাড়ে দ্বিগুণ কোরে বকুনীর বোঝা চাপাতে তাদেরও বোধ হয় মায়া হোতো। তাদের এই অনুগ্রহের জন্য আজও আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

একদিন সন্ধ্যের সময় আমি ও বিমলা বাগানের মধ্যে দিয়ে পড়বার ঘরের দিকে যাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ কাছেই ফোঁস করে একটা শব্দ হোলো। আর যায় কোথা, হ্যারিকেন ফেলে দিয়ে দুজনে উঠি কি পড়ি করে দে ছুট্। মেট্রন দাঁড়িছিলেন বারান্দায়। দুজনে ছুট্তে ছুট্তে একেবারে হুড়্মুড়্ করে এসে তাঁর ঘাড়ের ওপর পড়্লাম। তিনি তো পড়্তে পড়্তে কোন প্রকারে সাম্লে গেলেন। তারপর আমাদের ওপর সে কি বকুনির পুষ্পবৃষ্টি। এইসব ছুটো পাটিতে ও মেট্রনের গলার আওয়াজ পেয়ে মেয়েরা ও শিক্ষয়িত্রীরাও সেখানে এসে হাজির হলেন। বকুনির মাত্রাটিও একেবারে সপ্তমে চড়ে গেল। আমাদের তো লজ্জায় মনে হোতে লাগ্ল —হে ধরণী দ্বিধা হও তোমার মধ্যে প্রবেশ করে আমরা আমাদের এ লজ্জা নিবারণ করি। বকুনীর হিড়িক্টা একটু থামলে, তবে আমাদের ভয় পাওয়ার কারণটী জিজ্ঞেস করা হোল। কারণটি বলতেই মেট্রন বল্লেন—চল আমার সঙ্গে। এই বলে তিনি আমাদের দুজনকে টান্তে টান্তে বাগানের যেখানটায় আমরা শব্দ শুন্তে পেয়েছিলাম সেই দিকটায় নিয়ে গেলেম। মেয়ের দলও পেছন পেছন চল্লো। সেই জায়গায় পৌঁছে হ্যারিকেনের আলোয় দেখা গেল যে একটা কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে মনের আনন্দে সেখানে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। তখন কুকুরটার উপর এমন রাগ হোলো, মনে হোলো দুই লাঠির ঘায় ওটার মাথা একেবারে গুঁড়ো করে দি। মনে হ'তে লাগ্ল নিশ্চয়ই ও কোন রকমে জান্তে পেরেছে যে আমরা খুব ভীতু সেইজন্য আমাদের ভয় দেখাবার জন্যই ও ঐ সময়টীতে ঐরকম ভাবে নিঃশ্বাসটা ফেলেচে। মেয়েরা তো কুকুরটাকে দেখে রাগ ভুলে গিয়ে এবার হাস্তে আরম্ভ করে দিলো। তাদের রাগটা তবু সহ্য কর্তে পারা গিয়েছিল, কিন্তু তাদের এই বিদ্রূপের হাসি যেন অসহ্য বোধ হতে লাগ্লো। কুকুরটাকে দেখ্তে পাওয়ার পরও আমাদের একচোট বকুনী খেতে হোলো। এবং ভয় পাওয়াটা যে শুধু দোষই নয়, অত্যন্ত পাপও, সে কথাও তাঁরা আমাদের বার বার শুনিয়ে দিলেন।

সেদিন সমস্ত মেয়ে, কি শিক্ষয়িত্রী এমন কি ঝিয়েদের সাম্নে পর্য্যন্ত আমরা যে রকম ভাবে অপদস্থ হয়ে ছিলাম, সে রকম অপদস্থ এরপূর্ব্বে আর কখনও হইনি। সেজন্য এ অপমান আমরা সহজে হজম কর্তে পারলাম না! সেই দিনই আমরা

দুজনে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, যেমন করেই হোক্ এ অপমানের প্রতিশোধ নিতেই হবে।

প্রথমেই তো বলেছি বিমলার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি যোগাতে বিশেষ দেরী হোতো না ঠিক ভূতের ভয়ের মতই। সে তার পর দিনই একটা মতলব ঠিক করে ফেলে চুপি চুপি সেটা আমায় বল্লে। শুনে তো দুজনে হেসেই খুন, সেইদিনই সন্ধ্যের সময় আমাদের মতলব অনুযায়ী কাজ করা যাবে ঠিক হোয়ে গেল।

সন্ধ্যের সময় ছুতো করে আমরা দুজনে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে শুতে যাবার অনুমতি চাইতে গেলাম। তিনি তো প্রথমে দুজনকে একসঙ্গে কিছুতেই ছুটী দিতে চান না, শেষে অনেক করে তাঁকে রাজী করানো গেল। আমরা শুতে যাবার নাম্ করে বড় শোবার হলঘরটায় এসে হাজির হলাম। মেয়েরা এখন সবাই পড়বার ঘরে পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত। আটটার সময় খাবার ঘণ্টা পড়বার আগে কেউ আর এদিকে আস্‌বে না। আমরা নিশ্চিন্ত মনে আমাদের কাজ সুরু কোরে দিলাম।

বিমলার মতলব মত একটা মশারী খাটাবার ডাণ্ডা নিয়ে এসে, তাতে বালিশ পাশবালিশ বেঁধে তারপর সেটাকে কাপড় চোপড় পরিয়ে দিব্যি একটা সাত আট হাত লম্বা মানুষের মূর্ত্তিতে খাড়া কোরে দেওয়া গেল। কাগজে একটা বিকট মুখের আকার এঁকে রাখা গিয়েছিল সেটাকে একটা ঘরের মাঝখানে একটা থাম ছিল তারই গায়ে ঠেস্ দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তার দিকে চাইতে আমাদের দুজনেরই গা ছম্ ছম্ কর্‌তে লাগ্‌লো, অন্যে যে ভয় পাবে এ আর বেশী কথা কি।

এই ব্যাপার কোরে, দুজনে পা টিপে টিপে তেতালায় গিয়ে নিজেদের বিছানায় শুয়ে রইলাম।

আটটার সময় খাবার ঘণ্টা প'ড়লো। তারপরই বিকট চীৎকার ও দুম্‌দাম আওয়াজ। আমরা দুজনে তো কোন প্রকারে হাসি চেপে নীচে নেমে এলাম। এসে যা দেখ্‌লাম তাতে একেবারে চক্ষুস্থির। দেখি দু'তিনজন মেয়ে ভয়ে একেবারে অজ্ঞান হোয়ে গেছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, দরোয়ান, দরোয়ান ক'রে, ভীষণ চীৎকার জুড়ে দিয়েছেন। অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীদের মুখ ভয়ে শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। আর আমাদের মেট্রন যিনি মহিষমর্দ্দিনীরূপে কাল আমাদের কর্ণচ্ছেদন করতে গিয়েছিলেন, আজ দেখি তিনি ভয়ে চুপ্‌সে এতটুকু হোয়ে একটি দরজার কোণে দাঁড়িয়ে আছেন। একবার মনে হোলো তাঁ'কে বলি যে হে দৈত্যদলনী কাল তো বেশ বীরদর্পে এই দুটো নিরীহ ভীতু মেয়ের কান ধরে টেনে ছিড়্‌বার যোগাড় করেছিলেন, আজ একবার সেইরকম বীরদর্পে ঐ দৈত্যটির কান ধোরে এক টান্ মারুন না? কিন্তু ভয়ে চুপ্ করে গেলুম্। পাছে আমাদের কু-কীর্ত্তি

ধরা প'ড়ে যায়। আমাদের বন্ধুক'টীর এবং অন্যান্য মেয়েদের যা অবস্থা হয়েছিল তা আর এখানে প্রকাশ করবো না। কারণ তা'দের কাছ থেকে ভয়ের জন্য বকুনী খাওয়া সত্ত্বেও তা'রা অনেক সময় আমাদের অনেক উপকার করেছে। এদের সবাইয়ের ভয় দেখে মনে হোলো যে আমরা সবাই এক গোয়ালের গরু। সকলেই মাছ খান; ধরা পড়ে শুধু মাছরাঙা। গলা ফাটিয়ে ডাকাডাকির চোটে দরোয়ান মালি সবাই এই এই মোটা মোটা লাঠি হাতে করে এসে হাজির হোলো। তা'রাও মূর্ত্তিটিকে দেখেই মিনিটখানেক থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌লো। তারপর দরোয়ান সাহসে ভর কোরে মূর্ত্তিটার কাছ থেকে প্রায় সাত হাত দূরে দাঁড়িয়ে তার সেই বারহাত লম্বা লাঠিটা দিয়ে মারলো মূর্ত্তিটার গায়ে এক খোঁচা। মূর্ত্তিটা ধপাস্‌ কোরে মাটীতে প'ড়ে যেতেই সেটার কাপড় চোপড় সব সরে গিয়ে বেরিয়ে প'ড়লো বালিশ পাশবালিশ ও মশারি খাটাবার ডাণ্ডাটী। তখন দরোয়ান, মালী ও ঝিয়েরা সবাই হাসতে হাসতে সেটার কাছে গিয়ে বালিস, পাশবালিসগুলো সব খুলে ফেল্লো। পড়ে রইলো শুধু কঙ্কালসার মশারি খাটাবার ডাণ্ডাটী! মনে হোলো সেটা যেন সকলের মুখের দিকে চেয়ে দাঁত বের কোরে হাস্‌ছে।

দরোয়ান হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে—এসব বাবাদের কাজ। ভয় দেখাবার জন্য এই রকম করেছেন। সকলের মুখেই হাসি ফুটে উঠ্‌লো। এবার শিক্ষয়িত্রী ও মেয়েদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল যে, কে একাজ করেছে। এবং যে একাজ করেছে তাকে ভয়ানক শাস্তি দেওয়া হবে। আর শিক্ষয়িত্রীদের কাছ থেকে অনেকখানি লেকচারও শুন্‌তে হোলো যে এরকমভাবে ভয় দেখান অত্যন্ত অন্যায়। কয়েকজন মেয়ে আমাদের ছুটি নেওয়া দেখে আমাদের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছিল, কিন্তু ব্যাপারটি একেবারে উল্টো হয়ে গেল। অন্যান্য মেয়েরা এবং শিক্ষয়িত্রীরা বল্লেন যে আমাদের দুইজনকেই ভয় দেখাবার জন্য অন্য কোনও মেয়ে এই কাণ্ডটি করেছে। তারপর একথাও তাঁরা এখন বলতে ভুল্‌লেন না যে যারা ভীতু মানুষ তাদের বেশী করে ভয় দেখানো ভয়ানক অন্যায়। যাক্‌ এতদিন পরে আমাদের দয়াময়ী শিক্ষয়িত্রীদের মুখ থেকে তবু একটা সহানুভূতির কথা শুন্‌তে পাওয়া গেল। এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। নিজেরা ঠকে শিখলে সকলের মুখ দিয়েই বোধ হয় ঐ রকম সহানুভূতির কথা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে।

থাক্‌ আমাদের স্বভাবটা সর্ব্বকালে নিন্দনীয় হোলেও, এখানে একেবারে শাপে বর হোয়ে গেল। শাস্তির হাত থেকে আমরা রেহাই পেয়ে গেলাম।

বিমলাকে নিয়ে কিন্তু মাস খানেক ধরে আমার বড় মুস্কিল গেছে, তার হাসি থামাতে। কারণ যখনই সেই কথাটা তার মনে পড়তো তখনই বারুদের স্তূপে আগুন লাগার মত তার হাসি ফেটে বেরিয়ে পড়্‌তো। তবে তার হাসিই ঐ রকম

জেনে মেয়েরা কিম্বা শিক্ষয়িত্রীরা কেউ কোন রকম সন্দেহ করতেন না তাকে এই রক্ষে।

তারপর থেকে ভয়ের কথা নিয়ে আমাদের আর কেউ কখনও ঠাট্টা করতেন না। আর মজা এই যে সেই সময় থেকে আমাদের ভয়টাও ক্রমশঃ কমে আস্‌তে লাগ্‌লো। যার যেটার ওপর বেশী ঝোক তার সেইটার ওপর বেশী চাপ দিলে সেটা বোধ হয় বেড়েই যায় কমে না। মানুষের দোষ ক্রটীকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখ্‌লে সেটা বোধ হয় তার সেরেই যায়। আমাদের বেলায়ও হয়তো তাই হোলো।

যে অপরাধ সেদিন গুটীকয়েক মেয়ে ও শিক্ষয়িত্রীদের সাম্‌নে স্বীকার করিনি, আজ সর্ব্বসমক্ষে সেই অপরাধ স্বীকার কর্‌ছি। এবং এই অপরাধের জন্য যে শাস্তি তাঁরা দেবেন আমি তা' মাথা পেতে নিতে রাজি আছি। কারণ জানি এখন আমি শাস্তি নেবার অতীত।
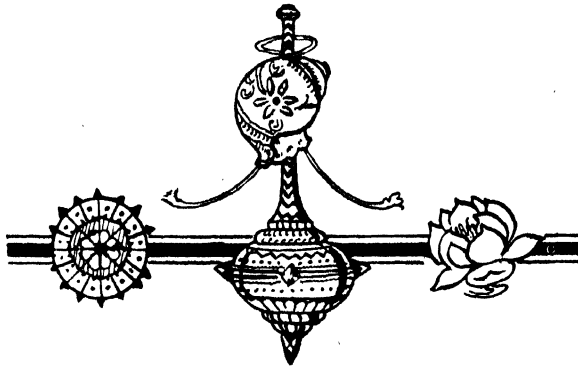
ভাইফোঁটা

শ্রীহাসিরাশি দেবী

বহুদিন পরে বাক্স খুলিয়া পাইনু পুরান পত্র,
হেরি' আন্‌মনে কত ভুলে ভরা আঁকা বাঁকা প্রতি ছত্র।
গ্রামের নামটি বিনা, কোন সাল তারিখও তো লেখা নাই
আর লেখা আছে শুধু"কালো! কবে হেথায় ফিরিবে ভাই?
মামার বাড়ীতে চলে গেলে তুমি আমার উপরে রাগি,
কিন্তু বলতো দোষকার বেশী? আর কেবা তার ভাগি!
আমি মেরেছিনু তোমায় বেশী—কি তুমি ছিঁড়ে দিলে চুল,—
ভেবে দেখিলে না কার দোষ বেশী, কে বেশী করিল ভুল?
যাই হোক্ ভাই,—ক্ষমা চাই; তুমি রাগ করোনাকো আর।
কবে চিঠি পাব? দিন ও সময় ঠিক ক'রো আসিবার।
লিখেছিনু বুঝি এই অবধিই; অভিমানে তারপরে—
পাঠাইনি আর; ফেলে রেখেছিনু বড় অভিমান ভরে।
আজিকে খুলিতে জীর্ণ কাঠের বন্ধ বাক্সটিরে—
সহসা আমার হারান দিনের স্মৃতিটি আসিল ফিরে।
কোথায় ছিলাম কোথা আসিয়াছি—ভাবিতে হৃদয় মাঝে
অতীতের শত স্মৃতি দেয় হানা,—ভুলে যাওয়া সুর বাজে।
হয়তো এখনো বাকী এ জীবনে কতদূরে যেতে হবে
পুনঃ আজিকার সুরটি ঢাকিবে কর্ম্মের কলরবে।
তবু মাঝে মাঝে এমনি করিয়া সহসা পড়িবে মনে
কোথায় কেটেছে বাল-কৈশোর,—সে কোন্ গৃহের কোণে!
আজিও যেমন পুরান চিঠিটি বেদনা জাগাল চিতে,
এমনি সেদিন ছোট কত কি যে জীবন দেউলটিতে
প্রদীপ ধরিয়া দেখায়ে যাইবে কত ছবি কত লেখা,
কর্ম্ম ক্লান্ত জীবনে পাইব পুনঃ তাহাদের দেখা।

এমনি করিয়া হয়তো জীবন-দেউল ভাঙ্গিবে যবে
আমারও স্মৃতিটি ডুবে যাবে ধীরে কর্ম্মের কলরবে।

* * * * * *

সেদিনের কথা আজও মনে আছে, পাশের বাড়ীর কালো,—
দুষ্টুর সেরা বলিয়া তাহারে লাগিত যে বড় ভালো।
হলেই বা মেয়ে; কিন্তু অনেক ছেলের চাইতে দড়
ছিল বুদ্ধিতে; সাঁতারে,—দৌড়ে,—কলহে নিপুনা বড়
বৃক্ষারোহণে হার মানি সবে,—এতই ক্ষমতা যার,—
কে ছিল এমন মেয়ে কিবা ছেলে,—সখ্য মানেনা তার!
গায়ের বর্ণ ঘনকালো,—তাও হাড়গুলি গোনা যায়,—
কেহ ডাকে তারে কালামুখি! কেহ পোড়ামুখি কহে তায়।
এমনিই কতশত নাম শুনি, সব নাহি মনে পড়ে,—
শুধু মনে আছে লাগিত কলহ তারই সনে প্রতি ঘরে।
এমনি করিয়া সাগর গ্রামেতে কাটায়ে বছর দশ—
একদা শুনিনু মোদের খেলার লাগিয়া নাকি কু—যশ্
গাহে গ্রামবাসী; আরও যে, শুনিনু মোদের খেলার তরে,—
আসিবেনা আর কালো কোনও দিন তেমনি হর্ষ ভরে।
শীঘ্রই তার হবে নাকি বিয়ে, বাহিরে যাইতে মানা,—
বিমাতার তার বেড়েছে শাসন এও হ'য়ে গেল জানা।
বেদনা বাজিল অন্তরে; আহা! যে ছিল খেলার সাথী,
কঠিন প্রাচীরে অবোরোধ মাঝে কাটে তার দিবারাতি।
দুই একদিন জানালার পাশে ডেকে ডেকে ফিরে ফিরে—
একদা জবাব পাইনু কালোর—"টুনুদা! যারে—যা—ফিরে।
আর যা'বনাক খেলিতে সাঁতার—করিবনা মারামারী—
খেলার সঙ্গে তোদেরও যে ভাই এসেছি এবার ছাড়ি।
রুদ্ধকণ্ঠে সহসা পালালো করতলে মুখ ঢাকি,—
চমকি ভাবিনু—এই কি সে কালো? ছল ছল দুটি আঁখি!
দলে ফিরে এনু; কহিনু সবারে—"ছেড়ে দিয়ে ছেলে খেলা
আমরাও সবে কালোর মতই গৃহে কাটাইব বেলা।

পড়া ও লেখায় দিব মনোযোগ ; যে বলে বকাটে ছেলে
এবার দেখিব শুধু হাতে নয়, রীতিমত লাঠী খেলে।
নাইবা থাকিল কালো এই দলে,—দেখিবে বসিয়া ঘরে,
আমরাও আর খেলিনাক খেলা, পড়ি আনন্দ ভরে—
সে শুধু হয়নি ভালো মেয়ে আর আমরা বকাটে দল।"
তবু মনে পড়ে খেলার সময়,—চিত হয় চঞ্চল ;
পুকুরের পাড় আম ছায়াতল দেয় মোরে হাতছানি—
একবার ভাবি—ছুটে যাই হোথা,—আবার নিষেধ মানি।
শস্যশূন্য মাঠে চরে গাভী, রাখাল বাজায় বাঁশী
গগনের তলে—নদী-নীল-জলে সে সুর বেড়ায় ভাসি।
রায়পুকুরেতে ফোটে পঙ্কজ, ঘন ঘেঁটুবন-তীরে—
ফনিমনসার ঝোপের ছায়ায় মাছরাঙ্গা বসে কিরে !
কোন গাছে কোন পাখীর ছানাটি কাঁদিয়া উঠিল বুঝি ?
অবাধ্যমন—মানেনা শাসন, বেড়ায় তাদের খুঁজি।
এমনি করিয়া কেটে যায় দিন মন নাহি বসে পাঠে
ঘুরে শুধু মন পুকুরের জলে, গাছে গাছে, মাঠে মাঠে।
একদা প্রভাতে পাশের বাড়ীতে বাজিয়া উঠিল ঢোল,
তার সনে কাঁশী সানাই, আর যে উঠিল গণ্ডগোল।
আরও শুনিনু বিবাহ কালোর,—তারই তরে আয়োজন
হইয়াছে এতো ; আবার গ্রামের সবারই নিমন্ত্রণ।
বিবাহের শেষে চ'লে গেল কালো তারই পরদিন প্রাতে ;
মোরাও ফিরিনু আর আমাদের সকল সাথীর সাথে।
তারপরে ক'টা বছর কাটায়ে সাগর গ্রামের কোলে,—
শিক্ষার লাগি বাবার আদেশে বিদেশে আইনু চলে।
থাকিয়া মেসের একটি কক্ষে পড়া করি দিবা নিশি,
নাহি মোর কেহ "রুম মেট" আর করিও না মেশামিশি।
এপাশে থাকেন পাঁচজন বাবু ওপাশে থাকেন ছুটি,—
পাঁচের ঘরেতে রাত্রে হল্লা, দিনের বেলায় ছুটি।
দশটা পাঁচটা অফিস সারিয়া বহিয়া ক্লান্ত দেহ,—
স্নানাহার সারি স্হজে প্রোগ্রাম রাত কাটাবার কেহ।

রোজ তাস্ খেলা,—আর চলে গান একটা অবধি প্রায়,
তারপরে কেহ করেন শয়ন কেহবা কোথাও যায়।
খাবার সময় দেখা শোনা হয় বেশী কথা নাহি কই,—
তবু ইহাদের তামাসা বুঝিয়া নীরবে সহিয়া রই।
কলেজের তাড়া দশটায় যাই ফিরে আসি বেলা শেষে,
প্রতিদিন মনে পড়ে মোর সেই দূর দূরান্ত দেশে।
ক্লান্ত নয়ন মুদিয়া ভাবি যে গৃহের ঠিকানা মোর,—
মনে মনে বলি,'মাগো' কোথা তুই ? কোথা রহে ছেলে তোর ?
বেলা শেষে আজও ভাবিস কি বসি টুনু বুঝি খায় নাই ?
খোকা ও খুকুরে ভুলাস্ কি বলি—আসে তোর দাদাভাই ?
খেলিতে খেলিতে মোর নামে তারা ডাকে কি মা মাঝেমাঝে ?
মোর শাসনের ভয় কি তাদের দেখাও মা প্রতি সাঁঝে ?
মাঝে মাঝে দিয়া দেশের খবর সাথী কেহ দেয় চিঠি ;
পড়িতে তাহারে বড় বেদনায় আঁধার হয় যে দিঠি।
সেবার পূজার লম্বা ছুটিতে মেসের কুঠরী ছাড়ি,
বাক্স-বিছানা বহিয়া যতনে চলিয়া আইনু বাড়ী।
হেরিনু মায়েরে বাপেরে যে আর ছোট ছোট বোন ভাই,
আর হেরিলাম—গ্রামের পুরান সে দিন তো আর নাই।
সাজায়েছে গৃহ অঙ্গন সবে, কাটিয়াছে ঝোপ ঝাড়,
নাই বসি' লয়ে বংশাবলীরে ফেনি মনসারা আর।
আশ্ শেওড়ারা বিদায় ল'ভেছে পথের দুপাশ থেকে,
রাঙা পথখানি দূরান্তরেতে মিশিয়াছে এঁকে বেঁকে।
ভাদর বাদরে কলমী ডুবেছে পুকুরের জল মাঝে,
চারিদিকে বুঝি মঙ্গল লাগি বোধনের শাঁখ বাজে।
ঘাটে যেতে পথে হেরিনু—দাঁড়ায়ে ওদের দুয়ারে কালো,
বহুদিন পরে দেখা হ'তে কহে—"টুনুদা ! আছ তো ভালো ?"
পদধূলি ল'য়ে কহিল বিনয়ে "দৈবে এসেছি তাই,
বহুকাল পরে তোমাদের সনে দেখা যে হইল ভাই !"
ক্রোড়ে হেরি তার ক্ষুদ্র শিশুটী নিজ অঙ্গুলি চুশি',
মোর পানে চেয়ে হেসে হয় সারা জানায় সে বড় খুসি।

কিছুদিন আগে জননীর কাছে শুনেছিনু কথা তার,
স্বামী নাকি তার চরিত্রহীন, মাতাল নিঠুর আর
প্রহারে কালোর জর্জ্জরে তনু,—সংসারও নয় ভালো,
তবু তারে থাকে আলো করি শুধু কুরূপা রমণী কালো।
তাই তারে আজ নেহারি' অবাক মানিনু আপন মনে,
সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে শুধু শাখা, হাসি মাখা সে বদনে।
খোকারে তাহার কোলে ল'য়ে বলি',—"ছিনু ভালো বোন সেথা,
তুই ছিলি ভালো ? কই আমারে তো বলিলি না সেই কথা।"
হাসি কহে "ভালো ছিনু টুনুদাদা" আরক্ত—নতমুখে,—
বুঝিনু সে হাসি কত বেদনার—কত গভীর দুখে।
কহিল "দাদাগো ! দিব ভাই ফোঁটা, তুমি যেও মোর বাড়ী,
ভুলিলে কিন্তু ভাব রাখিব না, দিব তোমা সনে আড়ি।
কহিনু "যাইব তোমাদের বাড়ী, একদিন ফোঁটা নিতে,
সেদিনে কিন্তু ভাইটিরে তব ফোঁটা হবে দিদি দিতে।"
তাহার পরেতে বহু বৎসর চলিয়া গিয়াছে ধীরে,
পুনঃ আসিয়াছি পড়া শেষ করি সাগর গ্রামেতে ফিরে।
পাইয়া চাকুরী,—করিয়া বিবাহ,—হইয়া মেয়ের বাপ,
এতদিন পরে পড়িল আমার কথা রক্ষার চাপ।
গৃহিণীরে কহি একদা দিইনু পাশের গ্রামেতে পাড়ি'—
নানান্ জিনিষ বহিয়া চলিনু পাতানো বোনের বাড়ী।
বহুক্ষণ ফিরি নানা পথে ঘুরি গ্রাম পেনু অবশেষে,
দিনের আলোক যবে ধীরে ধীরে আঁধার সায়রে মেশে।
বোনটীর নামে অনেকে চিনিল, দেখাইয়া দিল ঘর,
প্রবেশি' নেহারি' কঙ্কাল হেন পড়িয়া শয্যাপর
কালো যে গোঙায়, বালক পুত্র ঘুমাইয়া রহে পাশে,
বন্ধ কারাও সে অন্ধকারে' তেয়াগিয়া চলে ত্রাসে।
প্রদীপ জ্বালিয়া ডাকিনু কালো রে ! এসেছি যে তোর্ বাড়ী,
কই দিদি—আজ ভাব্ করিবি না ? দিবি না হাসিয়া আড়ি !
গোঙায়ে গোঙায়ে কালো কহে "দাদা ! মরি তাহে দুঃখ নাই
গেলাম জানিয়া কেহ মোর আছে, আছে মোর কোন ভাই।

ভাই ফোঁটা আজি দিবার শকতি ফুরায়েছে ভাই মোর—
তাই উল্লাসে বলি আজি হোক্—জীবন নিশার ভোর।
আমি চ'লে যাব; খোকারে আমার তুমি নিয়ে যেও দাদা,
দিওনাক' ফেলে যদিই বা কেহ দিতে আসে তোমা বাধা।"
মুদিল সে আঁখি শান্তি শয়নে; উপহার রাশি ব'হে,
আমি ফিরে এনু,—আর তার শেষ উপহারটিরে ল'য়ে।

ভারী মজা

শ্রীসুপ্রকাশ দত্ত।

কয়েকটী মেয়ে একদিন টিফিনের ছুটীর সময় একজায়গায় বসে গল্প কর্‌ছে—নানা বিষয়েই তাদের গল্প হচ্ছে। একথা সেকথা বলতে বলতে কার কত বয়স সেই কথা উঠ্‌ল। যে যার বয়স বল্‌ল কিন্তু কল্যানীর খানিকটা আপত্তি দেখা গেল। তখন রমা বলে উঠল, "আচ্ছা তুই নাই বা বল্লি, আমি বলে দিচ্ছি তোর বয়স কত।

কল্যাণী—"ইস্। উনি সবজান্তা ভগবান্ এসেছেন কিনা! বল্ দেখি কত?

রমা—"দেখ্‌বি পারি কি না?

রমার এই কথা শুনে সকলেই উৎসুকভাবে রমার মুখের দিকে চাইল। তারা মনে করল দুষ্টু রমার কল্যাণীর কাছে থেকে ফাঁকি দিয়ে বয়স আদায় করবার এটা একটা ফিকির ছাড়া আর কিছুই নয়।

কল্যাণী—আচ্ছা বেশ, বল্‌ত আমার বয়স কত?

রমা—বলছি এখনি—কিন্তু আমি যা করতে বল্‌ব সেই অনুসারে ঠিক করা চাই কিন্তু।

কল্যাণী—"আচ্ছা-"

রমা—"তোর বয়স যত তার মাসের সংখ্যাকে দুই দিয়ে গুণ কর্।"

কল্যাণী—তার মানে?"

রমা—"ধর্, তোর বয়স ১১বছর ৪মাস। তাহলে ৪টা হবে তোর বয়সের মাসের সংখ্যা। এবার বুঝলি ত? সেটাকে ২ দিয়ে গুণ কর্।

কল্যাণী—"ওঃ বুঝেছি। হঁ্যা করেছি।"

রমা—তারপর যা হোল, তার সঙ্গে ৫ যোগ কর। করেছিস? আচ্ছা এবার তাকে আবার ৫০ দিয়ে গুণ কর্।"

কল্যাণী—"বাবাঃ! আমি অত গুণ করতে পারি না। (কল্যাণী অঙ্কে কিছু কাঁচা ছিল)

রমা—আরে কর্ না, মজা দেখ্‌তে পাবি এখনি।"

কল্যাণী—"করেছি ত! এবার আবার কি কর্‌তে হবে?

রমা—"যা গুণফল হোল তোর, তার সঙ্গে তোর যত বছর বয়স—মাসের সংখ্যা নয় কিন্তু শুধু বছরের—সংখ্যাটা সেই সঙ্গে যোগ কর।"

কল্যাণী—"করেছি। আর কত দেরীরে ? সারাদিন ধরে এই যোগ, বিয়োগ গুণ ভাগ করাবি নাকি ? তুই আর বয়স বলতে পেরেছিস্ ?

রমা—"এই হয়ে গেল আর একটু হলেই হয়। তোর বয়সের বছরের সংখ্যা যোগ দিয়ে যত হোল তার থেকে ২৫০ বাদ দে। কত হোল এইবার বল্।"

কল্যাণী—৫১৩ হোল।"

রমা—"তাহলে তোর বয়স এখন হচ্ছে ১৩ বছর ৫ মাস। ঠিক কিনা বল্ ?

কল্যাণী—বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে রমার মুখের দিকে চেয়ে বল্ল, "ঠিক বলেছিস্ কিন্তু, কি করে বল্লি ভাই বল্না !"

দলের অন্য মেয়েরাও বলে উঠল "কি করে বল্লি রে ? ভারী মজা ত !

রমা—ব্যাপার আর কিছুই না। কল্যাণীর উত্তর ৫১৩ হোলো ত ? তাহলে শেষ দুটী সংখ্যা অর্থাৎ ১৩ হোলো কল্যাণীর বয়সের বছরের সংখ্যা আর প্রথম সংখ্যাটী অর্থাৎ ৫ হলো তার মাসের সংখ্যা। এইবার বুঝেছিস্ত ?

অরুণা—আচ্ছা কল্যাণীর উত্তরটী যদি তিনটী সংখ্যার না হয়ে চারটী সংখ্যার হোত, তাহলে কি হোত ?"

রমা—"তাহাল শেষের সংখ্যা দুটী হোত বছরের সংখ্যা এবং প্রথম সংখ্যা দুটী হোতো মাসের সংখ্যা —এই আর কি !

সকলে—"বাঃ ভারী মজা ত ! দাঁড়াও না এবার আমরা ও রমার মত সকলকে ঠকাচ্ছি।"

এই সময় ঢং ঢং করে ক্লাশে যাবার ঘণ্টা পড়্ল। কাজেই তাদের গল্প রেখে উঠ্তে হোলো। আজ আবার এখন মিস্ চক্রবর্ত্তির ক্লাশ, দুমিনিট যে দেরী করে যাওয়া চল্বে তাও নয়। তাহলে আর বকুনির সীমা থাকবে না।

শ্রীঅমিয়কুমার রায় চৌধুরী

আজ তোমাদের কাছে একটা খেলার কথা বল্‌ব, তাকে বলে ব্যাড্‌মিন্টন খেলা। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত এখেলা জান, কিন্তু যারা জাননা, শিখে নিতে পার। খেলাটী বেশ সুন্দর। এই খেলার সম্বন্ধে প্রথম কথা হ'চ্ছে খেলার জায়গাটি ঠিক করা। জায়গাটি দৈর্ঘে ৪৪ ফিট ও প্রস্থে ২০ ফিট হওয়া চাই। এখানে যে ছবি দেওয়া হ'ল তাতে কোর্টটি কি রকম হবে তা বোঝা যাবে।

কোর্ট—প্রথমে একটী চতুষ্কোণ সীমানা করে নিয়ে (লম্বা ৪৪ ফিট্ ও চওড়া ২০ ফিট) চুণ দিয়ে দাগ দিয়ে ফেল্‌তে হবে। চারধারের সীমানার রেখাকে "বাউণ্ডারি লাইন" বলে। সবার পিছনে যে ২০ ফিট করে দুটি দাগ, তাদের বলে 'ব্যাক্ বাউণ্ডারি লাইন'। এই ব্যাক্ বাউণ্ডারি লাইনের ভিতর দিকে আড়াই ফিট করে জমি ছেড়ে, দুদিকে দাগ দিয়ে ফেল্‌তে হবে, এই রেখাটিকে বলে 'লঙ্গ সার্ভিস্' লাইন। লঙ্গ সার্ভিস্ লাইনের সমান্তরালভাবে আরও দুটি রেখা টান্‌তে হবে। এই রেখাটিকে 'সর্ট সার্ভিস' লাইন। 'লঙ্গ সার্ভিস' লাইন ও 'সর্ট সার্ভিস' লাইনের মাঝে ১৩ ফিট করে ব্যবধান থাকবে। এবার সর্ট সার্ভিস লাইনের আর ব্যাক বাউণ্ডারি লাইনের মাঝখান থেকে লম্বালম্বিভাবে দুদিকে দুটি দাগ দিতে হবে। ব্যাক বাউণ্ডারি লাইন ও লঙ্গ সার্ভিস লাইনের মাঝের জমিকে বলে "থার্ডকোর্ট"। দুটি সর্ট সার্ভিস লাইনের ব্যবধান ১৩ ফিট পরিমান জমিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে মাঝখান দিয়ে চওড়াভাবে একটি দাগ দিতে হবে। এই দাগের উপরেই নেট বা জাল থাকে। এই গেল কোর্টের কথা।

সরঞ্জাম—খেলার সরঞ্জাম বোধ হয় অনেকেই দেখেছ। খেলা হয় ব্যাট ও পালকের বল দিয়ে। এই বলকে বলে সাট্‌লকক্। কেউ কেউ আবার পশমী বলেও খেলে থাকে।

তবে সাটল ককে খেলে বেশী আরাম হয়। ব্যাড্‌মিণ্টন্ খেলাতে এসব ছাড়া একটি সুতার জাল ও একজোড়া খোঁটার দরকার। এই জালতি বা নেট মজবুত্‌ সুতায় প্রস্তুত। উপরের তিন ইঞ্চি চওড়া ফিতেটির উপরেই নেটটি থাকে ; কাজেই সেটাও মজবুত হওয়া দরকার। খোঁটাগুলি উচ্চে সাড়ে পাঁচ ফুট হওয়া চাই। তবে বেশী হলেও ক্ষতি নাই।

সরঞ্জামের ব্যবহার—কোর্টের ঠিক মাঝখান দিয়ে যে লাইনটী গেছে তারই উপর
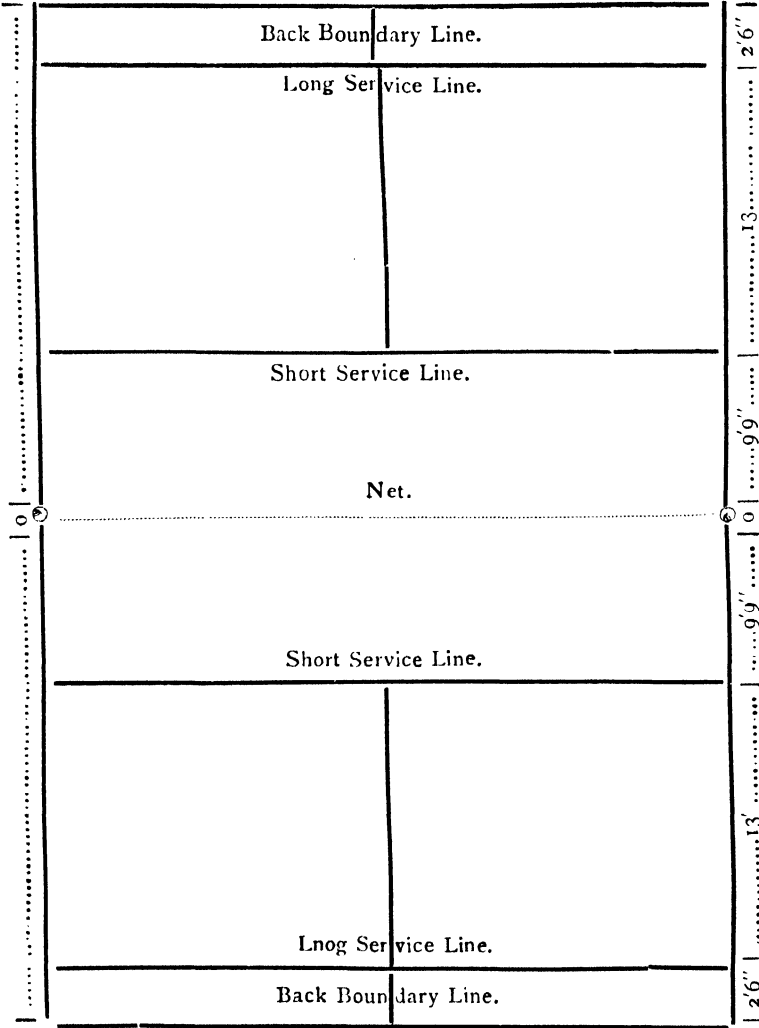
নেট্‌টি ঝুলবে। জমি থেকে নেটের উচ্চতা ৫ ফিট হওয়া চাই। তোমরা পোষ্ট এর গায়ে দু এক ইঞ্চি উচু করে নেটটি বেঁধো, কারণ যতই টান করে বাঁধা যাক্ না কেন, মাঝখানে দু এক ইঞ্চি ঝুলে পড়েই শেষে। তবে লম্বা লোকেরা সুবিধা অনুসারে নেট্‌টা উঁচু করে

খাটীয়েও খেলেন, তাতে ক্ষতি নাই। সাধারণতঃ ২৪ ফিট লম্বা নেট্ দিয়েই খেলা হয়। কিন্তু কোর্ট ২০ ফিট চওড়া, কাজেই দুধারে দু ফিট্ করে বাইরের দিক থেকে পোষ্ট্ পুত্‌তে হবে। প্রথমে নেটের দুই সীমা পোষ্টের গায়ে বেঁধে প্রত্যেক খোঁটার মাঝখান থেকে এক এক জোড়া করে দড়ির টুক্‌রা (৩ ফিটের কম নয়) বেঁধে দুপাশে টান করে এক একটি দড়ির মুখে কাঠের গোঁজা কিংবা লোহার হুক্ বেঁধে মাটীতে পুত্‌তে হবে। কি করে ব্যাট দিয়ে বল মারতে হয় সে কথা বোধ হয় তোমরা সকলেই জান, কাজেই সে কথা বাদ দিয়ে গেলাম।

খেলার নিয়ম—সাধারণতঃ খেলা চারজন কিংবা দুজনেই হয়ে থাকে। চারজনের খেলায় এক এক পক্ষে দুজন করে খেলে; তাই বলা হয় "Double hand game." আর দুজনের খেলাকে সিঙ্গ্‌ল হ্যাণ্ড গেম (Single hand game) বলা হয়, কারণ এক একদিকে একজন করে খেলে। প্রথমে ডবল্ হ্যাণ্ড গেমের কথাই লিখ্‌ছি সিঙ্গল হ্যাণ্ডের কথা পরে বলব। কোন রকম বাজী বা প্রতিযোগিতার খেলায় এক সেট্ করে খেলতে হয়। তিন গেমে এক সেট; দুটো গেম যে জেতে তারই জয়।

প্রথমেই তোমাদের মধ্যে একটা গোলমাল বাধতে পারে, প্রথম খেলার অধিকার নিয়ে। এবিষয়ে আমার কোন হাত নেই, তবে এইটুকু বলতে পারি যে যদি আপোষে না হয় তবে পয়সা দিয়ে toss করাই সবচেয়ে ভাল।

সার্ভের কথা—প্রথম যে খেলবে তাকে shuttle cock টীকে ঠিক বিপরীত কোণাকুনি ঘরে ফেলতে হবে। যে পক্ষ প্রথম খেলবে তাদের প্রথম ডানধারের ঘর থেকে আরম্ভ করতে হবে। যথাক্রমে অ কিংবা ঈ থেকে আরম্ভ করতে হবে। যদি "অর" পক্ষ প্রথম খেলবার অধিকার পায় তবে অ থেকে কোণাকুনি ঈ-তে বল ফেলতে হবে। যদি "ঈর" পক্ষ প্রথমে খেলবার দান পায় তাহ'লে ঈ থেকে অ-তে বল ফেলতে হবে। এই রকম ভাবে কোণাকোণি ঘরে বল মারাকে Serve করা বলে।

খেলা আরম্ভ হবার পর আ কিংবা ই থেকে Serve করবার প্রথা একই রকম।

অ থেকে প্রথম সার্ভ করলে ঈ থেকে প্রতিঘাত কর্‌তে হবে। প্রত্যেকটা বল নেটের উপর দিয়ে যাওয়া চাই, এই রকম ভাবে খেলা চল্‌তে থাকে। যে পক্ষ ফস্কাবে অথবা যে পক্ষের বল নেটের ভিতর দিয়ে যাবে বা বাইরে গিয়ে পড়বে তারা যদি সার্ভ করে থাকে তবে সার্ভিস বা সার্ভ করবার ক্ষমতা নষ্ট হবে। যারা সার্ভ করেনি তারা ফস্কালে বা ঐ রকম কোন একট দোষ করলে, যারা সার্ভ করেছে তারা

একটা করে ফোঁটা বা পয়েন্ট পাবে। পয়েন্ট পেলে ঘর বদলাতে হয়, অর্থৎ যদি অ থেকে সার্ভ হয়ে থাকে তবে "অ" র লোককে "আ" তে আস্‌তে হবে, "আ র" লোককে "অ" তে বদলি হতে হবে। সার্ভিসের বল অপর পক্ষের Short service ও long service lineএর মধ্যে পড়া চাই, third কোর্ট কিংবা short কোর্টে পড়লে চলবে না। কোন পক্ষের সার্ভিস বাতিল হলে, তারপর সেই পক্ষের অপর জন serve করে এবং তুজনেরই সার্ভ নষ্ট হলে অপর পক্ষ সার্ভ করে। যারা প্রথম সার্ভ করে, তাদের একজনের সার্ভিস খতম হলে, অপর পক্ষকে serviceএর দান ছেড়ে দিতে হয়। অবশ্য এটা কেবল প্রথম সার্ভিসের দানে। ডান হাত দিয়েই সার্ভ করাই নিয়ম সঙ্গত। দাগে পা দিয়ে সার্ভ করলে সার্ভ নষ্ট হয়।

Game অথবা জিত কিসে হয়—ব্যাড্‌মিন্টনে ১৪ কিংবা ২১ ফোঁটাতেই সাধারণতঃ একটী game হয়ে থাকে। যে পক্ষ আগে পনের কিংবা একুশ ফোঁটা কর্‌তে পারবে তাদেরই জিত। খেল্‌তে খেল্‌তে তুপক্ষেরই ১৪ কিংবা ১৮ ফোঁটা হতে পারে। তখন আর তিন ফোঁটার খেলা হয়। যে পক্ষ তিন ফোঁটার মধ্যে তুই ফোঁটা পাবে তাদেরই জিত। একপক্ষ যদি জেতে আর অপর পক্ষ এক পয়ণ্টও কর্‌তে না পারে তবে পরাজিত পক্ষ বিজয়ীদের কাছে nilএ game খায়। পরাজিত পক্ষ যদি পাঁচের বেশী কর্‌তে না পারে তবে সে খেলাকে love game বলে।

Service সম্বন্ধে তুএকটী কথা—ব্যাড্‌মিন্টনের খেলা সম্বন্ধে অনেক লোকের অনেক মত। তবে যে নিয়মগুলি সকলেই মেনে চলে সাধারণতঃ সেগুলিরই কেবল উল্লেখ করছি। সার্ভের সময় কতকগুলি অমার্জ্জনীয় ভুল হয়। তার মধ্যে Over hand service একটী ; বুকের চেয়ে উঁচু থেকে সার্ভ কর্‌লে তাকে Over hand service বলে।

সার্ভ করবার সময় সার্ভকারীর পা যদি সার্ভিসের ঘরে না থাকে বা একটা পা যদি পাশের ঘরের মধ্যে থাকে তবে সার্ভ নষ্ট হয়। কোন লাইনের উপর পা দিয়ে সার্ভ করা নিয়ম বিরুদ্ধ। সার্ভিসের কিংবা অন্য দানেও একবার ব্যাটে লাগাই চরম, তারপর আর দ্বিতীয় বার বল মারা চলে না। তাতে যদি অপর পক্ষে বল না পৌঁছায়, তাহলেও উপায় নেই।

Let কাকে বলে—এ খেলায় letবলে একটা জিনিষ আছে। জিনিষটা খানিকটা নিপাতনে সিদ্ধ গোছের। নিয়ম নির্দ্দিষ্ট সীমার বাইরে Shuttle cock পড়্‌লে কি হয় তা বলা হয়েছে আগে, কিন্তু সেই বাইরের বলে প্রতিঘাত করলে, সেটাকে খেলার অন্তর্গত বলেই ধরে নেওয়া হয়।

সার্ভের সময় যদি বলটি নেট ছুঁয়ে অপর পক্ষের ঠিক সীমার মধ্যে গিয়ে পড়ে তবে সে service নির্দ্দোষ বা প্রতিঘাত জোগ্য।

এক পক্ষেরই ছুইটি লোক সার্ভের সময় এক ঘরে থাক্‌তে পারে না। আগে বলা হয়েছে যে receiveএর সময় নির্দ্দিষ্ট খেলোয়াড় ছাড়া কেউ প্রতিঘাত কর্‌তে পারবে না, কিন্তু যদি তার সঙ্গী বা partner-receive করা সত্ত্বেও অপর পক্ষ থেকে প্রতিঘাত আসে, তাহলে অসাবধানতার শাস্তিস্বরূপ খেলা "চলতি" হয়। এটাকেও let বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাতে খেলার কোন ক্ষতি হয় না।

আরও একটা লেটের উদাহরণ দিচ্ছি—মনে কর "ক" "খ"র কাছে সার্ভ কর্‌ছে যদি "ক"র shuttle-cock "খ"র ঘরে গিয়ে না পড়ে অথচ "খ"র খেঁড়ু (বা partner) সে বল receive করে তবে "ক" একটা ফোঁটা পাবে। কাজেই দেখ্‌ছ ভুল কর্‌লেই প্রতিপদে তার শাস্তির ব্যবস্থা আছে। যদি shuttle-cock জালের উপর আসে আর সেটাতে যদি প্রতিঘাত করা হয়, তবে আসলে সে বলের short courtএর মধ্যে পড়্‌বার সম্ভাবনা থাক্‌লেও প্রতিঘাতের জন্য খেলা চল্‌তে থাকে। এটাকেও let বলা চলে।

Single hand খেলার নিয়মও একই রকম; তবে এক একটি ফোঁটার পর একই লোককে ঘর বদল করে সার্ভ কর্‌তে হয় ও রিসিভ্ করবার সময় অপর পক্ষের কোণাকুণি ঘরে দাঁড়াতে হয়। একজনের সার্ভ নষ্ট হলে, অপর পক্ষেকে সর্ব্বদা ডান ধারের ঘরে থেকে সার্ভ করেতে হয়।

আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটা কথা লিখছি, মনে ক'রো না যে আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি। হয়তো তোমরা হেসেই উড়িয়ে দেবে, কিন্তু সত্যই কথাগুলি কাজের। এই খেলায় একটু মাথা ঠাণ্ডা করে—বিবেচনা সহকারে খেলতে হয়। একটু অসাবধান হলেই বিপক্ষের সুবিধা। Double hand খেলায় সুবিধার জন্য একজনকে এগিয়ে আর একজনকে পিছিয়ে খেলতে হয়। তাহলে খেলায় বেশ একটা শৃঙ্খলা থাকে। মনোযোগ হচ্ছে সবচেয়ে দরকারী কথা।

খেলার উদ্দেশ্য শরীর ও মনের উপকার সাধন সুতরাং খেলার সময় রাগারাগি কর্‌লে খেলার আনন্দ চলে যায়। এইজন্য মনের অবাধ্যতার দিকে একটু নজর দেওয়া একান্ত দরকার। এক কথায় বল্‌তে গেলে Sporting Spirit থাকা চাই।

সিঁথেয় সিঁদুর।

শ্রী সরলা দেবী চৌধুরাণী।

একটি সাহিত্যসভায় সভানেত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম। লোকে লোকাকার। থিয়েটার গৃহে নীচে যত পুরুষ, উপরে ততোধিক মেয়ে। রঙ্গমঞ্চে ফরাসের উপর সভানেত্রীর আসন ছিল, পাশে তাঁর একটি মহিলা ছিলেন এবং আশপাশে কতিপয় কর্ম্মকর্ত্তা, বালিকা-গায়িকাদ্বয় ও বিশিষ্ট কয়েকটি লোকমাত্র উপবিষ্ট ছিলেন। সভার কার্য্য আরম্ভ হওয়ার পর তাঁদের কারো কারো দৃষ্টি নেপথ্যের দিকে আপতিত হ'ল। অমিও সেদিকে চেয়ে দেখি একটি মহিলা উপরে না গিয়ে আমার কাছেই বস্‌বেন বলে আস্‌ছেন। টুকটুকে লালপেড়ে গরদের সাড়ীখানি মানানসই ক'রে পরা, পায়ে তরল আল্‌তা, কপালে সিন্দুরের টিপ্‌ ও সিঁথেয় সিঁদুর। নাগরা জুতোটি পরদার ধারে খুলে রেখে তিনি আমার কাছে এসে বস্‌লেন। এই সুশ্রী, সলজ্জ অথচ সপ্রতিভ মেয়েটি যে কে আমিও চিন্‌তে পারলুম না। খানিক পরে একজন আগন্তুক পরিচিত পুরুষকে দেখে হঠাৎ প্রতীয়মান হ'ল মহিলাটি এঁরই নব বিবাহিতা পত্নী। প্রথমেই না চিন্‌তে পারার যথেষ্ট কারণ ছিল। আমি আগে এঁকে যে দু'চারবার দেখেছি তা স্বতন্ত্র মূর্ত্তিতে। তখন তাঁর ছিল বৈধব্যের বেশ, ম্লান শুষ্ক চেহারা, অযত্নবদ্ধ কুন্তল। ভস্ম ঢাকা আগুণের মত একটা তেজ, একটা দীপ্তি তখনও তাঁর মুখে চোখে কথায় বার্ত্তায় প্রকাশ হ'তে চাইত, সেটা কিন্তু বিদ্রোহিনীর স্পর্দ্ধাব্যঞ্জক ; অতি উগ্র। আজ সে স্পর্দ্ধা শান্ত শীতল, উগ্রতা চারুতায় নির্ব্বাপিত।

আশৈশব যে তার সমবয়সী সব-কিছু-সুখের ও ভোগের-অধিকারিণীদের পর্য্যায় থেকে পৃথক্‌কৃত হ'য়েছিল, সমাজের এই সপক্ষপাত বিধির বিরুদ্ধে যার অভিমান গুম্‌রে গুম্‌রে উঠ্‌ত সমাজ আজ তার কাছে পরাস্ত হয়েছে। বিজয়িনী আজ সমাজে তার বয়সানুকুল যথাযথ স্থান অধিকার করেছে, বিধি-নির্দ্দিষ্ট স্বভাবধর্ম্ম পালনের বৈধ পথ আজ তার সাম্‌নে উন্মুক্ত হয়েছে, তাই আজ সে মৌন ও মিষ্ট, প্রগল্‌ভ ওপ্রখর নয়।

ঐ যে সিঁথেয় সিঁদুর, তা' তা'র কল্যাণ ও কল্যাণীয়তা দুয়েরই সূচনা করছে, সেইটির অভাব তার শূন্য সীমন্তে এতদিন জীবনের কত শূন্যতা, কত অপূর্ণতার ভার বহন করে আসছিল। ঐ সিঁথেয় সিঁদুর ঘোষণা করছে সংসার পথের বেপথমানা পথিক

আজ আর একা নয়, তাকে সাহস দেবার সাথী পাশেই রয়েছে। পথে যদি দুঃখ আসে, তবে তা' ভাগ করে দুঃখের খরদন্ত কম ধারাল করবার মূর্ত্তিমান আশা রয়েছে। যদি আনন্দের সন্দর্শন হয়, তবে দুজনে মিলে দর্শনে তার আনন্দময়তা শতগুণিত করবার উপায় সুলব্ধ হ'য়েছে। কে ছিল তার জীবনে এতদিন যে এই স্থানটী নিতে পারত? কেউ নয়, মা বাপ ভাই বোন বা তৎস্থানীয় কেউ নয়। তাঁরা একটা বয়সের পর আশপাশ ভরে থাকেন, একেবারে জীবনের মর্ম্মস্থলে পৌঁছতে পারেন না। এই গেল তার নিজের কল্যাণ বা লাভ সম্বন্ধে। কিন্তু সিঁথেয় সিঁদুর তার নিজের লাভের চেয়ে আরও কিছুর বার্ত্তা ঘোষণা করে—সে বার্ত্তা ত্যাগের, আত্মোৎসর্গের বা কল্যানীয়তার। সিঁথেয় সিঁদুরটি শুধু ভোগের সুবিধাব্যঞ্জক নয়, এটি প্রাণজাত ত্যাগের সমুজ্জ্বল চিহ্ন। কিশোরীরা মনে রেখো একদিন এই সিঁথেয় সিঁদুরটি পরিয়ে যে তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে তার সমস্ত সুখ দুঃখের অংশ বহনের দায়িত্ব তোমার উপর পড়্বে। যদি তা'র দুঃখে তোমার নয়ন জল বহাতে না পার, যদি তার বিপদে ঢালের মত হয়ে তাকে খাড়া করতে না পার, তবে এ সিঁদুরের রঞ্জন ম্লান করে দেবে।

শুধু সম্পদের দিনের জয় পতাকা যে এই সিঁদুর রাগ; হতাশার, লাঞ্ছনার, দুর্দ্দৈবের দিনে প্রেমাস্পদের প্রতি হৃৎস্পন্দের সঙ্গে নিজের স্পন্দিত মিলিত হৃদয়ের রক্তরাগ এ যে!
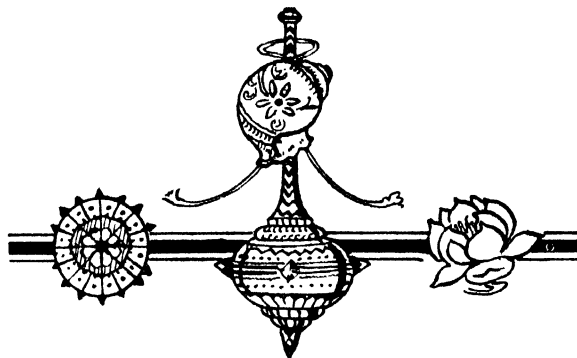
লতুর শিক্ষা

শ্রীসুনীতি দেবী, বি, এ।

রান্নাঘরের চৌকাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে বিনু বল্‌ল,—মা, লতুটার জ্বালায় ত পারা যায় না। এতদিন পরে বোর্ডিং থেকে কাল সবে বাড়ী এসেছে। আজই সকলের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে তুলেছে। ঘরের কোণে মিনু কি যেন মুখস্থ করছে, তাতে ওর নাকি সব অঙ্ক ভুল হয়ে যাচ্ছে। আমার বইগুলো পর্য্যন্ত জড় করে একদিকে রেখে দিয়েছে, বলছে অন্য কোথাও গিয়ে আমায় পড়্‌তে হবে। ওর একলা পড়ার একটা ঘর চাই আরও কত কি।

মনোরমা ভাতের হাঁড়িতে চাল কটা ছেড়ে দিয়ে, বাইরে এসে দাঁড়িয়ে একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বল্‌লেন—বোর্ডিংএ গিয়ে মেয়েটা যেন আরও কি রকম হয়ে গেছে। সেবারে ক্লাসে ফাষ্ট হতে পারে নি,—বল্‌ছিল বাড়ীতে গোলমাল হয়, তাই তোমার বাবা কত কষ্টে ওর বোর্ডিংএর খরচ জুগিয়ে চলেছেন; সে সব ওর খেয়ালও হয় না। গরমের ছুটিটা বাড়ী আস্‌বে আমরা পথ চেয়েছিলাম, ও কিন্তু এসেই অপ্রসন্ন হয়ে রয়েছে।

বলতে বলতেই লতু মিনুর হাতধরে টান্‌তে টান্‌তে এসে চেঁচিয়ে বল্‌ল—এইজন্য বাড়ী আস্‌তে ইচ্ছে করে না। মিনুটার রকম দেখেছ মা! আমার অঙ্ক কষবার সময় ওর যত 'পাখী সব করে রব' মুখস্থ করার ধুম পড়ে গেল।

মিনু অমনি চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—তবে কি রান্নাঘরে বসে পড়্‌ব, না ছাতে যাব?

মনোরমা এগিয়ে এসে বললেন,—ছি, লতু তুমি বড় বোন তুমিই ত সাম্‌লে চল্‌বে; এখন কি ছেলেমানুষের মত ঝগড়া কর্‌তে আছে!

"ঝগড়া আবার কে করছে -" বলে লতু দুপ্‌দাপ্‌ করে ফিরে গেল।

মনোরমা ডেকে বল্‌লেন—ও লতু, লতু, শোন্‌, ও বাড়ী থেকে হাসি আস্‌বে আজ। তার মা বলেছে তোর সঙ্গে বিকেলে গল্পটল্প করলে ভাল লাগ্‌বে। বেচারীর সমবয়সী এপাড়ায় কেউ নেই কি না।"

লতু না ফিরেই বল্‌ল—তা'হলেই হয়েছে। এমনি করে রোজ আড্ডা দিলে লেখাপড়া করব কখন্‌!

বিনু এবার হাসি চাপ্‌তে না পেরে বল্‌ল,—আচ্ছা! জগতে কেবল তুমিই লেখাপড়া করছ, আমরা সব ভেসে বেড়াচ্ছি। আচ্ছা আমরা নয় বোকা, এই বীণাদি ত টপাটপ্‌ বি, এ, পর্য্যন্ত পাশ করে গেল, কোনও দিন ত দেখিনি যে মুখ গুজে কেবল

পড়্ছেই। রান্নাও করছে, বড় মেসোমহাশয়ের অসুখে কত সেবাও করেছে রাত জেগে, তা'ছাড়া গানবাজনা আমোদ আহ্লাদ কিছুই ত বাদ যায় নি তার।

এইবার লতু ফিরে দাঁড়াল। মুখখানা লাল করে বল্‌ল—বীণাদির অগাধ বুদ্ধি, আমি বোকা মানুষ, আমাকে একটু বেশি পড়াশুনা কর্‌তে হয়।

মনোরমা দেখলেন বিপদ! এইবার কান্নাকাটি সুরু হয়। তিনি বল্‌লেন,—সবই ভুল বুঝিস্ কেন পাগ্‌লী। তোর ভালর জন্যই ত বিনু বল্‌ছে। তোর যেন পড়া পড়া বাই হয়েছে—অমন কর্‌লে শরীর ভেঙ্গে যাবে যে।

লতু উত্তর না দিয়ে পড়ার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। বিনু বলল—কি করি বল ত মা। আমি তবে যাই সুরেশদের বাড়ী গিয়ে এখন পড়ি। বাড়িতে ত টিকতে দেবে না।

মনোরমা ধীরে ধীরে রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। এই সময়ে রাঁধতে কষ্ট হয়, তবু খরচ কমাবার জন্য ঠাকুর ছাড়িয়ে দিয়েছেন। লতুকে রোডিংএ দিয়ে অনেক হিসাব করে চল্‌তে হয়। সে যদি তা একটু বুঝ্‌ত।

ছেলেদের বাবা হরিশ বাবু আফিস থেকে ফিরতেই তাঁর খাবার নিয়ে মনোরমা এসে দাঁড়ালেন। হরিশবাবু বল্‌লেন,—যে কদিন লতু থাকে, সেই এগুলো করুক না। বোর্ডিংএ একঘেয়ে পড়া নিয়ে কাটিয়েছে, রোগাও হয়ে গেছে মনে হল। তবে এখন এইসব দিকে মন দিতে বল। ওরও ভাল লাগবে।

মনোরমা বললেন,—তাহলেই হয়েছে। এম্‌নিই বলে পড়াশুনার ক্ষতি হচ্ছে। আমি যদি কাজ করতে ডাকি তবে এখনই বোর্ডিংএ ফিরে যেতে চাইবে।

হরিশবাবু অবাক্ হয়ে বল্‌লেন—"সেকি! বোর্ডিং যদি বাড়ীর চাইতে ভাল লাগে, সে ত সুবিধার কথা নয়। তা' হলে ছুটির পর বাড়ীতেই থেকে পড়ুক। আর বোর্ডিংএ দিচ্ছি না।"

মনোরমা জান্‌তেন তাহলে লতুর কি অবস্থা হবে, সেইজন্য তাকে বাঁচাবার জন্য ব'ললেন—"তা কেন! আস্‌চে বছর ম্যাট্রিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হোক্। স্কলারসিপ পাবার ওর একটা ঝোঁক্ হয়েছে। বাড়ীতে সত্যিই ত পাঁচ রকম গোলমালে পড়া ভাল হয় না।

হরিশবাবু গম্ভীরভাবে বল্‌লেন—"দেখ যা ভাল বোঝ। তুমি নিজেকে কষ্ট দিয়ে কেবল ওর খেয়ালকে প্রশ্রয় যদি দাও তার ফল কি ভাল হবে? যাহোক্ তুমি মা, তুমিই ছেলেমেয়েদের কথা আমার চেয়ে বেশী বোঝ। কিন্তু তোমার কাছে কাছে থেকে তোমার দৃষ্টান্ত দেখে যদি আত্মত্যাগ করতে শিখ্‌ত, তাহলে আমি অন্ততঃ বেশী খুসী হতাম্।"

[২]

আজ মনোরমার দিদি, ভগ্নীপতি ও তাঁদের ছেলেমেয়েদের, এ বাড়ীতে খাবার কথা। মনোরমা কুট্‌নো কুট্‌তে কুট্‌তে মিনুর কান্না শুনে ছুটে এলেন। দেখ্‌লেন স্নানের ঘরে পিছলে পড়ে গিয়ে, মিনুর কপালের একপাশে একটু কেটে গিয়েছে—কাপড়চোপড়ও কাদামাখা।

'লতু, ও লতু, মিনুর কপালে একটু আইডিন্ লাগিয়ে কাপড়টা ছাড়িয়ে দে মা, —আমার সব কুট্‌নো বাট্‌না পড়ে আছে'—বলে মনোরমা ডাক দিলেন। লতুর দুর্ভেদ্য পড়ার ঘরের দুর্গ থেকে কোন সাড়া এল না। বিনু ছুটে এসে বল্‌ল—আমি দিচ্ছি মা। তুমি যাও কাজ শেষ কর। বড় মাসীরা নিয়মে খান্, তাঁদের খাবার যেন দেরী না হয়। তোমাকে এক্‌লাই ত সব রাঁধতে হবে।"

মনোরমা বল্‌লেন—তুই ঠিক মত পার্‌বি ত ? মিনু ব্যথা ভুলে হেসে বল্‌ল—জান মা, কাল বেড়াতে যাবার কাপড় পরাতে গিয়ে দাদা আগে আমায় ফ্রক পরিয়ে তার ওপর পেটিকোট পরাচ্ছিল, আমি শেষে দেখিয়ে দিলাম।

বিনু মিনুকে কোলে তুলে বল্‌ল,—চল্, আর হাস্‌তে হবে না। আইডিন লাগাবার সময় সব হাসি বেরিয়ে যাবে।

ঠিক সেই সময় মনোরমার দিদি উমাতারা তাঁর মেয়ে বীণাকে নিয়ে ঢুক্‌লেন।

মনোরমা বল্‌লেন—দিদি, এত শীগগীর এলে যে।

উমাতারা বল্‌লেন—বাঃ রে, একি কুটুম বাড়ী খাওয়া নাকি, যে ঘড়ি দেখে আস্‌ব। আগেই এলাম একটু গল্পসল্প কর্‌ব। ও মা! তোর কুট্‌নো এখনও ছড়ান রয়েছে,—রাঁধবি কখন ? উনি ঠিক ১১ টায় হাজির হবেন এসে। তখনই খেতে না পেলে দেখিস্ কি করেন। তুই সর, আমি কুট্‌নো কুটি, তুই কাছে বসে গল্প কর। বীণা আর লতু রাঁধুক। কই লতুকে দেখছি না—বলে চারদিকে চাইলেন।

মনোরমা একটু লজ্জিত হয়ে বললেন,—সে পড়্‌ছে।

উমাতারা হেসে উঠ্‌লেন,—ছুটির মধ্যে আবার অত পড়া কি! তায় আমরা আজ এসেছি। যা ত বীণা তাকে ধরে নিয়ে আয়।

লতু জন্মে এমন বিপদে পড়ে নি। এ ত মা, কি দাদা, কি মিনু নয়, যে ঝগড়া করবে। যথাসম্ভব পেঁচামুখ করে উঠে এসে বড়মাসীকে প্রণাম কর্‌ল।

উমাতারা বল্‌লেন,—মনো, তুই মেয়েটাকে এমন পেত্নী করে রাখিস্ কেন ? চুল আচড়ান নেই, ভাল একখানা কাপড় পরেনি, মুখখানা যেন কালো হয়ে গেছে।

ততক্ষণে মিনুকে কাপড় ছাড়িয়ে বিনু এসে পড়েছিল। সে বলল,—বড়মাসী

কিছু জান না। আজকালকার মেয়েরা সাজগোজ নিয়েই ত মাটি হয়ে যাচ্ছে! যারা লেখাপড়া করবে তাদের সাজতে নেই, গল্প করতে নেই, অন্য কিছুতে মন দিতে নেই, এ বিষয়ে লতু একটা 'থিসিস' শীগ্গীরই লিখে ফেল্‌বে! আপাততঃ তাদের দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্য লতু নিজে বাইরের সব বাজে আড়ম্বর ছেড়ে, দিনরাত লেখাপড়া নিয়ে থাকে।

বীণা বলে উঠ্‌ল—সব ভাইরাই দেখছি সমান! বোনেদের খেপান ছাড়া কিছু জানে না! এস ত লতু পরিষ্কার এক্‌খানা কাপড় পরে, আমরা রাঁধতে লেগে যাই।

মিনু নাচ্‌তে লাগল,—না বীণাদি তুমি আমায় একটা গল্প বল্‌বে চল।

বীণা তা'কে আদর করে বলল—আগে কাজ, কি আগে খেলা, জান্‌তে চাই আমি। খেয়ে উঠে ঢের গল্প বল্‌ব। এখন কাজে লাগা যাক্। মিনু তুমি কিন্তু আমাদের ফরমাস খাট্‌বে।

মিনু ও তাই চায়। লতু বেচারীর মুখে কিন্তু এত হট্টগোলেও হাসি ফুটল না। আজ দিনটা নষ্ট হল, তা' কি করে সে ক্ষতিপূরণ করবে তাই সমস্তক্ষণ চিন্তা কর্‌তে লাগ্‌ল।

[৩]

গরমের ছুটির শেষে লতু বোর্ডিংএ ফিরে পূরাদমে পড়া আরম্ভ করেছে। খেলার সময়টুকুও মাঠে একখানা বই নিয়ে পড়্‌তে থাকে ; আর কটা মাস ভয়ানক খাটতে হবে, তারপর যখন স্কলারশিপ পাবে তখন সবাই দেখে নেবে সে কেমন মেয়ে। তাদের বাড়ীতে কেউই স্কালারশিপ পায় নি,—এমন কি তাদের অত আদরের বীণাদিও না। শুধু ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ ত আজকাল সবাই করে।

বিধাতা কিন্তু লতুর অত সাধে বাদ সাধলেন। পরীক্ষার একসপ্তাহ আগে সে হঠাৎ জ্বরে শয্যাগত হল। তাকে বাড়ীতে নিয়ে আসা হল। মিনু সেই দিনই খবর দিল —দিদি বীণাদির বিয়ে শীগ্গীরই, তুমি ভাল হয়ে না উঠ্‌লে—কিছু মজা কর্‌তে পাবে না।

লতু জ্বরের মধ্যে ধম্‌কে উঠ্‌ল—কি যে মজা তোদের দিনরাত বুঝি না। বিয়ে ফিয়ে দেখ্‌তে চাই না। সেরে উঠে পরীক্ষাটা ভাল করে দিতে পারলে বাঁচি।

এদিকে লতুর জ্বর ছাড়েই না। পরীক্ষার দিন সে কেঁদে কেঁদে আরও জ্বর বাড়িয়ে তুল্‌ল। তার মা কত সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লেন,—আস্‌ছে বছর কত ভাল করে পরীক্ষা দিবি, এইবার সেরে উঠে শরীরের খুব যত্ন কর। তা'হলেই আর ভাবনা নেই। কিন্তু তাতে লতুর মন ত বুঝ্‌ল না।

তার বাবা কাছে বসে আস্তে আস্তে বললেন—লতু মা, এবারে বোধহয় বুঝ্‌তে

পারছ যে কোনও কিছুর বাড়াবাড়ি ভাল নয়। শরীরকে এত অবহেলা করেছিলে সে এখন শোধ নিচ্ছে। যা, হবার হয়ে গেছে। পরের বছর ধীরে সুস্থে পরীক্ষা দিও।

লতুর জ্বর ছেড়ে গেল। মনোরমা অসুখে পড়্‌লেন। লতুর অসুখের সময় সংসারের খাটুনির ওপর লতুর সেবা করাতে তাঁর শরীর যেন ভেঙ্গে পড়েছিল। এতদিন ধরে একা খেটে এসেছেন, সব ছুশ্চিন্তার ভার বহন করেছেন স্বামী পুত্র কন্যা যেন কেউ কোন কষ্ট না পায়—এই লক্ষ্য রেখে সবাইকে বাঁচিয়ে নিজকে ক্ষয় করে ফেলেছেন। ডাক্তার বল্‌লেন—সম্পূর্ণ বিশ্রাম আর মানসিক প্রফুল্লতা এই ছুটি সব চেয়ে বড় ওষুধের কাজ করাবে।

খবর পেয়ে বীণা এসে এ বাড়ীতে রইল। তার বিয়ের দিন পিছিয়ে দেওয়া হল। বীণা এসে ঘড়ির কাঁটায় খাওয়া, দাওয়া, পড়াশুনা আর মনোরমার সেবাশুশ্রূষা করতে লাগ্‌ল। বিনু যদিও ছেলে তবু বীণা তাকে দরকার হলে রান্নাঘরের কাজ পর্য্যন্ত করায়। বলে—ভাইবোন সবাই মিলে সব কাজ ক'রতে না শিখ্‌লে কি সংসার টেঁকে ?—হরিশবাবু পর্য্যন্ত জুতাজোড়া ঠিক জায়গায় না রাখ্‌লে তাড়া খান,—ও মেসোমশায় এখানে কেন জুতা ফেলেছেন ? সবাই গুছিয়ে রাখ্‌তে না শিখ্‌লে কাজ যে কেবল বেড়ে যায়।"

লতু যতদিন দুর্ব্বল ছিল বেশীর ভাগ বিছানায় শুয়ে থাক্‌ত। শুয়ে শুয়ে বীণার কর্ম্মনিপুণতা, পারিপাট্য, এই সব দেখ্‌ত। আজকাল মিনুটা পর্য্যন্ত ঠিক সময় পড়া তৈরি ক'রে নিজে কাপড় পরে স্কুলে যায়। লতু ভাব্‌ত আমারই ত এ সব করবার কথা, আমি যদি একদিকে বাড়াবাড়ি না ক'রতাম্ তবে আমারও অসুখ কর্‌ত না, মারও এত অসুখ হত না। সুস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে বীণার কাছে কাছে ঘুরে তার কাজের ভার লাঘব করতে লাগ্‌ল।

এদিকে মনোরমার খুব অসুখ বেড়ে চলেছে। একদিন জ্বরের ঘোরে তিনি বক্‌ছিলেন —"লতু যেন ভাল ক'রে পাশ হয়। বাছার আমার মন ভেঙ্গে যাবে—তা' না হলে। আমরা কষ্ট করে এ বছরটা কাটিয়ে দেব এখন।"—লতু কাছে বসেছিল। উমাতারাও সেদিন বোন্‌কে দেখ্‌তে এসে কাছেই ছিলেন। লতুর চোখ জলে ভ'রে উঠ্‌ল দেখে তিনি তা'কে নিয়ে অন্য ঘরে উঠে গেলেন। বিনু এসে মার কাছে বস্‌লো।

উমাতারা বল্‌লেন—"লতু পরীক্ষা না দিতে পেরে তোমার খুব কষ্ট হয়েছে, না ?"

লতু বল্‌ল—"হঁা, বড়মাসী। কিন্তু মার অসুখের জন্য তার চেয়ে ঢের বেশী কষ্ট হচ্ছে। মা ভাল হবেন না কি ? তিনি কি দেখবেন না যে তাঁর অবাধ্য একগুঁয়ে লতু কত বদ্‌লে গেছে ?"—বল্‌তে বল্‌তে লতু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল।

উমাতারা বললেন—"নিশ্চয়ই ভাল হবেন, তুমি কেঁদো না। তুমিও যেমন

বাড়াবাড়ি করে স্বার্থপরের মত নিজের গোঁ নিয়ে ছিলে, তেমনি তোমার মা'রও যে কিছু অন্যায় নেই, ত'া নয়। তাঁর মন বড় বেশী নরম। তিনি ছেলেমেয়েদের সুখী করবার জন্য, তারা যা' চেয়েছে তাই দিয়েছেন। তাদের আঁড়ালে রেখে নিজের বুক পেতে সব কষ্ট সয়েছেন। তিনি যদি আর একটু কঠিন হয়ে তোমার উপর জোর কর্‌তেন, তা' হলে হয় ত ভাল হত। তিনি যে কতখানি আত্মত্যাগ করেছেন, তা তুমি বুঝ্‌তেই পার নি। সর্ব্বদা মনে করে এসেছ, তোমার ও গুলো পাওনা। তাই এত গোল হয়েছে। লক্ষ্মী মা, আর কেঁদো না। জীবনের পরীক্ষাই সব চেয়ে বড় পরীক্ষা। এতে যা' শিক্ষা পাবে তা' কখনও ভুলিও না। দেখো তোমার কত ভাল হবে।"

[৪]

মনোরমা ভাল হয়ে উঠ্‌লেন। লতু আর বোর্ডিংএ গেল না, কেন না মায়ের শরীর মোটেই সবল নয় যে, একাই সংসার সাম্‌লাবেন। লতু নিয়ম মত স্কুলে যায়, মা, বাবা, ভাইবোনকেও দেখে। কি করে যে সবগুলো সম্ভব হয় এখন নিজেই দেখে অবাক হয়ে যায়।

বীণার বিয়েতে একসপ্তাহ বড়মাসীর বাড়ী গিয়ে সবাই খুব ফূর্ত্তি করে এল। বিয়ের দিন একখানি সুন্দর সাড়ী পরে হাসিমুখে লতু যখন লোকেদের অভ্যর্থনা করে বেড়াচ্ছিল, তখন বিনু পর্য্যন্ত না বলে পার্‌ল না,—"বাঃ লতুটাকে ত বেশ দেখাচ্ছে।"

এমনি করে পরীক্ষা এসে পড়্‌ল। প্রসন্ন মনে লতু পরীক্ষা দিতে গেল। বিনু যখন বল্‌ল,—"দেখিস্ পাশ করিস্ যেন। স্কলারসিপটা ত গেল বছরই ফস্‌কেছে।" তখনও লতুর মুখে হাসিটুকু লেগে রইল।

যখন পরীক্ষার ফল বেরুল ও সেই সঙ্গে জানা গেল লতু মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়ে স্কলারসিপ্ পেয়েছে, তখন বাড়ীতে আনন্দের ধুম্ পড়ে গেল। হরিশবাবু বল্‌লেন,—তোর বোর্ডিংএর খরচ এবার তুই নিজেই দিতে পার্‌বি। লতু বল্‌ল, না বাবা, আমি বাড়ীতে থেকেই পড়্‌ব। নয়ত মাকে কে ভাল করে দেখবে।"

মনোরমা বল্‌লেন্—"ও-ই এখন আমার মা হয়েছে।"

যে মাসে স্কলারসিপের টাকাটা প্রথম হাতে এল, অমনি লতু চুপি চুপি হরিশবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে বাড়ীর সকলের জন্য কিছু কিছু উপহার কিনিয়ে আন্‌ল। সকলেরই আনন্দ ও বিস্ময়ের সীমা রইল না।

তারপর মাসে মাসে স্কলারসিপের টাকাটা পেলেই মায়ের হাতে যখন এনে দিত এবং তাঁর আনন্দদীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌ত, তখনই মনে মনে ভগবানকে প্রণাম করে বলত, দয়াময়, তুমি আমায় কষ্ট দিয়ে যে শিক্ষা দিয়েছ, আর আমার মাকে আমাদের মধ্যে আনন্দ করবার জন্য যে দয়া করে রেখে দিয়েছ, সেজন্য তোমায় কোটি কোটি প্রণাম।"

লাইব্রেরীর ইতিকথা

শ্রীনীহাররঞ্জন রায় এম, এ ; পি, আর, এস্।

পৃথিবীতে বই ছিলনা এমন দিনের কল্পনা সহজে করতে পারা যায় কি ? কল্পনা হয়ত করা যায়; কিন্তু ইতিহাসে যতদূর খবর পাওয়া যায়, অতি প্রাচীনকাল থেকেই, কোনো না কোনো প্রকারের পুঁথির প্রচলন সর্ব্বদাই ছিল। বড় বড় পাথরের উপর খোদাই করে লেখা পুঁথি খুব প্রাচীন কালে মিশরে ছিল এবং প্রথম লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাও বোধ হয় মিশরেই হয়েছিল। সেই সময়কার কয়েকখানি পাথরের টুকরোর উপর লেখা পুঁথিও পাওয়া গেছে। পাথরের টালির একটি লাইব্রেরী মিশরে মাটির নীচে আবিষ্কৃত হয়েছে, বহুসহস্র বৎসরের বালির চাপে ক্রমে তাহা মাটীর এত নীচে চলে গিয়েছিল, যে বহুদিন পর, আজ আবার তা' মাটি খুড়ে বার করতে হয়েছে। পাথর গুলোতে শুধু নানারকমের ছবি আঁকা, এই ছবি গুলোই ছিল তখনকার দিনের অক্ষর। এর ভিতর একটি লাইব্রেরীতে যত বই ছিল পাঠাগারের দেয়ালে তার একটি তালিকাও পাওয়া গেছে।

বাবিলনে যে বেশ বড় ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল—তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। বাবিলন একসময় প্রাচীন জগতে শিক্ষা ও সভ্যতার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল। সেখানকার প্রত্যেক মন্দিরে এক একটী লাইব্রেরীর থাক্‌তো। সেই দেশের প্রাচীন নিপ্পুর সহরে, একটী লাইব্রেরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে ; তাতে দেখা গেছে, বইয়ের পাতাগুলো সব আগুনে পোড়ানো মাটির টালি, একটির পর একটি অতি যত্নে সাজানো, যেন পুঁথির পাতাগুলি পর পর কেউ গুছিয়ে রেখেছে। নিনেভা নগরীতে সম্রাট অসুরবানিপালের অন্যূন দশ হাজার পুঁথির যে বিরাট লাইব্রেরী ছিল, তাহা প্রাচীন বাবিলনের নিপ্পুর লাইব্রেরীর পুঁথিগুলো থেকেই নকল করে লেখা হয়েছিল। মেসোপটেমিয়ায় এক প্রাচীন লাইব্রেরীতে সুমের ভাষার এক সুবৃহৎ অভিধান ও "ইস্তার ও ইস্‌সদুবাল" নামে একখানি অতি সুন্দর সরল মহাকাব্য আবিষ্কৃত হয়েছে। গ্রীকদের আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী তো তখনকার দিনে সমস্ত জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারের সেনাপতি টলেমি মিশর দেশ দখল করেন। এই টলেমিই আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা। এই লাইব্রেরীতে নাকি সাত লক্ষ পুঁথির সংগ্রহ ছিল। কোনো পণ্ডিত বলেন, খলিফা ওমর আলেকজান্দ্রিয়া দখল করবার সময় এই লাইব্রেরীটি পুড়িয়ে দেন। আবার

কেউ কেউ বলেন, সিজার যখন আলেকজান্দ্রিয়ার নৌবহরে আগুন লাগিয়ে দেন, সেই আগুনেই লাইব্রেরীটি পুড়ে যায়। যাক্, আলেকজান্দ্রিয়া ছাড়া গ্রীসে এরিষ্টটল এরও একটা প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছিল; এথেন্সে ইউক্লিড্ ও পেসিস্ট্রেটসেরও সুবৃহৎ লাইব্রেরী ছিল।

রোমে প্রাচীন কালে লেখাপড়ার চর্চ্চা আরম্ভ হয়েছিল, মাসিদন থেকে লুট্‌করে আনা পুংথিসংগ্রহ নিয়ে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এক রোমেই আটাশটি লাইব্রেরী ছিল। একশো বছর আগেও য়ুরোপে বা পৃথিবীর অন্যকোনো স্থানে লেখাপড়া ও জ্ঞানের চর্চ্চার এত সুবিধা ছিল না। এদিকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক ও ভিক্ষুদের যে সংঙ্ঘাশ্রম ছিল, তাতে খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থই স্থান পেতো। সেণ্ট জেরোমের নিজের লাইব্রেরী এবং সম্রাট কনষ্ট্যানটাইনের কনষ্ট্যান্টিনোপল লাইব্রেরী, শুধু এই জাতীয় পুঁথিসংগ্রহের জন্যই প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল।

ভারতবর্ষে খুব প্রাচীন কালে লাইব্রেরীর অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ আমাদের জানা নেই। বৈদিক যুগে বেদই ছিল যাঁদের একমাত্র গ্রন্থ—তাঁদের লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠার কোনো প্রয়োজন ছিল না। লেখাপড়া শেষ করে গুরুগৃহ থেকে শিষ্য যেদিন ফিরে আসতেন সেদিন সমস্ত বেদ তাঁর কণ্ঠে, ওষ্ঠে বিরাজ করতো—তিনি নিজেই তখন একটি লাইব্রেরী। সেই বেদ আবার কারো লিখে রাখ্‌বার নিয়ম ছিলনা, তাহলে অত্যন্ত পাপের ভাগী হতে হতো। ইহাই ছিল প্রাচীন ভারতের নিয়ম বৌদ্ধযুগেও ছিল তাই। খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে চীন পণ্ডিতেরা বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠের জন্য যখন এদেশে এসেছিলেন, তখন তাঁরাও পুঁথি সংগ্রহ করে উঠতে পারেন নি; বৌদ্ধভিক্ষুদের কাছ থেকে শুনে শুনে তাঁদের লিখে নিতে হয়েছিল।

কিন্তু এর কিছুদিন পর থেকেই বোধ হয় মানুষ আর এই অন্যায় নির্দ্দেশ মেনে চলতে রাজী হয়নি। কারণ কিছুদিন পর থেকেই দেখা যায়, বৌদ্ধদের বিহারে বিহারে লাইব্রেরী রাখা, নানারকম হাতের লেখা শাস্ত্রগ্রন্থ নকল করা, সংগ্রহ করা, একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিহার ও আশ্রম অথবা টোল ইত্যাদি ছাড়াও প্রতেক পণ্ডিত-ব্রাহ্মণের ঘরেই একটি একটি লাইব্রেরী থাক্‌তো। এসব কথার প্রমাণ আজকাল ক্রমে জান্‌তে পারা যাচ্ছে। বৌদ্ধভিক্ষুরা বা ব্রাহ্মণ প্রচারকেরা যখন দেশ বিদেশে প্রচার কার্য্য করতে যেতেন, তখন এসব বই তাঁরা সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। তার ফলে এমন হয়েছে যে, অনেক সংস্কৃত অথবা পালি পুঁথি আমাদের দেশে আর পাওয়া যায় না; বহুকাল হারিয়ে গেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের বাইরে চীন, মধ্য এসিয়ার তিব্বত, নেপাল প্রভৃতি দেশে এখন সে সব বই পাওয়া যাচ্ছে। আজকাল পণ্ডিতেরা এইসব হারিয়ে যাওয়া পুঁথিগুলি ক্রমে

উদ্ধার করছেন—কোথাও মরুভূমির নীচে থেকে, কোথাও জীর্ণমন্দিরের গ্রন্থাগারের ভেতর থেকে, কোথাও বা কারো বাড়ীতে কুলুঙ্গির ভেতর থেকে। মুসলমানেরা যখন ভারতবর্ষে অধিকার করতে আরম্ভ করেন, তখন পর্য্যন্তও বৌদ্ধদের অনেক বিহারে বড় বড় লাইব্রেরী ছিল। এক এক বিহারে বড় বড় দিগ্বিজয়ী ভিক্ষু পণ্ডিতেরা বাস করতেন, তাঁরা এক একজন নিজেরাই অনেক বই রচনা করেছিলেন; সেই সব হাতে লেখা পুঁথি সযত্নে লাইব্রেরীতে সাজানো থাক্‌তো। বিদেশ থেকে পণ্ডিতরা এসে, সেই সব বই লিখে নকল করে নিয়ে যেতেন। বিক্রমশীলা বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত আচার্য্য বুদ্ধ জ্ঞানপাদ বারোখানা বই নিজেই রচনা করেছিলেন। মহাপণ্ডিত বৈরোচন রক্ষিত লিখেছিলেন আঠারোখানা; পণ্ডিত জেতারি লিখেছিলেন বাইশ খানা। এইরকম প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পণ্ডিতই অন্তত পাঁচসাতখানা করে বই নিজেরাই রচনা করে গেছেন; সে সব বই নিয়েই এক একটা লাইব্রেরী গড়ে উঠ্‌তো।

মুসলমানেরা অনেক বৌদ্ধ বিহারের লাইব্রেরী পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। নালন্দ ও বিক্রম-শীলার লাইব্রেরী, এবং বাঙ্গলার বরেন্দ্রভূমির জগদ্দল বিহারের লাইব্রেরীও মুসলমানেরাই নষ্ট করে ফেলেছিলেন। এই সময়ে অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিত পুঁথিপত্র নিয়ে, প্রায় সমগ্র লাইব্রেরী কাঁধে ফেলে, নেপালে তিব্বতে পালিয়ে যান; তিব্বত দেশীয় পণ্ডিত তারানাথ বৌদ্ধধর্ম্মের যে ইতিহাস লিখে গেছেন, তার মধ্যে এসব কথা আছে। যা' হোক এরকম করে তাঁরা পালিয়ে গিছ্‌লেন বলেই, আজ পর্য্যন্তও নেপালে বহু পুরাণো সংস্কৃত পুঁথি পাওয়া যায়। আমাদের বাঙ্‌লার সেন রাজাদেরও বোধ হয় একটা লাইব্রেরী ছিল, অন্ততঃ বল্লাল সেনের ত' ছিলই। আর নেপালের লাইব্রেরী তো প্রসিদ্ধ; সেখানে একটু চেষ্টা করলে এখনও ১৪০০। ১৫০০ বৎসরের পুরানো পুঁথিও পাওয়া যায়।

রাজপুতানার প্রত্যেক রাজার কেল্লাতেই এক একটা লাইব্রেরী থাকতো। আলাউদ্দিনের আক্রমণের সময় গুজ্‌রাটের জৈনেরা,তাঁদের বিহার ও আশ্রমের সমস্ত পুঁথি নিয়ে জায়সল্‌মিরে পালিয়ে যান; এখনও সেখানে সেই সব পুঁথি সযত্নে রক্ষিত আছে। তাঞ্জোরে একসময়ে খুব একটী বড় লাইব্রেরী ছিল। শিবাজীর পিতা সাহজী ঐ দেশ জয় করে' সেখানে রাজধানী স্থাপন করবার পর সে লাইব্রেরীর খুব উন্নতি হ'য়েছিল।

মুসলমান সম্রাট্ এবং ওম্‌রাহদেরও লাইব্রেরী থাক্‌তো। মোগল সম্রাটদের এ বিষয়ে খুব খ্যাতি ছিল। পাঞ্জাবের আফ্‌গান শাসন কর্ত্তা গাজী খাঁর একটী ভাল লাইব্রেরী ছিল; বাবর তাঁকে একবার কারারুদ্ধ করে, তার লাইব্রেরীটী আত্মসাৎ করেন। এই উপায়ে তিনি যে লাইব্রেরী গড়ে' তুলেছিলেন, তা' তিনি তাঁর পুত্র হুমায়ুনকে দিয়ে যান। মোগল সম্রাটদের অনেকেই যে লাইব্রেরীতে বসেও পড়াশুনা করতেন, তার
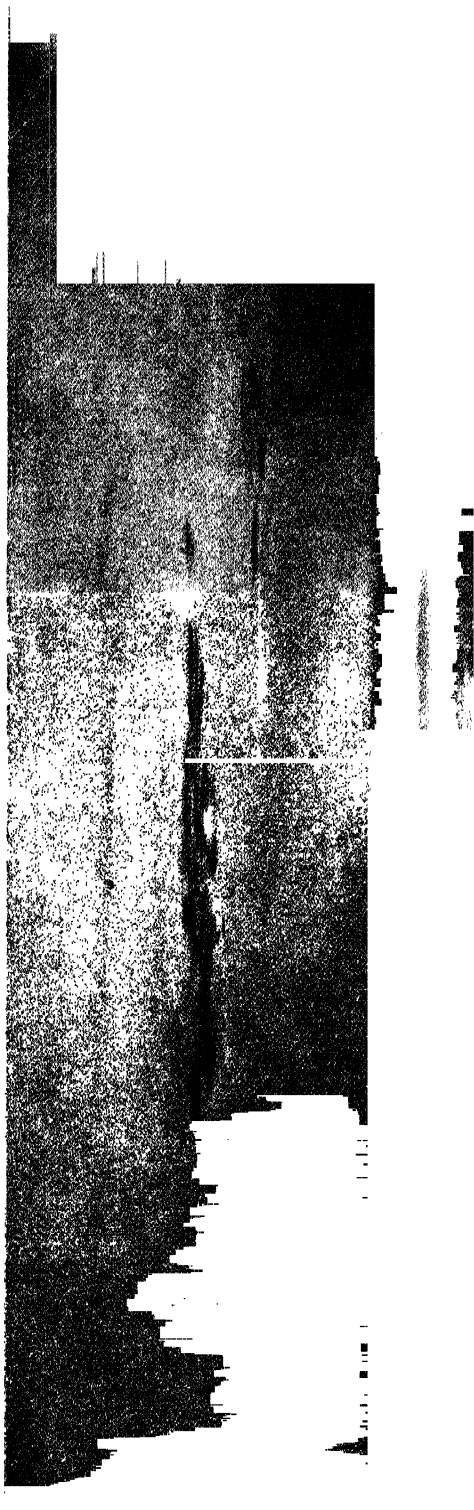
প্রমাণ রয়েছে। সম্রাট হুমায়ুন তো লাইব্রেরীর সিঁড়িতেই পা পিছ্‌লে পড়ে' মারা যান। তিনি যখন যুদ্ধাভিযানে বাহিরে বেরুতেন, তখনও বাছা বাছা বইএর ছোট একটী লাইব্রেরী তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফির্‌তো। সম্রাট আকবরও বই সংগ্রহ করতে খুব ভালবাসতেন, এবং তাঁর একটি বড় ভাল লাইব্রেরী ছিল! মোল্লা পীর মোহম্মদ নামে জনৈক ব্যক্তি এই সময় আকবরের গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন। লাইব্রেরীর বই সাজানোর সুব্যবস্থার জন্য বাঁধা বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। গুজ্‌রাতের ইতিমদ্ খাঁ গুজরাতীর একটী ভাল লাইব্রেরী ছিল; গুজ্‌রাত জয়ের পর আকবর তা' অধিকার করেন। আকবরের সভাকবি ফৈজির লাইব্রেরীতে প্রায় ৪৬০০ বই ছিল। ফৈজির মৃত্যুর পর, তাঁর বইগুলো আকবরের নিজের লাইব্রেরীতে নিয়ে যাওয়া হয়। এইগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা হ'য়েছিল; প্রথম ভাগে কাব্য, সঙ্গীত, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধীয় বই; দ্বিতীয়ভাগে জ্যামিতি, শব্দতত্ত্ব, তত্ত্বচিন্তা, সুফীধর্ম্ম ইত্যাদি সম্বন্ধীয় বই; তৃতীয়ভাগে টীকা, ইতিহাস, ধর্ম্মকথা ও আইন ইত্যাদি। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানেরও খুব ভাল লাইব্রেরী ছিল, এবং নানান রকমের পুঁথি সংগ্রহ ব্যাপারে তাঁরা দুজনেই যথেষ্ট অর্থ ব্যয় কর্‌তেন। মোগল সম্রাটেরা যে শুধু পুঁথিসংগ্রহ ব্যাপারেই খুব উৎসাহী ছিলেন তা নয়; তাঁরা আবার সে সব পুঁথি ওস্তাদ শিল্পীদের দিয়ে চিত্র করাতেন, সুন্দর করে, মুক্তোর মত দেখায়—এই রকম ভাবে নকল করাতেন। বইয়ের পাতায় পাতায় ও মলাটে ছবি আঁকা এবং সুন্দর ছবির মতন অক্ষরে লেখা, তখনকার দিনে একটী বিশেষ শিল্প বলে গণ্য হোতো। তাঁদের লাইব্রেরীর বইগুলো সত্যি সত্যি দেখবার জিনিষ ছিল। হাতের লেখা ছবি আঁকা সেই সব পুঁথি এখনও নানান্ জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়।

এক সময়ে হাজার বারোশ' বছর আগে। কি এদেশে, কি য়ুরোপে, সাধারণ লোকেরা জ্ঞানচর্চ্চা প্রায়ই কেউ কিছু করতো না; সে কাজটা আমাদের দেশে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা, এবং য়ূরোপে খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকেরাই করতেন। সংঘ, বিহার, আশ্রম ইত্যাদি গুলিই জ্ঞানচর্চ্চার একমাত্র কেন্দ্র ছিল। সংঘের সভ্যেরা রোজ নিয়মিত ভাবে পড়াশুনা করতে বাধ্য হ'তেন, তাই ছিল সংঘের নিয়ম। মূল্যবান্ শাস্ত্র ও ধর্ম্মগ্রন্থ সব লিখে' নকল করে, সংঘের পুঁথি সংগ্রহ বাড়ানো ছিল এঁদের অন্যতম কর্ত্তব্য; তা'তে আশ্রম জীবনের কঠোরতাও কতকটা লাঘব হ'তো। এই হাতে লেখা পুঁথিগুলোকে এঁরা এতো মূল্যবান মনে করতেন যে, সকলে তা' ব্যবহার করবার অনুমতি পেতো না। সে সৌভাগ্য হয়ত বা যাদের হোতো, তাদেরও অনেক কঠোর নিয়ম মেনে চল্‌তে হ'তো। কোনো কোনো বইয়ের প্রথম পাততেই লেখা থাক্‌তো।

"যে কেউ এই বই পড়বেন, তাঁ'কে অত্যন্ত যত্নে ও সাবধানে এ'র পাতা উল্টাতে

হবে, এবং ভগবান ঈশা যা' যা' ক'রতেন, অত্যন্ত সম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধায় তাঁরই অনুকরণ ক'রতে হবে। তিনি অত্যন্ত সাবধানে এইখানি খুলে মনোযোগ দিয়ে প'ড়তেন, এবং পড়া শেষ হ'লে—শ্রদ্ধায় ধীরে ধীরে তা' জড়িয়ে নিয়ে, সংঘকর্ত্তার হাতে তুলে' দিতেন।

"তোমার আঙ্গুলগুলো কখনও আমার লেখার উপর রেখোনা। এক একটি করে' প্রত্যেকটি অক্ষর ধরে ধরে লিখতে কত যে কষ্ট ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন, তা' তুমি বুঝ্‌বে না। লিখ্‌তে লিখ্‌তে পিঠ ধরে যায়, দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসে, বুকের ছাতি ও পাকস্থলী বেদনায় পীড়িত হয়ে পড়ে।"

বহুদিন পর্য্যন্ত লাইব্রেরীর জীবন এইভাবেই চলেছিল। হাতে লেখা পুঁথি একটী একটি করে অনেক কষ্টে সংগ্রহ করতে হোতো; হয়ত সে পুঁথির অন্য কোন নকলই আর থাক্‌তো না। একবার আগুনে পুড়ে গেলে, অথবা অন্য কোন উপায়ে নষ্ট হয়ে গেলে, আর তা' ফিরে পাবার উপায় থাকতো না। এই হাতে লেখা পুঁথি লেখা হ'তো সাধারণতঃ তালপাতায় অথবা তুলোট্ কাগজের উপর। কেউ কেউ আবার তামার পাতের উপর অথবা কাঠের ফলকের উপরও খোদাই করে রাখতেন, এবং তাই একটির পর, একটি করে সাজিয়ে একটি সমগ্র পুঁথি হ'তো। পোড়া মাটির উপরও যে লেখা হ'তো, সে কথা আগেই বলেছি। কিন্তু খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দিতে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে এই ছাপানো কাজটা যখন ক্রমে সহজ হ'য়ে উঠ্‌লো, তখন লাইব্রেরীর জীবনকথার এক নবযুগ আরম্ভ হ'লো; একটি পুঁথি নানান্ দিকে ছড়িয়ে প'ড়লো, জনসাধারণের জ্ঞানচর্চ্চা সহজ ও সুলভ হয়ে উঠলো, এবং লাইব্রেরীর বহুল প্রতিষ্ঠা ও প্রসার আরম্ভ হলো।

সৌভ্রাত্র।

(বিদেশী কবিতার ভাবানুবাদ)

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর।

কন্‌কনে শীত, মেঘ্‌লা মাঘের রাত
হয়ে গেছে মাঠে ধানকাটা সব সারা ;
নিজ নিজ ধান করেছে খামার জাত
এখন কেবল বাকী আছে শুধু মাড়া।
সহসা জাগিয়া বড়ভাই সেই রাতে
ভাবিল, "যে ধান পেয়েছে ভাইটি মোর,
হয়ত তাহার বছর যাবেনা তাতে।"
বিছানা ত্যজিল রাত্রি না হ'তে ভোর।
কন্‌কনে 'জাড়ে' চোরের মতন গিয়া
খামার হইতে লয়ে ধান বোঝা ছয়,
গোপনে ভায়ের খামারে আসিল দিয়া,
ভায়ের স্নেহটি এমনি গোপনে বয়।

ঠিক সেই রাতে জেগে উঠে ছোট ভাই
ভাবিল 'দাদার সংসার চলা ভার,
ঐ কটি ধান—অন্য উপায়ও নাই,
ছেলেপুলে লয়ে কেমনে চলিবে তার'?
উঠে ধীরে ধীরে কম্বল গায়ে মুড়ে
বোঝা ছয় ধান খামার হইতে লয়ে,
চুপেচুপে গিয়ে দাদার ধানের কুড়ে
দিয়ে এল ভাই মাথায় করেই বয়ে।

আপন আপন খামারে যাইয়া প্রাতে
গুণে দেখে বোঝা যেমন তেমনি রয়,
ভাবে দোঁহে, তবে স্বপন দেখিল রাতে?
বারবার গোণে বেড়ে যায় বিস্ময়।

বৃদ্ধ মোড়ল একথা শুনিল যবে
দাড়ী বেয়ে তা'র দরদর ধারা বয়,
বলিল—"বাপু হে এমনিটি হয় যবে
দুটী হৃদি প্রেমে সমান পূর্ণ রয়।"
দুইজনে ডাকি কহে বুড়া তারপর,
একই গৃহে রও আজি হ'তে দুই ভাই,
আজ হতে হোক্ তোমাদের কুঁড়ে ঘর,
সকল ভায়ের দীক্ষা নেবার ঠাঁই।"

টাকের মহৌষধ

শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দাশ গুপ্ত

ষ্টেসনে শনিবারের ভিড়। বেশির ভাগই আফিস-ফের্‌তা প্যাসেঞ্জার। ক্যানিং-লাইনের ২টা ৪৮ মিনিটের গাড়ীতে ইণ্টার-ক্লাশের দুইখানি বেঞ্চি জুড়িয়া পাঁচ-ছয়-জন আফিসের বাবু বসিয়াছিল। উহাদের বয়সের তফাৎ থাকিলেও, রোজই এক সঙ্গে চলা ফেরা এবং এক আফিসে কাজ করার ফলে অতি ঘনিষ্ঠতায় আলাপ-ব্যাবহারে মুখের পর্দ্দা ঘুচিয়া গিয়াছিল। দলের মধ্যে জটু ও হাবুল ছিল বয়সে সকলের ছোট। কিন্তু কথাবার্ত্তায় ও চাল-চলনে বড়দের মাথায় তারা চাঁটি মারিয়াই চলিত।

বঙ্কিম জানালার কাছে বসিয়া 'আনন্দ বাজার পত্রিকা' পড়িতেছিল। হঠাৎ পড়া বন্ধ করিয়া সে হাবুলকে বলিল—"ছাখ্‌তো, হাবুল, ঘড়িটা। সতুর যে এখনও দেখানাই।" হাবুল নিঃশব্দে বামহাতের কব্‌জিখানা উঁচু করিয়া বঙ্কিমের নাকের কাছে ধরিল। বঙ্কিম সেই কব্‌জিতে বাঁধা রিষ্ট ওয়াচের দিকে দৃষ্টি দিয়া বলিল—"২টা ৪০ মিনিট হ'য়ে গেল! সতুর মত্‌লবখানা কি? গাড়ী ফেল করবে নাকি?"—বলিয়াই সে উৎসুক ভাবে জানালায় ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্লাট্‌ফর্ম্মের দিকে চাহিয়া রহিল।

একটু পরেই দুই হাতে লাটবহর লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সতীশ প্লাট্‌ফর্ম্মে আসিয়া দেখা দিল। জানালা হইতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া বঙ্কিম চেঁচাইয়া উঠিল—"এদিকে, সতু, এদিকে।"

সতীশের এক হাতে ছিল দুইটা কাগজের ঠোঙ্গা,—তাহাতে আঙ্গুর ও ডালিম,—আর এক হাতে ঝাড়নে বাঁধা আলু-পটল-বেগুনের-পোঁট্‌লা। হাতের বোঝা বাঙ্কের উপর রাখিয়া দিয়া সে যেন বঙ্কিমের মনের প্রশ্নের উত্তরেই বলিতে লাগিল—"ঘুরে ঘুরে কি কম হায়রানটা হ'তে হয়েচে! বড় ছেলেটার জ্বর, আঙ্গুর কিন্‌তে হ'লো হ্যারিসন রোড়ের মোড়ে তারপর আবার বেদানার জন্যে ছুটোছুটি। ব্যাটারা দর হাঁকে কি না আড়াই টাকা! মারি লাথি তোর আড়াই টাকায়! মাসকাবারের মুখ,- বেদানা, না, ঘোড়ার ডিম্‌! - এই ডালিমই আমার বেদানা। ডালিমের দরটাও বেশ সুবিধে বৌ-বাজারের মোড়ের ফুটপাথের মাল--আট আনা সের মিলেচে। হেঁকেছিল বটে দশ আনা। আটটা পয়সা

কমাতে কি কম বকাবকি কর্‌তে হয়েচে! গাড়ীর সময়ত উৎরে যায়—তেতে-পুড়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে আস্‌তে প্রাণ শেষ! বাবাঃ! যে রদ্দুর!"

সত্যই এতক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সতীশের সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল। তার উপর তার মাথাজোড়া ছিল টাক। টাকের ঘাম ইলিস-গুঁড়ি-বৃষ্টিতে-ভিজা-ফুটপাথের পাশের নর্দ্দমার জলের মত তার কপাল বাহিয়া নাকে মুখে গড়াইতে লাগিল। জানালার কাছে গিয়া সতীশ হাতদিয়া মাথার ঘাম একবার ঝাড়িয়া ফেলিল! তারপর সেইখানেই বেঞ্চিতে বসিতে বসিতে বলিল—"পা দুটোকে একটু টেনে বোস্‌ দেখি, বীরু। হাওয়ায় ব'সে মাথাটা ঠাণ্ডা ক'রে নি।"

মাথাটা ঠাণ্ডা করার কথা শুনিয়া সকলের দৃষ্টি পড়িল সতীশের দিকে। তখনও তার মাথা হইতে দরদর করিয়া ঘাম ঝরিতেছিল। জটু একটুকাল সেদিকে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ হিঃ হিঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর বলিল বাঃ সতু-দা! শোভাটী হয়েচে তো বেশ—যেন জোয়ারে-ভাসা—পদ্মার চরের কুষ্মাণ্ড!"

সতশী ইয়ার্কীর ধমক দিয়া বসিল—"কুষ্মাণ্ড বলিস্‌ কাকে রে অকালকুষ্মাণ্ড? মাথাটা একবার জুড়াতে দে। তারপর এই ঘাম-মজানো টাকের কাছে তোর বড়বাবুর ঘরের-জোড়া ফ্যানের হাওয়া কোথায় লাগে, দেখে নিস্‌।"

বড়দেরদলের অক্ষয় বলিল—"টাককে তোরা এত হেলা-ছেদ্দা করিস্‌ কেন? জানিস্‌ তো টাকের উপকার—ওতে মগজ ঠাণ্ডা রাখে।"

হাবুল অক্ষয়ের কথায় ফোঁড়ন জোগাইয়া বলিল—"আর পয়সার উপকারটাই কি কম?-তেলের দিক দিয়ে লাভ, নাপিতের দিক দিয়ে লাভ, আর আগাগোড়াই লাভ চিরুণী-বুরুষের চারিদ্দিকেই একদম নিখরচা।"

জটু হাবুলকে বলিল—"আর একটা লাভের কথা বল্‌লি নে যে?—কন্‌সার্ট পার্টির লাভ! বাঁয়া তবলার খরচা নেই,—ওরকম একটা মাথা হাঁটুর মাঝে টেনে নিয়ে তবলার চাঁটি মারলেই হ'লো—গুম্‌ গুম্‌ গুম্‌। তাধিন্‌ তা গুম্‌।" কথার সঙ্গে সঙ্গে সে বামহাতের তালুতে ডান্‌হাতের চাঁটি দিয়া ও বাজ্‌নার শব্দটা মুখে বাজাইয়া বুঝাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে তখনই আবার বলিয়া উঠিল, অমন মাকুন্দো মাথায় চাঁটি মেরে কি হাতের সুখও কম!

বঙ্কিম এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল। সে দেখিল জটু ও হাবুল কথার পাল্লা দিয়া যে ভাবে সতীশ বেচারার মাথাটাকে লইয়া পড়িয়াছে তাহাতে তার পক্ষে একটু ওকালতী করার দরকার। তাই সে টাকের প্রশংসা করিয়া বলিল—"টাকে টাকা টেনে আনে, আর টেকো মাথা বুদ্ধিমানের লক্ষণ।"

বঙ্কিম যাহার পক্ষে ওকালতী করিয়া কথাটা বলিল, সেই সতীশই কিন্তু তার প্রতিবাদ করিয়া উঠিল ;—সে বলিল—"আর যাই কেন বলো না, বন্ধু, ঐ কথাটী ব'লো না। জানো তো, কি ঠকাই না ঠকেচি দু-দুবার !"

"কিসের ঠকা দু-দুবার ?' জটু ও হাবুল সতীশকে ধরিয়া পড়িল—"বলো দেখি, সতুদা, ব্যাপারখানা কি ?"

সতীশ বলিল—"শুন্‌তে চাস্‌ সে ব্যাপার ? আচ্ছা বল্‌ছি ! আমার সে ঠেকে শেখার কথা শুনলে তোদের হয়তো উপকারও হবে। কিন্তু কথা দে, আফিসে আবার এ নিয়ে গপ্প টপ্প কর্‌বি না।

জটু ও হাবুল দুই জনেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল "না না, সতুদা, এই তোমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর্‌চি,—এই মুখে কখনও টুঁ শব্দটী শোন তো, আমাদের দু' কান ম'লে দিও।"

বঙ্কিমের সে পুরাণা ব্যাপার অজানা নাই। তবু সেই শোনা কথাই আবার শোনার আগ্রহে সে কাণ খাড়া করিয়া রহিল।

গাড়ীছাড়ার ঘটাং ঘটাং শব্দের সঙ্গে সতীশের কাহিনী আরম্ভ হইল।

২

সতীশ বলিতে লাগিল—"তখন সবে রেলীর বাড়ীর চাকরীতে এপ্রেণ্টিস্‌ হ'য়ে ঢুকেছি ! যাঁর সুবাদে কাজে ঢোকা, দুদিন বাদেই তিনি হঠাৎ মারা গেলেন। গোড়া হ'তেই বড় বাবুর আমার ওপর তেমন সুনজর ছিল না, মুরুব্বি যখন হারালেম, তখন নজরটী স্পষ্টই কু হ'য়ে উঠ্‌ল। কিছু বল্‌তে গেলেই তিনি মুখ খিচিয়ে উঠ্‌তেন, আর সব সময়েই কাজকর্ম্মের ভুল ধরতেন। মাস দুই পরে একদিন বিকেল বেলা হঠাৎ বড়বাবুর জরুরী সেলাম পেলেম। ভয়ে ভয়ে আমি তাঁর আফিস ঘরে [illegible] বল্‌লেন—'সতীশ বাবু একটা দায়ে ঠেকেছি। আপনাকে ছাড়া আর কাউকে দিয়ে আমার এ দায় উদ্ধার হবে না। আর আপনার মত বিশ্বাসী নেইও তো কেউ—য র ওপর এ কাজের ভার দেওয়া চলে। পার্‌বেন একটু কষ্ট ক'রে আমার কাজটা কর্‌তে ?' বড়বাবুর মিঠে কথায় আমি ভুলে গেলাম। বল্‌লেম—'কি কাজ, বলুন। তিনি কাজটা বুঝিয়ে দিলেন—একখানা চিঠি নিয়ে যেতে হবে মির্জ্জাপুর পার্কের নিকটে এক গলিতে। চিঠিটী দিতে হবে এক তারাপদ চাটুজ্যের হাতে। তাকে নাকি সাতটার আগে বাড়ীতে পাওয়া যায় না। বড়বাবুর নিজেরও ওর আগে কি এন্‌গেজমেণ্ট্‌, তাই তিনি নিজে যেতে পারলেন না, ইত্যাদি।

বড়বাবুর চিঠিটা হাত পেতে নিলেম। তিনি আমার হাতে ট্রামের ভাড়া দিয়ে

বল্‌লেন—'আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়ে নেমে একটুখানি হেঁটে যাবেন,—পার্কের সাম্‌নেই গলি।' বার বার সাবধান ক'রেও দিলেন, চিঠিটা যেন আর কাউর হাতে না পড়ে, তারাপদর নিজের হাতেই দেওয়া চাই, কারণ চিঠিটায় পরের দিন ভোরে বড়বাবুর সঙ্গে তার দেখা করার কথা লেখা আছে। আমি রওয়ানা হওয়ার আগে তিনি আমার পিঠ চাপ্‌ড়েও দিলেন; বল্‌লেন—'একটু কষ্ট দিলেম, সতীশবাবু। মনে কিছু কর্‌বেন না।'

বড়বাবুর হাতের পিঠ থাব্‌ড়া খেয়ে আমি তখন আহ্লাদে আটখানা। তখন মনেই হ'লো না, সাতটার সময় চিঠীটা দিতে হ'লে আমাকে ধরতে হবে সেই আট্‌টা পঞ্চাশের গাড়ী, আর বাড়ী পৌঁছাতে রাত প্রায় এগারটা। ভাব্‌লেম, আমার মত বিশ্বাসী আর কেউ নেই, বড়বাবু তো নিজ মুখেই স্বীকার করেচেন। দেবেনটার আজ মুখ ভোঁতা! ওর ভারী দেমাক! ভাবে বড়বাবু তাকে ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করেন না! কাল যখন সব কথা শুন্‌বে তখন বুক চাপ্‌ড়ে মর্‌বে আর কি! হাঃ হাঃ! এবার আমার পাকা চাকরী মারে কে?

চিঠী নিয়ে রওয়ানা হলেম। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়ে গিয়ে নেমে মির্জাপুর পার্কের দিকে যাচ্ছি; চাঁপাতলার কাছাকাছি এগোতেই ইয়া-লম্বা-দাড়ি এক বুড়ো কোত্থেকে এসে হঠাৎ আমার দু কাঁধের ওপর দু হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে হাসিমুখে ব'লে উঠ্‌ল—'You are becoming bald-headed! Your good days are coming! বড়ই খুশী হলেম আপনাকে দেখে, মশায়।' চেনা নেই, শোনা নেই, পথের মাঝখানে এ কি আলাপ! আমি অবাক্ হ'য়ে থম্‌কে দাঁড়ালেম। একবার মনে হ'লো—আমারই ভুল হ'লো নাকি! হয় তো চেনাশুনাই কেউ হবে। আমি ঠাউরে ঠাউরে তার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম কে সে! লোকটী কিন্তু আমার ভাব দেখে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাস্‌তে লাগ্‌ল। তার পরেই আবার বল্‌ল—You have been rather astonished! টাকের কথা শুনে বুঝি মনে হচ্ছে—এ লোকটা বলে কি! বল্‌চি যা' তা' বেদবাক্য। আপনার মাথায় টাক পড়েচে—সে খবর তো আপনি রাখেন, কিন্তু ওটা যে পদ্ম টাক, না শঙ্খ টাক, তার কিছু বোঝেন?'

আমার মাথায় তখন এখনকার মত টাকটী গোলগাল না হ'য়ে থাক্‌লেও টাকের খাঁজ পড়েছিল ব্রহ্মতালুতে; আর সেটা দেখতে হয়েছিল ঘাস মাড়ানো গরু চলা পথের মত। আমি আশেপাশের চুল লম্বা ক'রে কেটে টাকটীকে বুজিয়ে রাখ্‌তেই চেষ্টা কর্‌তেম। তাতে মাথার কি শ্রী দাঁড়াত, না দাঁড়াত, সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। আর লক্ষ্য থাক্‌লেও, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম যে আবার টাকের লক্ষণ হয়, তা' জান্‌ত কে?

পদ্ম টাকে আর শঙ্খ টাকে কি তফাৎ, আমি কিছু বুঝ্‌তে না পেরে চুপ করে দাঁড়িয়েই

রইলেম। লোকটী আমার ভাব দেখে, গম্ভীর হয়ে বল্‌ল—'আমি কি বল্‌চি আপনি বুঝি বুঝ্‌চেন না? বল্‌চি গ্রহ জ্যোতিষের কথা। আসুন, আপনাকে হাতে নাতে সব দেখিয়ে দিচ্ছি।'—বলেই সে আমার ডানহাতখানা টেনে নিয়ে আমারই মাথায় বুলাতে লাগ্‌ল; সঙ্গে সঙ্গে কত কি বুঝাতে লাগ্‌ল—ভুরুর মাঝখান হ'তে ব্রহ্মতালু পর্য্যন্ত নাকি পদ্মের নালের মত একটা নাল আছে, তাকে বলে ব্রহ্মনাল; সেই নালের একমুখে ঠিক ব্রহ্মতালুর উপরে সহস্রদলপদ্মের মত হ'য়ে যদি টাক পড়ে তবেই হয় পদ্ম টাক। আমার মাথায় নাকি পদ্ম টাকেরই লক্ষণ। আমার মাথায় আমারই হাত বুলিয়ে সে যে কি দেখাল ভগবানই জানেন! দেখানো শেষ ক'রে হাতটাকে ছেড়ে দিতে দিতে বল্‌ল—'দেখ্‌লেন তো সহস্রদল-পদ্ম কেমন দল মেলে ফুটে উঠ্‌চে। ও কি আর চর্ম্ম চক্ষুতে ধরা পড়ে, মশায়! ও সব দেখ্‌তে হলে' চাই দিব্য চক্ষু। নইলে সাধে কি, মশায়, দশ-দশটী বচ্ছর, হরিদ্বারে কুম্ভকানন্দ স্বামীজীর গাঁজা টিপে কাটিয়েছি!' তারপর আমার পদ্ম টাকের ব্যাখ্যানা ক'রে স্পষ্ট ক'রেই বল্‌ল—'ওটা রাজলক্ষণ—অতি শুভ—অতি শুভ। আপনার সুদিন আস্‌চে, মশায়। এই সুদিন আট্‌কায় ব্রহ্মার বাবা বিষ্টুরও এমন সাধ্য নেই।'

এতদিন বড়বাবুর ধমক খেয়েই এসেচি। তাঁর আগের ব্যবহারের সঙ্গে সেদিনের ব্যবহারের তুলনা ক'রে আমারও মনে হ'লো, হয় তো এই রাজলক্ষণই তার কারণ। যার সঙ্গে সৌভাগ্যের এমন যোগাযোগ সেই মাথার ওপর, তখন নিজেই আমি ধীরে ধীরে হাত বুলাতে লাগ্‌লেম। লোকটী এই দেখে বল্‌ল—'মাথাটাকে আকাশের তলে খোলা রাখ্‌তেই চেষ্টা করবেন। স্বাতী নক্ষত্রের জল ঝিনুকে পড়্‌লে মুক্তো হয়, শুনেচেন তো? এ ও সেই কথা। স্বাতী নক্ষত্রের আলো মাথার ওপর যত পড়্‌বে ততই সহস্রদল পদ্ম দল মেলে ফুটে উঠ্‌বে। আর যেদিন পদ্মটী সম্পূর্ণ ফুট্‌বে সেদিন আপনার রাজসিংহাসন লাভ।'

কার কপালে কি আছে কে জানে? আমি ভাব্‌লেম—লটারীতেও তো শুনি, ঝাড়ুদার লাখটাকা পায়। রাজসিংহাসনের কথাটা নয় ভুয়োই হ'লো, রেলীর বাড়ীতে যে আমি পাকা হ'তে পারি তার লক্ষণ তো একটু দেখাও যাচ্ছে। সত্যি সত্যিই হয় তো সুদিন আমার আস্‌চেই।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুদিনের স্বপ্ন দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। চমক ভাঙ্গ্‌লো লোকটীর প্রশ্ন শুনে। একবার প্রশ্নে সে জান্‌তে চাইল আমার নাম ধাম আর পেশা কি।

প্রশ্নের জবাব ঠিক ঠিকই দেওয়া গেল। তারপর ভব্যতার খাতিরে নিজেও বল্‌লাম—'মনে কিছু করবেন না। আপনি গুণী লোক। আপনার পরিচয়টা জেনে রাখ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে।'

সে বিনয় ক'রেই জবাব দিল—তার আবার একটা পরিচয়! সন্ন্যাসী মানুষ ব'লেই

তাকে ভাবা ভালো, কেন না হরিদ্বারে কুম্ভকানন্দ স্বামীজীর চেলাগিরিতে তার দশ দশ বচ্ছর কেটেচে। তবে সংসার আশ্রমের ঠিকানাটাও জানাতে কসুর কর্‌ল না। কিন্তু সংসার নাকি অসার, সেখানে তার মন নেই—ত্রিশ বছরের যোগ্য পুত্র চবিবশ ঘণ্টার ভোগে তাকে ফাঁকি দিয়ে জন্মের মত পালিয়েচে। এই যোগ্য পুত্রের কথা বলার সময়, আমি দেখ্‌লেম সত্যিই তার চোক জলে টলমল কর্‌চে।

তার সংসার আশ্রমের পরিচয়টা আরও একটু প্রকাশ পেল, তার আর এক ছেলের কথায়। সে ছেলেটী সেবার নাকি ম্যাট্রিক্ পাশ দিয়েচে। ধ'রে-প'ড়ে ফ্রিতে তাকে 'বঙ্গবাসী'তে ভর্ত্তি ক'রেও দেওয়া হয়েচে। কিন্তু বইয়ের খরচা কুলায় কে?

'দেখ্‌বেন বইয়ের লম্বা লিষ্টি!'—ব'লেই সে পকেট হইতে একটা কাগজ বের কর্‌ল। তাতে অনেক বইয়ের নাম লেখা। সেই লিষ্টিটা আমাকে দেখিয়ে সে বল্‌ল—'কমসে কম পঞ্চাশ টাকার বইয়ের দরকার। শিষ্যেরা সব চেঞ্জে গেছে। সাম্‌নে থাক্‌লে আমাকে কিছুই ভাব্‌তে হতো না। কিন্তু বিদেশে গিয়ে তারা নিজেরাই জড়িয়ে রয়েচে। এ সময় তাদের কাছে কি এ সব জানানো যায়! আপনিই বলুন মশায়, আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার মুখে কি তা' শোভা পায়!' বল্‌তে বল্‌তেই চট্ করে আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধ'রে বল্‌ল—'আছে কেউ আপনার জানাশুনা, মশায়? দিতে পারেন দু'চারখানা পুরানা বই জোগাড় ক'রে?'

হঠাৎ তার প্রশ্ন শুনে আমি থতমত খেয়ে গেলাম। দু চারটা ঢোঁক গিলে, আম্‌তা আম্‌তা ক'রে, তাকে জবাব দিলেম—'নাঃ। আমার তো তেমন জানাশুনা কেউ দেখ্‌ছি না।'

সে বল্‌ল -'ঐ তো আপনার কথা! জানাশুনা নাই বা থাক্‌লো! আপনি নিজেই তো হাজার হাজার লোকের জানা—রাজ-চক্রবর্ত্তী। শীঘ্রই তো সে দিন আস্‌চে, যখন লাখো লাখো টাকা আপনি দান খয়রাতে দিবেন! আর আজ দশ বিশটা টাকার জন্যে আপনি কিপ্‌টে নাম কিন্‌বেন? ইচ্ছে কর্‌লে এ কয়টা টাকার বই দিতে আপনার কতক্ষণ। দিন্ দিন্ না, মশায়, বইয়ের দামটা। পকেটে আছে তো টাকা? আমি ব্রাহ্মণ, মিছে বল্‌বেন না।'

মিছেই বা কি আর সাচাই বা কি, তখন আমার মুখে রা-ই সর্‌ছিল না। শুধু একবার মনে হ'লো—একি ধান ভান্‌তে শিবের গীত।

লোকটী নিজেই আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—আমি বল্‌ছিই তো আপনি রাজা হবেন। একটী ব্রাহ্মণের ছেলের উপকার হবে যা পারেন, নয়, তাই দিন্। দশটা না থাক্ পাঁচটা?—না থাক্ দুটো টাকাও তো সঙ্গে আছে। সেই দুটো টাকাই নয়

দিন্। ব্রাহ্মণকে নিরাশ কর্‌বেন না—শাপ লাগ্‌বে। তখন শাপের ফল যা'হবে, তা, তো বোঝেনই—কপালে যত সৌভাগ্যের চিহ্নই থাক্ না কর্পূরের মত উবে যাবে। তখন বিষ্টুরও সাধ্যি নেই তা, ঠেকায়।'

শাপ মন্যুর ভয়ে আমি ভড়্কে গেলাম। কিছু না বলে—কয়ে পকেট হ'তে মনি-ব্যাগটা বের ক'রে তা খুলে সমস্তই উজোর ক'রে ঢেলে দিলাম তার হাতে।"

এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াই সকলে সতীশের গল্প শুনিতেছিল। মনিব্যাগ উজার করিয়া ঢালিয়া দেওয়ার কথায় তাহাদের চমক ভাঙ্গিল। সকলের আগে হাবুল চেঁচাইয়া উঠিল—-আঁা! ঢেলে দিলে মনিব্যাগটা উবুড় করে' সমস্তই' ··

জটু হাবুলের কথাটা শেষ করিয়া দিল—"সেই বদমাইসটার হাতে!"

সতীশ বলিল "হ্যা। তবে মণিব্যাগটায় বেশী কিছু ছিল না, গণ্ডাদশেক পয়সা হবে। লোকটা কিন্তু তা' পেয়েই খুসী।

বীরু বলিল -"খুশী হবে না! চোরের রাত্তির বাসই লাভ।"

হাবুল মিনিট খানেক গুম হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর বীরুর কথার খেই ধরিয়া বলিয়া উঠিল—"খুশী! ব্যাটা জুচ্চোরের ধাড়ি! আমি হ'লে ঘুসি মেরে দাঁত ভেঙ্গে দিতেম।

জটু বলিল—"আর গুণে গুণে মুখের পরে পটাপট চটি চালাতেম একশো-বার।"

সতীশ বলিল—"তা' হয় তো কর্‌তিস্ কিন্তু আমার মনের ধোঁকা তখনো তো কাটেনি! বড়বাবুর মন-ভোলানো কথার রেশ ল্যাজে খেল্‌ছিল কি না, তাই আবু-হোসেনের স্বপ্নটাই ছিল মগজ ছেয়ে! সেই বড়বাবুটীও যে কি খেলাই খেল্‌ছিলেন তা, যদি আগে বুঝ্‌তেম। তার চিঠিটায় ছিল আমারই মৃত্যুবাণ। নিজের মৃত্যুবাণ আমি নিজেই ব'য়ে বেড়িয়েছিলেম। সে কি ব্যাপার জানিস? পরের দিন আপিসে গিয়ে আমি নোটীশ পেলাম "Your services are no longer required!" আর আমার জায়গায় ভর্ত্তি হলো -সেই মির্জাপুর পার্কের কাছের গলির তারাপদ—বড়বাবুর জামাই। কাজটা নাকি আগে তার জন্যই ঠিক ছিল—কিন্তু হ'তে হ'তে আমার জন্য ফস্‌কে গিয়েছিল। তাই বড়বাবু বোড়ের চাল চেলে কিস্তি মাৎ করে নিলেন! আমাকেই দিয়ে তাকে ডেকে পাঠালেন, আর ভোর বেলা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়ে চাকরীটা পাকা ক'রে দিলেন।"

বড়বাবুর কীর্ত্তি শুনিয়া হাবুল কপালের উপর বামহাতের এক চাপড় দিয়া বলিল—

অবাক্ করলে সতুদা, তোমার কীর্ত্তিমান এ বড়বাবুর কাহিনী শুনিয়ে! ব্যাটা ভিজে বেড়াল, —পেটে পেটে ছিল এত সয়তানী বুদ্ধি!"

জটু বলিল—দেবতার বাজও পড়ে না এমন লোকের মাথায়।"

সতীশ বলিল বাজ যার মাথায় পড়বার তারই পড়্ল। পদ্মটাকে রাজ-লক্ষণের ফল হাতে হাতেই পাওয়া গেল।

দশ গণ্ডা পয়সাও গেল, তার সঙ্গে চাকরীটীরও দফা রফা রফা।" তারপর বঙ্কিমের দিকে ফিরিয়া সে বলিল—"কেমন, বন্ধু, টাকে টাকা আনে, না টাকা খুয়া যায়—কোনটা সত্যি ?"

বীরু এতক্ষণ মনে মনে কি আলোচনা করিতেছিল। সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল -"আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ! এমন ঠকাও মানুষে ঠকে!"

সতীশ উত্তর দিল এ ঠকাতো শুধু গেছে টাকার ওপর দিয়ে। আর এক ঠকা যা ঠকেছি, তা' যে গতর ধ'রেও টান মেরেছিল। সেই ঠকার কথায়ই তো বল্‌ছিলেম অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি ?"

বীরু বলিল—"আচ্ছা, বলো, সে কেচ্ছাটাও একবার শোনা যাক্।"

"শোন্ তবে"—বলিয়া সতীশ আর এক কাহিনী সুরু করিল।

[৩]

"এ ব্যাপারটা তেমন বেশি দিনের নয় মাস-ছয়েক আগেকার কথা। তখন সহস্রদল পদ্মটী সহস্রটী দল মেলেই হয়তো ফুটে উঠেচে—ফলে আমার কপাল হ'তে ঘাড় পর্য্যন্ত চিলিক মারচে ধর্ম্মতলার এস্, রায় কোম্পানীর ৪নং ফুটবলটী। ঘোষেদের বাড়ী বিয়ে—দেশ বিদেশের আত্মীয় কুটুমের বাজার সেখানে। পড়্শী হিসেবে বৌভাতের নেমন্তন্ন পেলুম। কাজকর্ম্মের বাড়ী একটু কাজকর্ম্ম দেখে শুনে আর নেমন্তন্ন খেয়ে গিন্নির ফির্‌তে রাত হ'লো। আমি ঘরে বসে বাজার হিসাবটী মিলাচ্ছি, গিন্নী এসেই নেমন্তন্নর কাপড়-চোপড়েই ব'সে পড়লেন আমার বিছানা ঘেঁষে। তারপর দু'এক মিনিট আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বল্‌লেন—হ্যাঁগা, বল্‌ছিলেম কি, একটা কুষ্টি টুষ্টি রাখনা কেন ?'

একি কথা! আমি অবাক হ'য়ে গিন্নীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেম। তিনি বল্‌লেন—"মুখের দিকে তাকাচ্ছ কি? তোমার একটা কুষ্টি থাক্‌লে পোড়ারমুখীদের ধ'রে দেখাতে পার্‌তেম না নাকের ডগায় কার কি বয়েস ?

আমি বল্‌লেম—"বিয়ের বাড়ীতে বয়সের ব্যাপারটা কি হ'লো, খুলেই বলোনা, ছাই।"

গিন্নী বল্‌লেন—"ঘোষেদের বাড়ীর নতুন বেয়ান আমাকে দেখে বেজোর মাকে

জিজ্ঞেস করলেন—এ বৌটী কে? বেজোর মা যা' সত্যি তাই অবিশ্যি বললে। কিন্তু চোকখেকো ঠানদিদি কোত্থেকে এসে গায়ে পড়ে ফোঁড়ন দিতে লাগ্‌ল—বেয়ান, চিন্‌ছ না এ কে? ঐ যে বিকেল বেলায় দেখেচ হয়তো, মাথাজোড়া টাক—বিনুর বাপকে—তারই ইস্তিরী। বলি, তোমায় টাক থাক্ বা না থাক্, অন্যের তাতে কি? আর অচেনা লোককে পরিচয় দেওয়ার কি এই কথা! কিন্তু সে কথাও মাথায় থাক্, আমার দিকে চেয়ে আবার রসিকতাও করা হ'লো—কি হলো নাতবৌ, পরিচয়টা আর একটু ভাল ক'রে দেবো নাকি? নাতির তো বয়সটা কম হ'লো না,—আমার দেওর শশীরই সমবয়সী,—ষাটের বাছা তারও তো এই পঞ্চান্নো উৎরে যায়,—আর তুই এখনও টুক্‌টুকে বৌটাই আছিস্? দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার কিনা! কথা শুনে পা হ'তে মাথার তালু পর্য্যন্ত জ্ব'লে গেল! পাড়ার শশী ঠাকুদ্দার সমবয়সী তুমি! আর আমি হলেম তোমার দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার।'

গিন্নীর কথা শুনে আমি হো হো ক'রে উঠ্‌লেম। বল্‌লেম—'সম্পর্কে ঠানদিদি, ঠাট্টা করেই দুটো কথা বলেচেন, তাতে চটো কেন?'

গিন্নী বল্‌লেন—'চটব না? গতরখাকীর আর বট্‌কেরী করার জায়গা মিল্‌ল না! নতুন কুটুম, তারাই বা শুনে ভাব্‌ল কি! তুমি পঞ্চান্ন বছরের থুত্‌থুরে বুড়ো! আর আমি তোমার দ্বিতীয় পক্ষ!'

আমি বল্‌লেম—'হ্যাঁ, তোমাকে দ্বিতীয় পক্ষ বলা অবশ্য ঠান্‌দিদির অন্যায়। এতে তোমার বাপের টাকা নেই তাই তোমাকে বুড়োর হাতে সঁপে দিয়েছেন—এই কথাই বলা হয়েচে, স্বীকার করি। কিন্তু ঠান্‌দিদির কথাটা একদিকে সত্যিও বটে। চেহারাটা এখনও যা আছে!' বলেই আমি হাত বাড়িয়ে গিন্নীর খোঁপাটা ধ'রে নেড়ে দিলেম।

'যাঃ!'—ব'লে গিন্নী দু'হাত পিছিয়ে বস্‌লেন।

সেই এক খোঁপানাড়ারই ফলে আগুনে জল পড়ল। গিন্নী নেমন্তন্নের কাপড় চোপড় ছেড়ে এসে আমার তালুতে হাত বুলাতে বুলাতে বল্‌লেন—'আমার শত্তুরই তো এই টাক।...হ্যাঁগা এর একটা অষুদবিষুদ মেলে না?'

আমি গিন্নীর আবদারের কথাটা শুনে মনে গেঁথে রাখলেম।

দিন-সাতেক পরে হঠাৎ একদিন সুযোগ উপস্থিত। আপিসের এক বরাতে বালী-উত্তোরপাড়ায় যাচ্ছি। হাওড়ায় গিয়ে ট্রেনে বসতেই কে পাশের কামরায় হেঁড়ে গলায় হেঁকে উঠল—"চাই গদামার্কা টাকের মহৌষধ!" টপ্‌ ক'রে ট্রেন থেকে একবার নেমে পাশের কামরা থেকে একশিশি গদামার্কা মহৌষধ চৌদ্দ আনায় কিনে আন্‌লেম। ট্রেনে বসে পড়ে

রাখলেম মহৌষধির লেবেলখানা—তাতে লেখা ছিল, কি ক'রে অষুদটা দিতে হবে, আর কদিনই বা দেওয়ার দরকার।

ওষুদও'লা মুখেও ব'লে দিয়েছিল যে সব কথা; সঙ্গে সঙ্গে বচনের গ্যারাণ্টিটাও দিয়েছিল—মহৌষধটী স্বপ্নাদ্য। বড়জোর তিনটে দিন মালিশ করতে; কিন্তু একদিনের মালিশেই টের পাওয়া যাবে মাথায় চুলের গোড়া গজাচ্ছে।

মানুষের মনে আশার অন্ত নেই! ভাব্লেম কে জানে কিসে কি হয়, তার ওপর এ তো স্বপ্নাদ্য মহৌষধ! কিন্তু গিন্নীকে একটু চম্‌কে দেওয়াও তো দরকার! ঠিক করলেম প্রথম দিনের মালিশটা একটু গোপনেই করতে হবে। ভোরবেলা উঠে গিন্নী টাকের জায়গায় চুলের গোড়া গজিয়েছে দেখ্‌লে যা মজা হবে তাকি আর বল্‌তে!

মনে মনে ভোরবেলাকার গিন্নীর হাসি হাসি মুখখানি কল্পনা ক'রে—তখন আমার নিজেরও মুখে হাসি দেখা দিল।

রাতে গিন্নী ঘুমুতেই ঘরের বাইরে গিয়ে চাঁদের জ্যোছ্‌নায় দাঁড়িয়ে, চুপি চুপি মাথাটার আগাগোড়ায় মালিশটা মাখ্‌লেম। তারপর আবার চুপে চুপে বিছানায় ফিরে এসে ঘুমিয়ে রইলেম।

ভোরবেলা ঘুম থেকে জেগে তড়াক্ ক'রে উঠ্‌তে গিয়ে মাথায় কিসের টান পড়্‌ল। পাশ থেকে ছোট খোকাটাও তখন চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—'ও কি করছ্, বাবা, আমার পাশবালিশটা মাথায় ক'রে নিয়ে যাচ্ছ কোথায়?' খোকার কথা শুনে মাথায় হাত দিয়ে দেখি তাই তো! পাশবালিশটা মাথায় লেপ্‌টে পড়্‌ল কিসে! হঠাৎ সেই গদামার্কা অষুদের কথা মনে হলো; আরো মনে পড়্‌ল, আমার শোয়ার একটা বদ অভ্যেসের কথা—ঘুমের ঘোরে আশেপাশের আর একটা বালিশ টেনে নিয়ে নিজের বালিশের ওপর গুঁজে মাথায় দেওয়া। ব্যাপারটা হয়েছিল তাই-ই বটে। সেদিন ছোট খোকার পাশ বালিশটাতেই আমার গোঁজার কাজ চলেছিল, আর চৌদ্দ আনা দামের মহৌষধের আঁটায় লেপ্‌টে পড়েছিল তা' টাকের সঙ্গে।

গিন্নী তখনও নাক ডাকাচ্ছিলেন। চুপ্ চুপ্—বলেও খোকার মুখ চুপ করানো গেল না। পাশবালিশের জন্যে তার চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙ্গে গিন্নী চোক মেলে চাইলেন।

ততক্ষণে দু-হাতে ধরে' ওয়াড়টার ভেতর থেকে বালিশটাকে টেনে ফেলে দিয়েচি। কিন্তু ওয়াড়টা সেই যে ন্যাটামাছের মত লেপ্‌টে পড়েচে তা খোলে কার সাধ্যি!

বিছানা থেকে উঠে সব কথা শুনে গিন্নী হেসেই লুটোপুটি। বল্‌লেন—'বুড়ো বয়সে তোমার সখ দেখে আর বাঁচি না। আছে টাক তো আছে। বয়স হ'লে মাথায়

টাক পড়্‌বে না, কি বাব্‌ড়ি গজাবে। এখন আর শিং ভেঙে বাছুরের দলে মেশার চেষ্টা কেন ?'

আরে রাম রাম। গিন্নীর মুখে এ কি কথা ? আমার হ'লো বুড়ো বয়স। আর সেদিন এই বয়সের কথায়ই কত না কাণ্ড। ভাব্‌লেম—যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর। মিছে কি চাণক্য পণ্ডিত লিখে গেছেন- বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীযু ইত্যাদি।

কিন্তু সেদিন শিক্ষাটাও হলো প্রচুর-ঐ যা বলেচি, অতি বুদ্ধির ঠকার শিক্ষা। আর সেদিন হ'তে নাক কাণ মলেও রেখেচি—শর্ম্মা আর না কর্‌বে বিশ্বাস—কোনো স্বপ্নাদ্য মহৌষধে, আর না ভুল্‌বে—মেয়েমানুষের কথায়।

সতীশের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয় বলিল "এ দস্তুর মত রোমান্স্‌ রে, সতু। এমন রসের কথাটা এতদিন শুনাস্‌ নি।"

বীরু বলিল -"চোরের কিল! তা কি সহজে কেউ স্বীকার পায়।"

হাবুল জটুর গা টিপিয়া বলিল—"তোর মুখে যে রা নেইরে, জোটো। এমন ব্যাপার, এযে দশজনের কাছে গল্প করারই জিনিষ।"

এই রে হাবুল, দশজনের কাছে গল্প কর্‌বে না কি ? সতীশ হাবুলকে শাসাইয়া উঠিল—"দিব্যি কোরেচিস্‌ মনে নেই!"

হাবুল তাড়াতাড়ি বলিল—"না—না, সতুদা ভুল হয়েছিল থুরি!" বলিয়াই সে নিজের হাতে নিজের দুইগালে চট্‌ চট্‌ করিয়া দুই চড় দিল! সঙ্গে সঙ্গে জটুর দিকে কটাক্ষ করিয়া মুচ্‌কি হাসিল। জটুও একটু হাসিয়া বিড়ি ধরাইয়া মুখে দিল।

সোণারপুরে ট্রেন থামিতেই ব্যাগ হাতে একটী লোক আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। সতীশের সঙ্গীদের মনে তখনও সেই গল্পের সুর বাজিতেছিল। নূতন লোকটীর দিকে তাই প্রথমে কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। কিন্তু লোকটী সতীশদের বেঞ্চির পেছনে দাঁড়াইয়া ডানহাতে কয়েকটী কাগজের মোড়ক তাসের মত সাজাইয়া ধরিয়া যেমন বলিয়াছে 'মহাশয়গণ, শুনুন, আমার নিকট কয়েকটী আশ্চর্য্য রকমের ঔষধ আছে'—অম্‌নি সকলের দৃষ্টি পড়িল তার দিকে। বঙ্কিম চুপে চুপে সতীশকে বলিল, "দ্যাখ্‌তো সতু ভাল ক'রে একবার চেয়ে,—তোর গদামার্কা টাকের মহৌষধওলা নয় তো!"

সতীশ চাপাগলায় জবাব দিল—"হেড়ে গলাটী তো সেই রকমই। আর একেতো কখনও এলাইনে দেখি নি। দাঁড়া, লোকটার অষুদের নাম গুলো আগে শোনা যাক্‌।"

বঙ্কিম ও সতীশের চাপা কথা জটুর কাণ এড়াইল না! সে চট্‌ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাবুলকে বলিল "উঠ্‌ দেখি, হাবুল, একবার। সতুদার গদামার্কার খোঁজ মিল্‌ল বুঝি! লোকটাকে হাতছাড়া করা হবে না।"

লোকটী এক-নিঃশ্বাসে ঢাকার আগ্নেয়ভস্ম, বেঙ্গললেবরেটরীর জোয়ান ট্যাব্‌লেট্‌ ও তান্‌সেনের গুলির নাম করিয়া যেমন বলিয়াছে -'আমার নিকট আরো একটী আশ্চর্য্য রকমের ঔষধ আছে—গদামার্কা টাকের মহৌষধ' -অম্‌নি হাবুল চেঁচাইয়া উঠিল, "এই গদামার্কা টাকের মহৌষধ, শোন দেখি একবার এদিকে এসে।"

লোকটী ঔষধের ব্যাগটী লইয়া কাছে আসিতেই জটু ধম্‌কাইয়া উঠিল—"বার্‌কর্‌ দেখি, ব্যাটা, তোর যত আছে গদামার্কা মহৌষধ!" হাবুলও তখন আঙ্গুল দিয়া সতীশকে দেখাইয়া বলিল, "চিনিস্‌ এই ভদ্রলোককে, যাঁর গলায় ছুরি দিয়ে চোদ্দআনা ঠকিয়ে নিয়েছিস্‌ ক'মাস আগে, 'ই, আই, আর, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে এখন এসেছিস্‌, ই, বি, আরও উজোর করতে! নাক ভেঙ্গে দেবো না ঘুসিয়ে।"

জটু ও হাবুল দুইজনেই লাফাইতে লাগিল—তাহাকে এই মারে তো এই মারে! লোকটী যাই কিছু বলিতে যায় অম্‌নি হাবুল বলে "মার্‌ব ঘুসি," জটু বলে 'মার্‌ব চড়।'

সতীশ তাহাদিগকে থামাইয়া বলিল "থাম্‌না তোরা বাপু একটু। লোকটা কি বল্‌তে চায়, শোনাই যাক্‌না ওর কথাটা আগে।"

সতীশের আশ্বাস পাইয়া লোকটী বলিল—"আপনারা নিশ্চয়ই কিছু ভুল কর্‌ছেন। আমি একাজে নূতন লোক। আজই সবে নেমেছি। এর আগে আর কখনও কোথাও ওষুধ বিক্রী করি নাই।"

সতীশ বলিল "হ'তে পারে তাইরে, জটু। সে লোকটার মাথায় তো এর মত টাক ছিল না।"

"জটু বলিল—"কিন্তু হেঁড়ে গলাটী তো নেই রকমই আছে। আর ফেরিও তো করচে গদামার্কা টাকের মহৌষধ।"

বঙ্কিম ও অক্ষয় লোকটীর হাত ধরিয়া পাশে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা, তুমি নিজে না বেচে থাকো, জানো আর কাউকে, এই গদামার্কা অষুদই ফেরী করে—বালি-উত্তোর পাড়ায় পথে? অন্ততঃ ছ'মাস আগে কর্‌ত?"

প্রশ্নটী শুনিয়া লোকটীর মুখে হাসি দেখা দিল। সে বলিল—"যা' ভাব্‌ছিলেম সেই ভুলই আপনাদের হয়েচে। গদা মার্কা টাকের মহৌষধ আমার বাবার পেটেণ্ট্‌! এতদিন আমার দাদাই কারবার দেখ্‌তেন-শুন্‌তেন, আর রেলের পথে ফেরী করতেন। কিন্তু হিসেব পত্তর নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার গোলমাল হয়, তাই আমি আমার অংশ পৃথক

ক'রে এনেছি। এত দিন ভাগ বাট্রার গোলে কাজ বন্ধ ছিল। আজই আমি ফেরিতে নেমেছি। আমার দাদা আছেন কিনা পশ্চিম দিকে তাই আমার ভাগে পড়েচে এই পূব-দিকটা।"

বীরু জিজ্ঞাসা করিল—"দুজনাই কি একসঙ্গে রাগিণী সেধে একই রকম হেঁড়ে গলা ক'রে নিয়েছ?"

লোকটী হাসিয়া বলিল—"আজ্ঞে আমরা যমজ ভাই।"

হাবুল বলিল—"আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তোমার নিজের মাথায় তো দেখচি পূর্ণিমার চাঁদটীর মত একটী টাক, অথচ তুমিই কর্‌চ টাকের মহৌষধ ফেরী!—এ যে নিজের চর্‌কা ছেড়ে পরের চরকায় তেল দেওয়া রে বাবা!"

লোকটী আগেরই মত হাসিয়া বলিল—"আজ্ঞে এ টাকটী আমার ওলাই চণ্ডীর মানত করা। তাঁর কৃপেই স্বপ্নে অষুধটী লাভ হয়েছিল কিনা, তাই বাবাই মানত ক'রে গেছেন। স্বপ্নের অষুধ, ফলও হয় এর প্রত্যক্ষ—একবার ব্যবহার ক'রেই দেখুন। আপনারা দাদার অষুধটা নিয়ে হয় তো তেমন ফল পান নি। তার এক কারণও ছিল। অষুধটা তৈরী করতে দাদা অনেক সময় গাধার দুধের কাজ মোষের দুধে সার্‌তেন। আমার অষুধে সে ভেজালটী নাই, মশায়। তাই তো তার অষুধ আর আমার অষুদে আকাশ-পাতাল তফাৎ। আর হবেই না বা কেন?—দেখুন না এই—দাদার অষুদটা এক-গদা মার্কা আর আমার অষুদ দু-গদা মার্কা। লেবেলেরও তফাৎ রয়েচে তারটা নীল, আর এটা হল্‌দে। নিন্ না এক শিশি। তিন দিনেই উপকার পাবেন।" বলিয়াই সে দু-গদা মার্কা টাকের মহৌষধের একটা শিশি সতীশের সাম্‌নে ধরিল।

সতীশ ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল—"বাবাঃ আর কি নেড়ে বেল তলায় যায়!"

—৫—

ট্রেন পিয়ালী ষ্টেশনে থামিলে সতীশরা সকলে নামিয়া গেল। সেইখান হইতেই তাহাদের বাড়ীতে যাওয়ার পথ।

রেল-লাইন ঘেঁষা পথে যাইতে যাইতে তারা শুনিতে পাইল চলন্ত গাড়ীর মাঝে হেঁড়ে গলার স্বরে ঔষধওয়ালার বক্তৃতা চলিতেছে 'মহাশয়রা শুনুন। আমার কাছে আশ্চর্য্য রকমের কয়েকটী ঔষধ আছে। ঢাকার আগ্নেয় ভস্ম,—অম্ল, উদরাময়—শূল, পেট ফাঁপার মহৌষধ।'

ইঞ্জিনের বাঁশীর শব্দ থামিতেই আবার বক্তৃতার স্বর উঠিল—আর একটা ঔষধ—স্বপ্নাদ্য, টাকের মহৌষধ—হল্‌দে লেবেল—দু-গদা মার্কা। একবার ব্যবহার ক'রে দেখুন,—তিন দিনেই নিশ্চয় ফল পাবেন।'

গদা মার্কা টাকের মহৌষধের নাম শুনিয়া বীরু বলিল—"শোন্, ঐ সতু, কার গলায় আবার ছুরি দেওয়ার আয়োজন হচ্ছে।"

সতীশ বলিল—"মরুক্ গে। যার পাঁঠা, সে ল্যাজে কাট্‌তে চায়, কাটুক্! তোর আমার কি!"
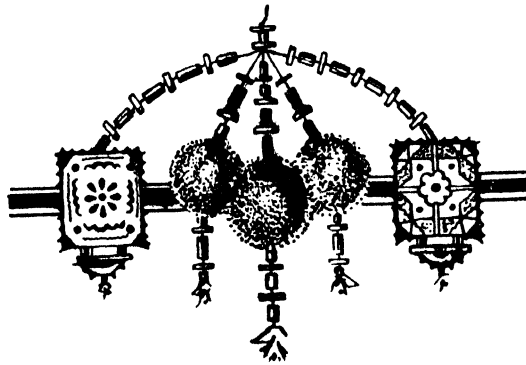
এক খানি চিঠি

(কিশোরী-সম্পাদিকা শ্রীসুধা দেবীকে লিখিত)

শিল্পাচার্য্য শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

কলিকাতা,
জোড়াসাঁকো।

পরম কল্যাণীয়াষু

সাহিত্য ক্ষেত্র থেকে এতকাল আমি সরে এসেছি যে লেখার রাস্তা আমি ভুলে বসে আছি!

ডাক্তারেরা মিলে আমার জন্যে এখন ঘরের পিজরাপোলের ব্যবস্থা করেছে। তাছাড়া এক সময়ে আমিই প্রথম লিখতে সুরু করি শিশু-সাহিত্য—সেই সেকালের শিশুদের জন্যে। সে সব ছেলে মেয়ে তারা এখন বুড়ো হয়ে বলছে—আর্ট বিষয়ে খুব গভীর তত্ত্বসকল বসে বসে আবিষ্কার করহঃ। আর একদল আধাবুড়ো—তারা বলছে—নবযুগের উপযোগী কাগজের জাহাজ প্রস্তুত করে সমুদ্র পারে গিয়ে ছবির একটা প্রদর্শণী খুলতে। তার চেয়ে কম বয়সের যারা—তারা বলছে—মনোহরা আর কড়াই ভাজা মিলিয়ে দিব্বি সুখাদ্য প্রস্তুত করতে। আবার এই মাত্র আমার মনের মানুষটি, বাদশা নামে কচি নাতিটি হয়ে সামনে—বসে নির্ব্বাক ভাষায় কড়া হুকুম দিচ্ছেন, সটকার নল থেকে তাঁর নাকের সামনে ক্রমাগত রেল গড়ির ধূম্ ও রেল চলার ঘর্ঘর সঙ্গীত সৃজন করতে—এর উপর আর কারো-হুকুম চলবে না।

তোমাদের নতুন পত্রিকার বহুল প্রচার আমি কামনা করে এই টুকু মাত্র লিখে দিলেম।...

শুভাকাঙ্ক্ষী।
শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

সম্পাদকীয়

প্রিয় কিশোরীবন্ধুগণ,

আমাদের বাংলা সাহিত্যে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য আজকাল অনেক বই বেরিয়েছে; আর বড়দের উপন্যাসাদির ত কথাই নেই;—কিন্তু কিশোর-কিশোরীদের মনের মত বই খুব বেশী নেই।

আমি যখন তোমাদের বয়সী ছিলাম এবং যখন একদিকে রাজপুত্র পরীর গল্পে কিম্বা বেঙ্গমা বেঙ্গমী পাখীর গল্পে মনটা পুরো ভারত না, আবার অপরদিকে বড়দের সব বই পড়তেও পেতুম না আর বুঝতুমও না সব। তখন বাংলা দেশের লেখক-লেখিকাদের উপর ভারী রাগ হোত! ইংরাজিতে ত কত সুন্দর সুন্দর বই আছে, তবে বাংলাভাষায় আমাদের পড়বার মত বেশী বই নেই কেন?

বাংলা বই তখন বেশী পেতাম না বলে, ইংরাজি বই থেকেই মনের খোরাক জোগাড় করবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু বাংলা লেখক লেখিকাদের উপর অভিমানটা যেত না! তোমাদের মনেও বোধ হয় এই অভিমান খানিকটা জাগে মাঝে মাঝে। নয় কি? কিশোরীর মন ত।

এই মনে করেই তোমাদের হাতে এই "কিশোরী" তুলে দিলাম। একে তোমাদের মনের মত করে সাজাবার ভার নিয়েছেন দেশের সুপ্রসিদ্ধ লেখকলেখিকা এবং শিল্পীগণ। বই পড়ে তোমাদের ভাল লাগ্‌লে এবং তোমরা পরিতৃপ্ত হলে, তাঁরা সকলেই তৃপ্ত হবেন সন্দেহ নেই।

বইটা বড় তাড়াতাড়িতে বা'র হোল, সেই জন্য এর মধ্যে কতকগুলি ছাপার অশুদ্ধি এবং ত্রুটী রয়ে গিয়েছে—আমার মনেও তাই অনেকখানি ক্ষোভ রয়ে গেল,—তোমরা আশা করি সেটুকু ক্ষমার চক্ষে দেখ্‌বে।

সামনের বছর একে আরও সুন্দর করে সাজাবার ইচ্ছা রইল—তোমাদের কিশোরীদের ভালবাসা পেয়ে আমাদের এই "কিশোরী"র শ্রী নিশ্চয়ই আরও অনেক বেড়ে যাবে।

ইতি—

শ্রীসুধা দেবী।

সেলাইএর অ, আ, ক, খ।

মেয়েদের মধ্যে অনেকেই সেলাই করতে খুব ভালবাসে, বিশেষতঃ ফ্রক, ব্লাউস্, টেবিল ঢাকনি ইত্যাদির উপর ফুল, লতাপাতা তুল্‌তে। ভারী মজার লাগে এই রকম Embroidery করতে—না?

Embroidery নানারকম জিনিষের উপর করা যায়, যেমন সেমিজ, ফ্রক, ব্লাউস্, সাড়ী, পর্দ্দা, চেয়ারের ঢাকনি, টেবিলের ঢাক্‌নি, বিছানা ঢাকা, বালিশের ওয়াড়, রুমাল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কোন জিনিষের উপর embroidery করতে হলে, সকলের আগে সেই জিনিষের উপযোগী একটী প্যাটার্ণ বেছে নিতে হয় অথবা নিজে এঁকে নিতে হয়। তারপর, যে কাপড়ের উপর সেলাই করা হবে, সেই কাপড়ের উপর প্যাটার্ণটী কার্ব্বন কাগজের সাহায্যে তুলে নিয়ে, সেই দাগের উপর এক রংএর সুতো দিয়েই হোক্ বা ফুল পাতার রং অনুসারে দুই তিন রংএর সুতো বা রেশম দিয়েই হোক্, সেলাই কর্‌তে হয়।

এই ফুল পাতা ইত্যাদি করবারও আবার নানারকম ফোঁড় বা stitch আছে—সেই বিষয়েই তোমাদের কয়েকটী ইঙ্গিত দেব আজ।
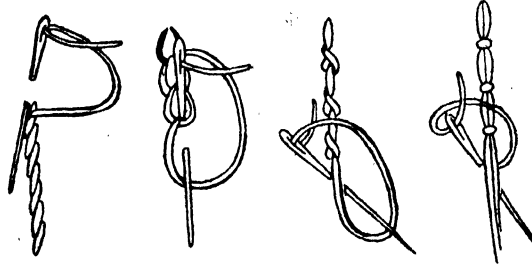
১ নং চিত্র।　২ নং চিত্র।　৩ নং চিত্র।　৪ নং চিত্র।

উপরে চিত্র ১, ২, ৩ ও ৪ এ যে stitch গুলির নমুনা দেওয়া হয়েছে, সেগুলি দিয়ে সাধারণতঃ লতার বা গাছের ডাঁটা সেলাই করা হয়।
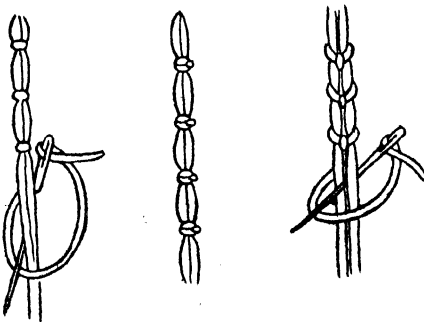
৫ নং চিত্র।　৬ নং চিত্র।　৭ নং চিত্র।

প্যাটার্ণের ডাঁটা যদি মোটা হয়, তা'হলে satin stitch দিয়ে ভরিয়ে অথবা চিত্র ৫, ৬, ৭ এর মত করেও করা যেতে পারে। feather stitch কিম্বা herring bone stitch দিয়ে ডাঁটা করলেও মন্দ দেখায় না। (দুই রং এর পশম বা সিল্ক দিয়ে চিত্র, ৫, ৬ ও ৭ এর মত করে border করলেও বেশ দেখায়)।

ফুল ও পাতা যদি ভরিয়ে সেলাই করবার দরকার না থাকে তাহলে ১ নং (stem stitch) ও ২ নং (chain stitch) চিত্রের stitch দিয়েও তাহা সেলাই করা যায়।
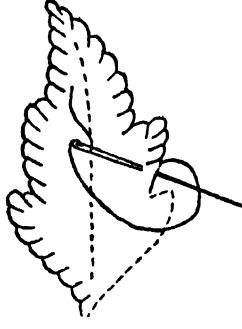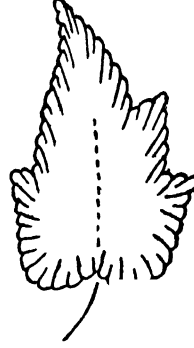
৮ নং চিত্র। ৯ নং চিত্র।

বোতামের ঘর যে রকম করে সেলাই করা হয়, সেই stitch অথবা Button -hole stith দিয়ে ফুল ও পাতা সেলাই করলেও বেশ দেখতে হয়। (চিত্র ৮ এবং ৯)

১০ নং চিত্র। ১১ নং চিত্র। ১২ নং চিত্র।
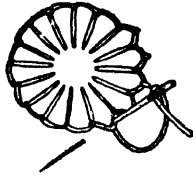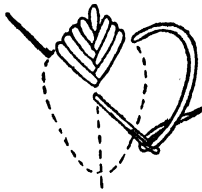
১৩ নং চিত্র। ১৪ নং চিত্র। ১৫ নং চিত্র।

৯ নং চিত্রে button hole stitch গুলি একটী বড় একটী ছোট, একটী বড় এবং একটী ছোট এইরকম ভাবে সেলাই করলে, কি রকম দেখায়, তাহাই দেখান হয়েছে।

ফাঁক ফাঁক করে button hole stitch দিয়ে কি রকম সহজ উপায়ে নানা রকম ফুলও করা যেতে পারা যায়, তাহা চিত্র ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭ তে দেখান হয়েছে। পাতা

ও ফুল ভরিয়ে করতে হলে satin stitch দিয়ে অথবা চিত্র ১০ ১১, ও ১২র মত করে করা যেতে পারে।
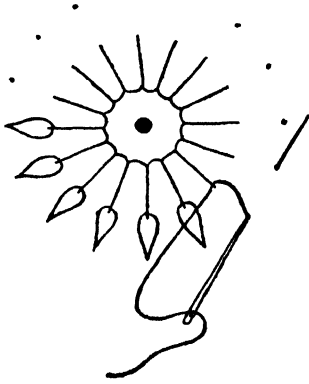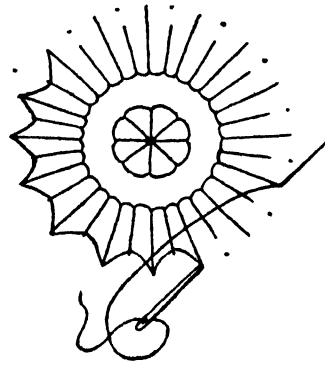
১৬ নং চিত্র। ১৭ নং চিত্র।

সরু এবং লম্বা আকারের পাতা অথবা ফুলের পাপ্‌ড়ি চিত্র ১৮ এবং ১৯ এর মতন করে করলেও বেশ সুন্দর হয় তোমরা করে দেখ্‌তে পার।

১৯ নং চিত্র (ক) ১৮ নং চিত্র (ক)
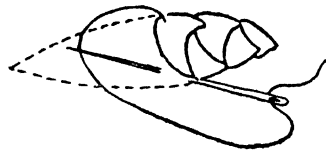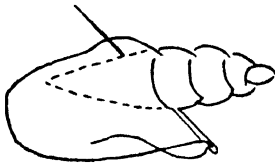
১৯ নং চিত্র (খ) ১৮ নং চিত্র (খ)

Embroidery কর্ব্বার আরও অনেক রকম stitch আছে, আজ মাত্র তোমাদের কয়েকটী রহজ ফোঁড়ের ইঙ্গিত দিলাম, ভবিষ্যতে অন্যান্য গুলির বিষয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছা রহিল!

তোমাদের এখানে আর একটী কথা বলে রাখি—একটী প্যাটার্ণ যে আগাগোড়া এক ধরণের ফোঁড় দিয়েই করতে হবে তার কোন মানে নেই। এক প্যাটার্ণেই তিন চার রকম ফোঁড় ব্যবহার করা যেতে পারে সুবিধা মত।

খুকুর পশমের বেনিয়ান

তোমাদের মধ্যে অনেকেই সম্ভবতঃ Knitting অথবা কাঠি দিয়া বুনিতে জান;

যাহারা অল্প অল্প মাত্র বুনিতে শিখিয়াছ, তাহারাও অনায়াসেই এই বেনিয়ানটী বুনিতে পারিবে। এটী তৈরী করিয়া করিয়া দেখ, দেখিবে তোমার ছোট বোনের সুন্দর একটী বেনিয়ান বা vest হইয়াছে।

সরঞ্জাম—এক বাণ্ডিল শাদা বা রঙিন্ কোন রং এর পশম, (মোটা হইলে চিরিয়া লইতে হইবে), দুটী ৭ নম্বরের কাঁটা এবং একটী হাড়ের ক্রুশিয়া।

বুনিবার প্রণালী—

দুই কাঠি দিয়া ৮০টী ঘর একটী কাঠিতে তুলিয়া লও; তারপর দুইটী সোজা দুইটী উল্টা, এই রকম করিয়া তিন ইঞ্চি রিব্ বোন।

এখন সোজা বুনিয়া যাও—১০ ইঞ্চি এই রকম সোজা বোন। সেলাইটী তাহা হইলে ১৩ ইঞ্চি লম্বা হইবে। এইটীই হইবে বেনিয়ানটীর সম্মুখ ভাগ।

ইহার পরের লাইনে ২০টী ঘর সোজা বুন; তাহার পর ৪০টী ঘর ফেলিয়া দিয়া, বাকী ২০টী ও সোজা বুনিয়া ফেল। এই শেষের ২০টী ঘর এইবার সোজা বুনিয়া ১০ ইঞ্চি লম্বা করিয়া পশমটী ছিঁড়িয়া ফেল।

ছেঁড়া পশমটী এইবার জুড়িয়া অপর দিকের ২০টী ঘর সোজা বুনিয়া ১০ ইঞ্চি লম্বা করিতে হইবে। তাহা হইলে দুই দিকের কাঁধের অংশই বোনা হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় কাঁধের ১০ ইঞ্চি বোনা হইলে, গলার জন্য যে দিকে ফাঁক হইয়াছে সেইদিকে ৪০টী ঘর আবার তুলিয়া লইয়া প্রথম কাঁধের ২০টী ঘর এই সঙ্গে বুনিতে হইবে। কাঠিতে আবার ৮০টী ঘর হইল। তারপর সোজা বুনিয়া যাও।

১০ ইঞ্চি এইরূপে সোজা বোনা হইলে, দুটী সোজা দুটী উল্টা করিয়া পূর্ব্বের মত আবার তিন ইঞ্চি রিব্ বোন। তারপর সব ঘরগুলি ফেলিয়া বোনা শেষ করিয়া ফেল।

সেলাইটীকে এইবার দু'ভাঁজ করিয়া, তলা হইতে (অর্থাৎ রিবের কাছ হইতে) দুটী পাশ জুড়িয়া ফেল; শুদ্ধ হাতের ফাঁকের জন্য দুই পাশে ৭ ইঞ্চি (অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ প্রতি দিকে ১৪ ইঞ্চি) করিয়া খালি রাখিতে হইবে।

এখন, অপর কোন রংএর বা সেই রংএরই পশম দিয়া একটী হাড়ের ক্রুশিয়ার সাহায্যে একটী সহজ লেশের প্যাটার্ণ করিয়া গলা এবং হাতের চারিদিকে লাগাইয়া দাও। তাহার পর দেখিবে একটী সুন্দর বেনিয়ান হইয়াছে।

মজার প্রশ্ন

পরবর্ত্তী দুই পৃষ্ঠার।—ছবিগুলি দেখে নীচের প্রশ্নগুলির জবাব দাও দেখি! দেখি, কে বল্‌তে পারে?

১। সাতটী দেশের সাতটী জলযানের ছবি দেওয়া হোল। বল দেখি

(ক) এর মধ্যে কোন্‌টী বাঙ্গালা দেশে ব্যবহার হতে দেখা যায়?

(খ) কোন্‌টীই বা পুরাকালে ব্রিটনরা ব্যবহার করত আর তার নামই বা কি?

২। (ক) এর মধ্যে কোন্ নৌকাটীকে উত্তর মহাসাগরে দেখতে পাওয়া যায়?

(খ) কোনটীকেই বা উত্তর আমেরিকার নদীবক্ষে ভাসতে দেখা যায়?

৩। বলত নৌকাগুলির মধ্যে (ক) কোনটী এস্কিমোরা ব্যবহার করে?

(খ) কোন্‌টী ভেনিসের লোকেরা ব্যবহার করে?

(গ) এবং কোন্‌টী বা বোগ্‌দাদী বনিকদের কাজে লাগে?

৪। এই তিন দেশী নৌকার কোন্‌টীর কি নাম বলত?

৫। ছবিতে দেওয়া নৌকাগুলির মধ্যে, বলত (ক) কোন্‌গুলি বেতে বোনা?

(খ) কোনগুলি কাঠের তৈরী?

(গ) কোনগুলিতে জন্তুর চাম্‌ড়া দরকার হয়? এবং (ঘ) কোনটীতে আল্‌কাতরা জাতীয় জিনিস্ মাখান থাকে?

৬। আর একটী প্রশ্নের জবাব দিতে পার্লে'ই তেমাদের ছুটী। বলত জলযান-গুলির মধ্যে সব থেকে বড় কোনটী, তার নামই বা কি?
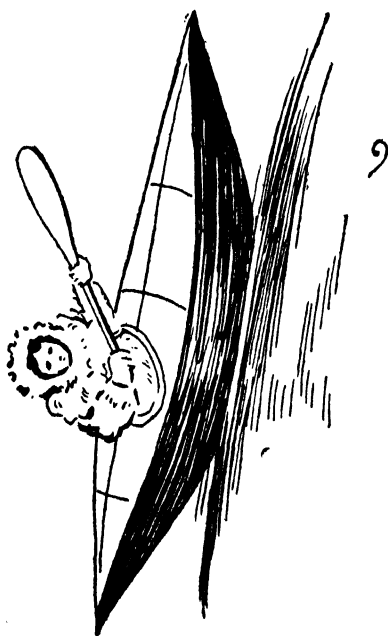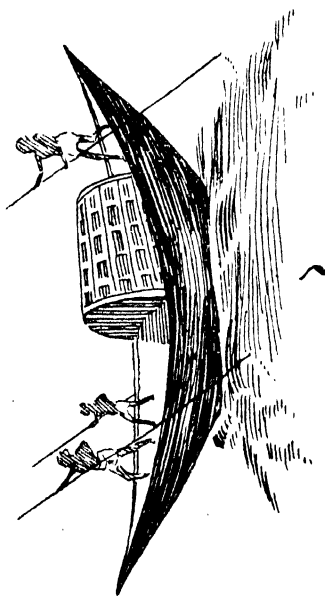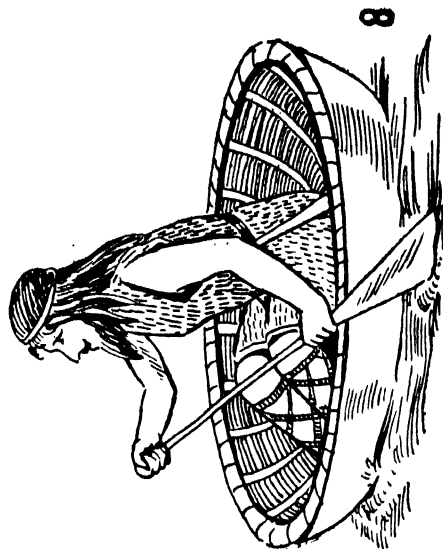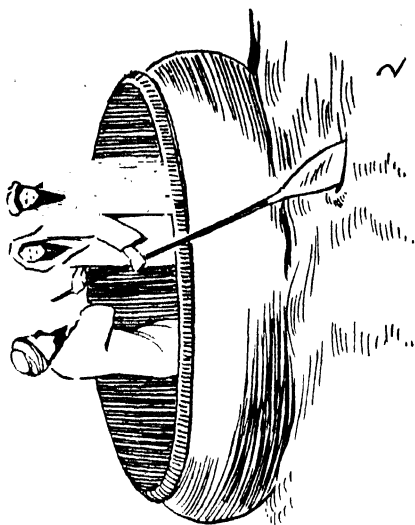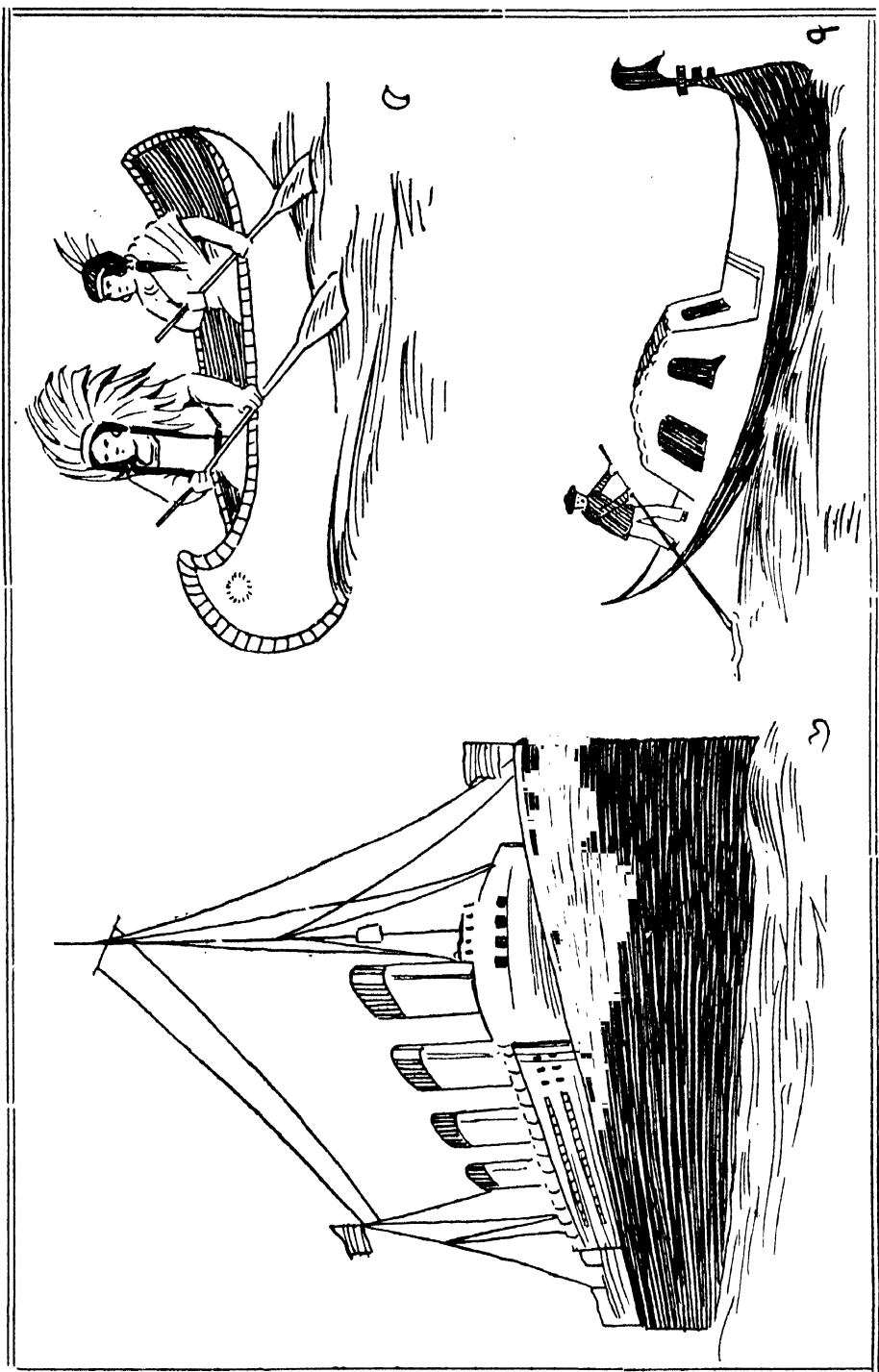
সাধনার নিধি।

অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত।

[১]

পারস্যের তরুণ শাহ জিয়ান্, একদিন রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন, একজন বৃদ্ধ শিয়রের পাশে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন,—"শোন শাহ, তোমার রাজপুরীর সকলের নীচ তলার দক্ষিণ দিকে যে ছোট ঘরটি আছে, ঐ ঘরটি খুঁড়িলে উহার নীচে অনেক ধন রত্ন পাইবে।"

শাহ বলিলেন—"আমি ত এমন কথা কোনদিন শুনিনি বা জানিনি।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"এতদিন তোমার পিতার আদেশে তোমাকে প্রকাশ করা বারণ ছিল, তাই বলা হয় নাই, আজ তাঁহারই আদেশে তোমাকে এ কথা বলিলাম। আর বিলম্ব করিওনা। ঐ ধন রত্ন যত শীঘ্র পার, উদ্ধার কর।"

জিয়ান্, পিতার মৃত্যুর অল্পদিন পরে সবেমাত্র পারস্যের শাহ বা বাদশাহ হইয়াছেন। এ স্বপ্ন তাঁহার কাছে অলীক বলিয়া মনে হইল।

পরের দিন ভোরের বেলা, এ স্বপ্নের কাহিনী শাহ তাঁহার বৃদ্ধা মাতাকে বলিলেন। বেগম সাহেবা কিন্তু স্বপ্নের কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন না, বলিলেন—"বাবা, পৃথিবীতে ত অসম্ভব কিছু নয়। তুমি খুঁড়েই দেখনা কেন।"

—রাত্রিতে অতি গোপনে শাহ কয়েকজন বিশ্বস্ত লোক দিয়া সেই ঘরটী খুঁড়িয়া ফেলিলেন। কিছুদূর খুঁড়িবার পরই একটী সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ পথ দেখা দিল, সে পথে মর্ম্মর সোপান শ্রেণী—দূরে অতি দূরে—অনেক নীচে চলিয়া গিয়াছে।—শাহ যাইতে যাইতে একটী অতি সুন্দর বিস্তৃত কক্ষে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সে কক্ষের ছাতে নীল রংয়ের গায়ে হাজার হাজার হীরা মাণিক জ্বলিতেছে, যেন ঠিক নীল আকাশের বুকে তারার মালা। আর সেই ঘরের সুসজ্জিত মনি, মুক্তা হীরার পাশে পাশে চারিদিকের দেওয়ালের গা ঘেঁসিয়া স্বর্ণ নির্ম্মিত আটটি স্তম্ভের উপর হীরক গঠিত অতি সুন্দর আটটী কিশোরীর মুর্ত্তি। ঐ সকল মুর্ত্তির জ্যোতিতে কক্ষটি উজ্জ্বল হইয়া আছে। শাহ মা'কে আনিয়া এই অতুল সম্পদ দেখাইলেন। মা দেখিয়া বিস্মিত

হইলেন। শাহ বলিলেন, "মা,—শুধু আটটী মূর্ত্তি নয় ঐ দিকে ঐ ঘরের কোণে আর একটী সোনার স্তম্ভ পড়িয়া আছে। মূর্ত্তি তাহাতে নাই।" উভয়ে কৌতুহলী হইয়া ঐ স্বর্ণ-স্তম্ভটীর পাশে যাইয়া দেখিলেন, ঐ স্তম্ভটির গায়ে মৃত বাদশাহের নিজের হাতে লেখা রহিয়াছে—"পৃথিবীতে নিশ্চয়ই এইরূপ সুন্দর ও সুগঠিত নবম মূর্ত্তিটী আছে। এই আটটী মূর্ত্তি অপেক্ষাও নিশ্চয় সে মূর্ত্তিটী অধিক মূল্যবান্। বৎস, যদি তুমি নবম মূর্ত্তিটী সংগ্রহ করিয়া এখানে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাও—তবে মিসর দেশে কায়রো সহরের মোবারক মিঞার সহিত সাক্ষাৎ করিলে সে মূর্ত্তিটীর সন্ধান পাইবে।"

শাহ পণ করিলেন, যেমন করিয়াই হউক নবম মূর্ত্তিটী সংগ্রহ করিতে হইবে। বেগম সাহেবাও তাঁহাকে খুবই উৎসাহিত করিলেন। পরদিন ভোরের বেলা জিয়ান্ একাকী মিসরের দিকে যাত্রা করিলেন।

[২]

কায়রো সহরের এক উপকণ্ঠে, মোবারকের সহিত শাহের সাক্ষাৎ হইল। জিয়ান্ তাঁহার পরিচয় ও স্বপ্নের কাহিনী বলিবামাত্রই মোবারক হাঁটু গাড়িয়া নত হইয়া বিনীত ভাবে জিয়ানকে অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন, শাহান শাহ!—আমি মৃত বাদশাহের গোলাম ছিলাম। তাঁহার মৃত্যুর পর আমি স্বাধীন হইয়াছি। তিনি আমাকে যে রূপ স্নেহ করিতেন তাহা আমি এ জীবনে কখনও ভুলিব না। আমি আজ যদিও মুক্ত এবং স্বাধীন, তবু আমার মৃত প্রভুর পুত্রের আদেশ পালন করিতে বিমুখ হইব না।

জিয়ান হাসিয়া বলিলেন—"মোবারক, আমি তোমাকে বন্ধু ভাবে গ্রহণ করিতেছি, আমার সঙ্গে তোমার প্রভু ভৃত্য সম্পর্ক নহে। তুমি আমাকে বল—কেমন করিয়া আমি নবম মূর্ত্তিটি সংগ্রহ করিতে পারিব?"

মোবারক বলিলেন—"আমি আপনাকে এমন একজন লোকের কাছে লইয়া যাইব, যিনি এ বিষয়ে আমার চেয়েও অনেক বেশি কিছু জানেন, তবে কিনা পথটা বড় ভীষণ—পদে পদে মৃত্যুর আশঙ্কা—"

জিয়ান বলিলেন—"মৃত্যুকে আমি ভয় করিনা, আমি তরুণ, আমি সাহসী, আমি বীর,—যে কোন বিপদই আসুক্ না কেন আমি ভয় করিবনা। চল বন্ধু!"

মোবারক ও জিয়ান দুই জনে চলিতে লাগিলেন! চলিতে চলিতে তাঁহারা এক গভীর বৃহৎ হ্রদের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদের সারা পায় গভীর বনের ভিতর দিয়া আসিতে হইয়াছিল। হ্রদের চারদিকে দুর্গম বন, আর দূরে দূরে ভীষণ উচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী নীল আকাশের নীলিমার সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

মোবারক যেমন শিষ দিলেন—অমনি হ্রদের অপর দিক হইতে একখানি ছোট

নৌকা তর্ তর্ বেগে তীরের দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। মোবারক বলিলেন—"আমরা এ নৌকায় চড়িয়া দৈত্য রাজার বাড়ীতে যাইব। সাবধান শাহ, নৌকায় মধ্যে একটি কথাও বলিবেন না, যদি বলেন—তাহা হইলে নৌকা অমনি অতল তলে ডুবিয়া যাইবে, আমরা ধ্বংস হইব।"

জিয়ান সে নৌকায় মাঝিকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাহার মাথাটা হাতীর মত—আর শরীরটা বাঘের মত। নৌকা তীরে ভিড়িবা মাত্র ঐ অদ্ভুত মাঝি তাহার শুঁড় দিয়া মোবারক ও জিয়ানকে নৌকায় তুলিয়া লইল। জিয়ান এই অদ্ভুত জীবের অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তবু মনের জোরে নীরব রহিলেন।

ধীরে ধীরে নৌকা খানি অপর তীরে আসিয়া পৌঁছিল। পলক মধ্যে নৌকা ও সেই অদ্ভুত মাঝি কোথায় বিলীন হইয়া গেল।

তীরে নামিয়া মোবারক বলিল—"বাদসাহ আমরা দৈত্য রাজার দেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আমি যাদুমন্ত্র বলে এখনি তাঁকে আহবান করিব। যদি দৈত্যরাজের মেজাজ ভাল থাকে, তাহা হইলে তিনি বেশ ভদ্রলোকের মত মানুষের আকারে আসিয়া দেখা দিবেন। আর যদি মেজাজ খারাপ থাকে, তাহা হইলে অতি ভয়ঙ্কর দৈত্যের মূর্ত্তিতেই আসিবেন। তবে আর রক্ষা নাই। সাবধান, অত্যন্ত বিনীত ভাবে দৈত্যরাজকে অভ্যর্থনা করিবেন।" এই বলিয়া মোবারক দৈত্যরাজকে আহ্বান করিলেন।

—সেই মুহূর্ত্তে আকাশ ঘন কালোমেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। চরিদিকে বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল, বজ্র গর্জ্জন করিতে লাগিল, তাহাদের পায়ের তলার মাটি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ সব থামিয়া গেল।—জিয়ান্ দেখিলেন—একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। মাথায় তার মস্ত বড় পাগ্ড়ী। দাড়ি বক্ষ পর্য্যন্ত বিলম্বিত। সাজ সজ্জা পোষাক মিশরের সম্ভ্রান্ত ভদ্র ব্যক্তিদের ন্যায়। মুখের মধ্যে প্রফুল্ল হাস্যদীপ্তি। জিয়ান্ অতি বিনীতভাবে তাহাকে অভিবাদন করিলেন।

বৃদ্ধ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ?"

জিয়ান্ নিজের পরিচয় দিয়া তিনি যে নবম মুর্ত্তিটির সন্ধানে অসিয়াছেন—সে কথা বলিলেন—এবং বলিলেন যে—আমি আপনার অনুগ্রহ হইলেই সেই মুর্ত্তিটী সংগ্রহ করিতে পারি।

দৈত্যরাজ গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"তুমি যে মূর্ত্তি সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল হইয়াছ, আমি তোমাকে সেই মূর্ত্তি দিব—কিন্তু তোমাকে একটা পণ করিতে হইবে—"

বাদশা বলিলেন—"কি পণ ?"

"তুমি তিন মাসের মধ্যে যদি একটী অপূর্ব্ব সুন্দরী কিশোরী কন্যাকে—যার দেহ ও মন স্বচ্ছ এবং নির্ম্মল পবিত্রতা যেখানে উজ্জ্বল মণির ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে—এমনি একটী কিশোরীকে আমার নিকট উপস্থিত করিতে পার—আর এইরূপ পণ করিতে পার সেই কিশোরীর উপর তোমার কোন অধিকার থাকিবে না, তাহা হইলে আমি তোমাকে নবম মুর্ত্তিটীর সন্ধান বলিব।"

জিয়ান্ ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়াই বলিলেন—"হাঁ প্রভু, আমি আপনার আদেশ পালন করিব।"

দৈত্যরাজ অন্তর্হিত হইলেন। তেমনি মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিল—তেমনি বজ্র ডাকিল—তেমনি বিদ্যুৎ চমকিল।

[৩]

সেদিন হইতেই জিয়ান্ খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন—কোথায় কোন্ দেশে, কোন্ অপূর্ব্ব সুন্দরী কিশোরী আছে। শুধু রূপে ত নয়, মনের অতুলনীয় পবিত্রতায়ও যার তুলনা হয় না—এমন কিশোরী কোথায় ? কায়রো সহরে সুন্দরী কন্যার অভাব নাই, কিন্তু সৌন্দর্য্য সে ত ধূলির কণা—চাই সে রূপ—যে রূপ চন্দ্রের জোছনার মত নির্ম্মল, শিশুর শুভ্র সুন্দর হাসিটির ন্যায় সুন্দর—পবিত্র। কোথায় তেমন সুর বালিকা ?

চিন্তিত জিয়ান্, মোবারককে বলিলেন,—"বন্ধু, আমি বাহিরের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে পারি ; কিন্তু অন্তরের সৌন্দর্য্য কেমন করিয়া বুঝিব ? কেমন করিয়া বুঝিব, মুখে যার হাসি অন্তরে তার গরল নয় ? কেমন করিয়া বুঝিব বাহিরে যে অপূর্ব্ব রূপসী, অন্তরেও তেমনি শ্রেয়সী সে ?"

মোবারক হাসিয়া জিয়ান্‌কে একখানি ক্ষুদ্র দর্পন দিলেন। বলিলেন, "তুমি যে কোন কিশোরীর মুখের নিকট এই দর্পনখানি ধরিলে, যদি দেখিতে পাও, দর্পনখানার গায়ে বাষ্প জমিয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, সে মেয়ের মন পবিত্র নয়, বাহিরের রূপ তার অন্তরের মলিনত্বের আবরণ। আর যেখানে দেখিবে, দর্পনখানি এমনি সুন্দর স্বচ্ছ ও নির্ম্মল রহিয়াছে, তখনই চিনিবে ঐ বালিকা তোমার সাধনার নিধি।"

[৪]

দেখিতে দেখিতে দিন চলিয়া যায় ; জিয়ানের সাধনার ধন মিলিল না। কোথায় কোন্ নীল সাগরের তীরে, কোথায় কোন্ অজানা দেশে, কোথায় তুমি আমার সাধনার নিধি ! নির্ম্মল, পবিত্র সুন্দর দেবতার নির্ম্মাল্য ! রূপে অতুলনীয়া, গুণে অবর্ণনীয়া, কোথায় তুমি আমার সাধনার নিধি—আমায় দেখা দাও। আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হউক।

জিয়ান্ চলিতে লাগিলেন—দেশের পর দেশ পার হইয়া—খর্জ্জুর বনবীথি বেষ্টিত মরুভূমির মরুদ্যান উত্তীর্ণ হইয়া—কত দেশ, কত লোক প্রবাহ, কত সুন্দরী—কিশোরী দেখিলেন, কিন্তু দর্পনের কাছে মুখ আনিলেই স্বপ্ন তার ভাঙ্গিয়া যায়। দর্পণ বাষ্পে আচ্ছন্ন হয়। কাহারও হৃদয়ের হিংসার জ্বালা— কাহারও হৃদয়ের মিথ্যা প্রবঞ্চনার অভিনয় ফুটিয়া উঠে সেই দর্পনের গায়! জিয়ানের দেহ ও মন ভাঙ্গিয়া গেল। বৃথা এ অনুসন্ধান। তাহার সাধনার ধন এ জগতে মিলিবে না!

এমন সময় একজন মুসাফের তাহাকে সংবাদ দিল, হারুণ অল রসিদের বোগদাদ সহরে এক বণিকের একটি কন্যা আছে, রূপে সে অপূর্ব্বা, গুণে সে রূপের চেয়েও গরীয়সী।—জিয়ান্ সেইদিনই বোগদাদের দিকে যাত্রা করিলেন।

[৫]

এখন জিয়ান্কে আর বাদশাহ বলিয়া চেনা যায় না। মনে হয় সে যেন একজন দরবেশ। চুলে তার জটা বাঁধিয়াছে। সাজসজ্জা শত ছিন্ন হইয়াছে—দেহের রং হইয়াছে মসী-মলিন।—তার চক্ষে উন্মাদের উদ্‌ভ্রান্ত অপলক দৃষ্টি—সে চায় তার সাধনার নিধি—নির্ম্মল পবিত্র সুন্দরী কিশোরী।

বাদশাহ অবশেষে দীর্ঘ যাত্রা অবসানে বোগ্‌দাদের সেই বণিক্ গৃহে যাইয়া পৌঁছিলেন। বণিক্‌রাজ অতিথির পরিচয় পাইয়া পরম সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

অধীর ব্যাকুল জিয়ান্ যখন বণিক্‌কে বলিলেন—"বন্ধু, আমি তোমার কন্যাকে একবার দেখিতে চাই। সেইজন্য আমার এই ক্লেশ ও শ্রম।"

বণিক্ বলিলেন—"বাদশাহ, আমার অন্তঃপুরবাসিনী বালিকাকে কেমন করিয়া একজন মুসলমানের নিকট উপস্থিত করিব? হউন না তিনি বাদশাহ, হউন না তিনি দুনিয়ার সম্রাট্!"

জিয়ান্ ম্রিয়মান হইয়া পড়েন, কথা বলিতে পারেন না। শুধু করুণ মিনতির চক্ষে চাহিয়া থাকেন বণিকের মুখের দিকে। বণিক্ কোন কথা বলিলেন না,—কিন্তু সমাদরে অতিথিকে প্রতিদিন অভ্যর্থনা করেন; ভোজের আয়োজন করেন, সেলাম কুর্ণিশ করিয়া সম্মান দেখান।

অবশেষে বণিকের পণ ভাঙ্গিল। জিয়ান্ সেই অপূর্ব্ব সুন্দরী কিশোরীকে দেখিলেন। তাহার মুখের নিকট দর্পণ ধরিবা মাত্র দর্পন তেমনি স্বচ্ছ, তেমনি নির্ম্মল রহিয়া গেল, একটুও বাষ্পাচ্ছন্ন হইল না। বিস্মিত, বিমুগ্ধ জিয়ান্ সেই কিশোরীর মুখের দিকে অপলকে চাহিয়া রহিলেন—পলক আর তাহার পড়ে না। এতদিনে বিধাতা তাঁহার প্রতি সদয় হইয়াছেন। মোবারককে অমনি সংবাদ পাঠাইলেন, জিয়ান্ সব ভুলিয়া গেলেন।

'আরতি'

হেমেন্দ্রনাথ

—জিয়ান্ সেই তরুণী কিশোরীকে দেখিয়া এমনি মুগ্ধ হইলেন যে তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন।—বণিক্ পারস্যের বাদশাহকে জামাতারূপে পাইবেন বলিয়া আনন্দে উৎফুল্ল। বিবাহের আয়োজন চলিতেছে। এমন সময়—মোবারক একদিন জিয়ান্কে বলিলেন—"বাদশাহ, আপনি কি দৈত্য রাজার নিকট যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন? আপনি কি নবম মূর্ত্তিটি সংগ্রহের কথা ভুলিয়া গেলেন?—সতর্ক হউন বাদশাহ দৈত্যরাজ আপনাকে মার্জ্জনা করিবেন না।

—বণিক্ কন্যার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে—নির্ম্মল পবিত্র মাধুর্য্যে—জিয়ানের চিত্ত এমনি অভিভূত হইয়াছিল যে, সত্য সত্যই তিনি নবম মূর্ত্তি সংগ্রহের পণ এবং দৈত্য রাজার কথা এই অল্প সময়ের মধ্যেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এইবার সব মনে পড়িল। মনে পড়িল—প্রতিজ্ঞার কথাটা—অঙ্গীকার তাহাকে রক্ষা করিতেই হইবে।

বণিক্কে বলিয়া কহিয়া এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সেই কিশোরী সহ মোবারক, জিয়ান্ ও বণিক্ আসিয়া দৈত্য রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন।

আগেরই মত নৌকা, নৌকার মাঝি—তাহাদিগকে পার করিয়া দিল। তেমনি করিয়া মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল, বজ্র গর্জ্জিয়াছিল, বিদ্যুৎ চমকিয়াছিল।

এবারও দৈত্যরাজ একজন সম্ভ্রান্ত মিশরীয় ভদ্র লোকের বেশে দেখা দিলেন। প্রসন্ন হাস্য দীপ্তিতে তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।—

জিয়ান্ সেই কিশোরীকে দৈত্যরাজের নিকট উপস্থিত করিয়া অতি করুণ কণ্ঠে বলিলেন—"প্রভু আমি আমার প্রতিশ্রুতি পালন করিলাম।"

দৈত্যরাজ হাসিয়া সেই কিশোরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"এস মা, সৌন্দর্য্যের রাণী—এস পবিত্রতার আদর্শ প্রতিমা, এস, আমার সঙ্গে এস মা।" তারপর জিয়ান্কে বলিলেন, "বৎস, তুমি যেমন তোমার প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছ, আমিও তেমনি আমার প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছি। তুমি আজই পারস্যে যাত্রা কর। দেখিবে—নবম মূর্ত্তিটী তোমার সেই ভাণ্ডার গৃহে বিদ্যমান আছে।" দৈত্যরাজের বলা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই—আবার আকাশ ঘন কালো মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ভীষণ ঝড় বজ্র বিদ্যুৎ এক সঙ্গেই গর্জ্জিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে আবার সব নীরব—জিয়ান্ চাহিয়া দেখিলেন, তাহারা তিনজনে তাঁহার প্রাসাদের তোরণ দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন।

জিয়ান্ এক মুহূর্ত্ত কাল বিলম্ব না করিয়া সেই ধন ভাণ্ডারে গমন করিলেন। তাহার হৃদয় পুলকে উজ্জ্বল, উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিতেছিল। অতি দ্রুত বাদশাহ যাইয়া ধনভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত করিলেন।—দেখিলেন—সেই কক্ষের শেষ প্রান্তের শূন্য স্বর্ণ স্তম্ভটী আর খালি নাই,—সেখানে—সেখানে—ও কি?—

—দীপ্তিময়ী উষার মত—মঙ্গলময়ী বণিকের সেই কিশোরী কন্যা অরুণের প্রভাবকেও ম্লান করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চক্ষে তার তারার জ্যোতি, মুখে তার শারদ জ্যোৎস্না, হাসিতে তার রজনীগন্ধার শুভ্র বিকাশ!—কিশোরী হাসিতেছে আর আলোর ঢেউ নাচিয়া দুলিতেছে!

বাদশাহ আনন্দে—মাকে ডাকিয়া আনিলেন। বেগম সাহেবা সেই কিশোরীকে দেখিয়া বিস্মিত ও অভিভূত হইয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন—"রূপে ও গুণে, সততায় ও পবিত্রতায়—যে নারী শ্রেষ্ঠা, জগতে সে অতুলনীয়া! ধন্য তুমি বৎস!—হীরক নির্ম্মিত নির্জীব মূর্ত্তির দীপ্তিত দূরের কথা, এই জীবন্ত প্রতিমার রূপ-প্রভায় দুনিয়ার শত ঐশ্বর্য্যকেও হার মানাইয়া দিয়াছে।

—সাধনার নিধি সাধনার বলেই মিলে।"

—·০·—

মজার প্রশ্নের উতর।

১। (ক) এক নম্বরের ছবি (খ) চার নম্বরের ছবি। ইহার নাম কর‍্যাক্ল্ (caracle).

২। (ক) তিন নম্বরের ছবি (খ) পাঁচ নম্বরের ছবি

৩। (ক) তিন নম্বরের ছবি (খ) সাত নম্বরের ছবি (গ) দুই নম্বরের ছবি

৪। প্রথমটীর নাম কাইয়াক (kayak),
দ্বিতীয়টীর নাম গণ্ডোলা (gondola) এবং
তৃতীয়টীর নাম গুফ্ফা (gooffa).

৫। (ক) দুই এবং চার নম্বরের ছবি;

(খ) ১, ৩, ৫, ৬, ৭ নম্বরের ছবি

(গ) ৩ নম্বরের ছবির নৌকাতে শীলমাছের চামড়া ব্যবহার হয়ে থাকে এবং ৪ নম্বরের ছবির নৌকাটী বেতের বোনা হলেও বাইরে শুক্‌না চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে, যাতে ভেতরে জল না যেতে পারে।

(ঘ) ২ নম্বরের ছবির নৌকাটী ও বেতের বোনা কিন্তু তার ভেতরে ও বাইরে আলকাত্‌রা জাতীয় এক জিনিষ মাখান থাকে, যাতে ভেতরে জল প্রবেশ না করতে পারে।

৬। ৬ নম্বরের ছবি—একে সাধারণতঃ Liner বলা হয়ে থাকে।

"সংখ্যার খেলা"

শ্রী গণিত নাথ পণ্ডিত।

সংখ্যা নিয়ে অনেক রকম মজার খেলা খেলতে পারা যায় তাতে বেশ একটু বুদ্ধিকে নাড়া দেওয়া যায়, আর আনন্দও হয় যথেষ্ট। কয়েকটী উদাহরণ আমি দিচ্ছি; তোমরা সেগুলির উত্তর বার কর দেখি।

১। ঠিক পর পর ন'টী সংখ্যা নিয়ে এমন করে সাজাও, যে কোন সারেই তিনটীর বেশী সংখ্যা থাকবে না এবং তিনটীর বেশী সারও থাকবে না; আর চওড়া দিকে, লম্বাদিকে, আর কোণাকোণি সব দিকেই তাদের যোগফল হবে ৩৩।
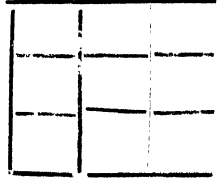
২। ৮ কে এমনভাবে আটবার লেখো যাতে তাদের যোগফল এক হাজার দাঁড়ায়। বলো না যেন ও হোতেই পারে না।

৩। একটী সংখ্যাকে তিন দিয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হলো এবং যা ফল হোলো তাকে দুই দিয়ে ভাগ করা হলে যা ফল দাঁড়ায়; তা মূল সংখ্যাটীর দ্বিগুণ। বলতো সংখ্যাটী কি?

৪। কোন্ সংখ্যাটীতে সেই সংখ্যাটী ন'বার যোগ করলে এমন ফল দাঁড়াবে, যা সেই সংখ্যার পাঁচগুণের চেয়ে পাঁচ বেশী? অত মাথা চুলকাতে হবে না। উত্তরটী খুবই সোজা।

৫। দুটী সংখ্যাকে গুণ করলে গুণফল হয় ১০। তার মধ্যে ছোটটি দিয়ে বড়টীকে ভাগ করলে ভাগফলও হয় ১০! সংখ্যা দুটী কি? কিছুতেই মনে আসছে না?

৬। একটী সংখ্যার চারিটী অংশ। প্রথম অংশটী দ্বিতীয়ের চেয়ে এক কম তৃতীয়টী প্রথম ও দ্বিতীয়ের যোগফলের সমান ও চতুর্থটী প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের যোগফলের সমান। সংখ্যাটী কি? আর অংশগুলিই বা কি? টপ্ করে বলে ফেলো ত!

৭। চারিটী সংখ্যার এমন একটী অঙ্ক বলো যাকে চার দিয়ে গুণ করলে গুণফল হবে, অঙ্কটীকে উল্টায়ে পড়লে যা হয়, তাই। বলত অঙ্কটী কি?

কথোপকথন।

নম্রতা

(মাদাম দ্য' ম্যাঁৎনঁর ফরাসী হইতে)

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

প্রীতা। আমি এক জায়গা থেকে এখনি আস্‌ছি, সেখানে মহাতর্ক বেধেছিল। একদল বল্লে, যে শ্রীমতী চৌধুরাণীর স্বভাব বড় নম্র, আর অন্য দল বল্লে যে তিনি মোটেই নম্র স্বভাবা ন'ন।

গীতা। আমারত মনে হয় যে, সব গুণের মধ্যে নম্রতা এমন একটী গুণ যা' সব চেয়ে চট করে' চোখে পড়ে, যার সম্বন্ধে সন্দেহ হবার কারণ সব চেয়ে কম।

নীতা। তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে আমার কিন্তু মোটেই মতে মেলে না ভাই। আমারও বিশ্বাস যে, এ স্থলে আমাদের যত বেশী ভুল করবার সম্ভাবনা, এমন আর কিছুতে নয়।

মিতা। কিন্তু ভাই দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধর, এ বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে, যে শ্রীমতী চৌধুরাণী অতি নম্র, আর শ্রীমতী মিত্রাণী অসহিষ্ণু এবং রূঢ়।

নীতা। অসহিষ্ণুতা এবং রূঢ়তার মধ্যে একটা মস্ত তফাৎ আছে বলে আমি মনে করি। আশা করি আমাকে তার্কিক মনে করবে না, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে শ্রীমতী চৌধুরাণীর চেয়ে শ্রীমতী মিত্রাণী বেশী নম্র।

সীতা। তুমি যাই বল না কেন দিদি, তু'জনকে একবার দেখলেই কিন্তু অন্য রকম বিশ্বাস দাঁড়ায়।

ঋতা। শ্রীমতী চৌধুরাণীর নম্রতা বাহিরের জিনিষেই আবদ্ধ, তাঁর ধীরতা, তাঁর গলার নরম আওয়াজ, তাঁর ব্যবহার, সব রুক্ষতার বিরোধী।

নীতা। এই সব লক্ষণ দেখেই লোকে একজনকে নম্র ঠাওরায়; কিন্তু এই কোমল কণ্ঠস্বরে তিনি বলেন কি? তাঁর সঙ্গে তাঁর স্বামী তাঁর বন্ধুবান্ধব, তাঁর চাকরবাকর, তাঁর পাড়াপড়শীর বনিবনাও কেমন হয়?

মিতা। তিনি যে খুব লোকপ্রিয়, তা, ন'ন; কিন্তু কেন ন'ন, তা বুঝতে পারিনি।

নীতা। আর সেই অপর রুক্ষ ঠাক্‌রুণটি ?

সীতা। তাঁকে লোকে ভালবাসে যদিও জানিনে কেন।

নীতা। এইত তাঁর পক্ষ অবলম্বনের একটা মস্ত কারণ।

মিতা। তিনি ভালবাসা পাবার যোগ্য হতে পারেন, ভালবাসা পেতে পারেন, অথচ নম্র নাও হতে পারেন।

নীতা।—তা সত্য, নম্র না হয়েও এমন হাজারো সদ্‌গুণ থাক্‌তে পারে, যার জন্য একজনকে লোকে ভালবাসে ; কিন্তু আমার মনে হয়, কোন না কোন প্রকারের নম্রতা না থাক্‌লে, সাধারণতঃ লোকপ্রিয় হওয়া কঠিন।

প্রীতা নম্রতা আবার নানা প্রকারের হয় নাকি ?

মিতা। আমারত তাই বিশ্বাস ; এমন লোক আছে যাদের বোধশক্তি কম, যাদের জীবনশক্তি কম, তাদের পক্ষে নম্রতা স্বাভাবিক।

নীতা। কিন্তু যথার্থ নম্রতা তা'হলে কাকে বলে ?

মিতা।—আমার মনে হয়, আমাদের বিরুদ্ধে যা কিছু, তাই ধীর শান্তভাবে সহ্য করার নামই যথার্থ নম্রতা।

সীতা। তা'হলে আমি নম্র নই, কারণ আমার প্রতিবাদ করলেই আমি রেগে যাই।

গীতা। আর আমার সঙ্গে যা'দের মতে মেলে না, তাদের প্রতি আমার একটা গভীর অবজ্ঞার ভাব মনে আসে ; কিন্তু কখনো রাগ হয় না।

নীতা। একে কি তুমি নম্র হওয়া বল ?

গীতা। তবুত দিদির তুলনায় নম্র বল্‌তেই হবে, কেননা তিনি প্রতিবাদ কর্‌লেই রেগে যান।

মিতা। আমি কিন্তু বলি, যে দিদিই বেশী নম্র, কারণ তর্ক করার চেয়ে এই তাচ্ছিল্য করার মধ্যে বেশী উগ্রতা প্রকাশ পায়।

নীতা। তবেই ত দেখতে পাচ্ছ ভাই, যে নম্রতা নানারকমের আছে।

ঋতা। আমি দৈনিক জীবনযাত্রা থেকে তর্ক বিতর্ককে নির্ব্বাসিত করতে চাই।

নীতা। তা'তে জীবনযাত্রা অপেক্ষাকৃত নীরস হয়ে যাবে, আর তোমাকে দেখে যে রকম নম্র মনে হচ্ছে, তোমার মুখে এরকম ইচ্ছা শোভা পায় না ; কারণ তর্ক করতে হবে, অথচ নম্রভাবে।

ঋতা। আমি কিন্তু এ কথাটা বুঝতে পার্‌লুম না, তা' স্বীকার করছি।

গীতা। কেন ভাই তুমি বুঝতে পার্‌ছনা যে, অন্য লোকের মত, তোমার সঙ্গে

নাও মিলতে পারে ? তোমার যদি ভুল হয়, তবে কি তুমি চাওনা যে, অন্যে সেটা ভাঙ্গিয়ে দেবে ? কিম্বা তোমার কথাই যদি ঠিক হয় ত অন্যকে সেটা বুঝিয়ে দেবে ?

সীতা। অন্য লোকের মত ঠিক তা' হাজার বুঝলেও, আমি স্বীকার করতে রাজি নই, আমি তাদের সঙ্গে তর্ক করে' থাকি।

নীতা। একেই ত বলে নম্রতার অভাব ; কারণ যখনি সত্যকে চিনবে, তখনই তা'কে মেনে নেওয়া উচিত, আর মিছামিছি তর্ক করা কখনোই উচিত নয়, অন্ততঃ গুরুতর বিষয়ে।

ঋতা। তুমি যা' বলছ তা করতে আমার কষ্ট বোধ হবে, তা' কিন্তু বলতেই হবে।

নীতা। একজন অতি বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোককে আমি এ কাজ করতে দেখেছি ; তাঁর যা' মত তার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বল্লে, তিনি স্বাভাবিক ওজস্বিতার সঙ্গে তর্ক করতেন, এবং তাতে এমন একটু অহঙ্কারের ভাব থাকত, যাতে বেশ বোঝা যেত তাঁর খুব বিশ্বাস যে, তিনি অপরপক্ষকে স্বমতে আনতে পারবেন ; অথচ যেমনি একটা কোন যুক্তি শুনতেন যা'তে নিজের মত পরিবর্ত্তন হত, অমনি চট করে থেমে যেতেন ও ভুল স্বীকার করতেন।

গীতা। আমার ত মনে হয় এতে কিঞ্চিৎ ভীরুতা প্রকাশ পায়।

নীতা। ভগবান করুন যেন আমরা সাহস ও জেদকে এক জিনিষ বলে ভুল না করি। আমি যাঁর কথা এখনি বল্লুম, তাঁর ব্যবহারে লোকে মুগ্ধ হয়ে যেত, এবং তাঁর অন্য হাজার অগুণ থাকা সত্ত্বেও এই এক গুণের জন্যই তিনি বহুমান্য হতেন।

মিতা। এ রকম ব্যবহারে ভীরুতা দূরে থাক্, আমার ত মনে হয় মহত্ত্ব প্রকাশ পায়।

নীতা। তুমি ঠিকই বলেছ ভাই ; সত্যকে, ন্যায়কে মেনে নেওয়ার মত এমন মহত্ত্ব আর কিছুই নেই।

গীতা। আমি ত বরাবর শুনে আস্‌ছি যে নিজের যুক্তি সমর্থন করবার মধ্যে একটা সাহস আছে।

নীতা। শক্ত কাজে পিছপা' না হওয়া, বা নিজের মধ্যে বা অন্যের মধ্যে যে-সকল বাধা প্রাপ্ত হওয়া যায় তা' অতিক্রম করা, বা যে কোন কার্য্যে ব্রতী হই তার আনুসঙ্গিক দুঃখকষ্ট সহ্য করা,—এ সবের মধ্যে সাহস আছে বটে ; কিন্তু এ সকল জিনিষ ন্যায় এবং যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই।

প্রীতা। আমরা নম্রতার কথা ভুলে গেছি ; আমার মনে হয় আমরা যা' বলছি, তার সঙ্গে তার কোন যোগ নেই।

নীতা। এই গুণের সঙ্গে সব কিছুরই যোগ আছে দিদি ; এক প্রকার মেজাজের

নম্রতা আছে, যা'তে করে' আমরা সব জিনিষকে বিনা কষ্ট এবং বিনা ঝাঁঝের সঙ্গে গ্রহণ কর্‌তে পারি ; এক প্রকার ব্যবহারের নম্রতা আছে, যা'তে করে আমরা সত্যকে মেনে নিতে পারি ; আর একপ্রকার হৃদয়ের নম্রতা আছে, যা'তে করে' আমরা আশপাশের লোকের সঙ্গে শান্তিতে বাস কর্‌তে ভালবাসি ; সেইটেই সব চেয়ে দরকারী।

ঋতা। আর সেইটেই সব চেয়ে দুর্লভ।

নীতা। ব্যাপকভাবে ধর্‌তে গেলে দুর্লভ হতে পারে ; কিন্তু এমন অনেক লোক আছে যা'দের দেখলে রুক্ষ মনে হয়, অথচ যাদের অন্তর বাস্তবিক তা' নয়।

মিতা। বাহ্যিক লক্ষণ দেখে লোকে নম্রতার বিচার করে, কিন্তু কখনো কখনো তার অন্তরে বিষম ধাঁধা লুকিয়ে থাকে।

গীতা। নিজের স্বভাব এই গুণের যতই বিরোধী হোক্ না কেন, তাকে কি অর্জ্জন করা যায় না ?

নীতা। ভগবৎ কৃপায় সব গুণই অর্জ্জন করা যায়, আমার বিশ্বাস যে, নম্র ব্যবহার কর্‌তে কর্‌তে শীঘ্রই নম্র হওয়া যায়,—যারা স্বভাব-নম্র তা'দের চেয়ে বেশি বই কম নয়।

প্রীতা। আমার মনে হয় বিনয়ের সঙ্গে এই গুণের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য।

মিতা। তা' সত্য, আমার মনে হয় ধৈর্য্যের সঙ্গেও তথৈবচ।

গীতা। যা'হোক, আজকের এই কথোপকথনে আমাদের অনেক উপকার হ'ল।

নীতা। হ্যাঁ, যদি আলোচিত গুণগুলির চর্চ্চা করতে প্রবৃত্ত করায়, তবেই বল্‌ব উপকার হয়েছে।

বিসর্জ্জন

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

পাহাড়ের কোলে ছোট্ট বাড়ীখানি—ছবিরই মত দেখায়। দোতালায় ক্ষুদ্র ঘরটীতে বসে চঞ্চল আপন মনে ছবি আঁকে আর আন্‌মনে গুন্‌গুনিয়ে গান গায়।

নির্জ্জনবাসে দিনের পর দিন কাটে—পাহাড়িয়াদের সঙ্গে তাদের উৎসবের সাথী হয়—দুঃখে তাদের প্রাণের ব্যথায় নিজের দরদী হিয়া মিলিয়ে কাঁদে। সভ্যতার লীলাভূমি সহরের কোলে ফিরে যেতে প্রাণে ব্যথা বাজে—অতীতের কথা ভেবে দুঃখে বুক ব্যথিয়ে ওঠে; তাই কত সময় চোখের জলে গণ্ড ভেসে যায়।

কি সরল প্রাণভরা ভালবাসা নিয়ে এই অসভ্যরা তাকে সব ব্যথা ভুলিয়ে সুখে দুঃখে তিন তিনটে বছর বাঁচিয়ে রেখেছে।

বিদ্রূপ করে তাদের যখন বলে,—"এ জায়গা ছেড়ে চলে যাব!

তা'রা ব্যথিত কণ্ঠে বলে,—"কি অপরাধ করেছি আমরা বাবুজি!"

এদের সহানুভূতিতে আনন্দে তার চোখ ছাপিয়ে অশ্রু নেমে আসে।

বুকের ভিতর টেনে নিয়ে বলে,—"তোদের ছেড়ে যেতে কি পারি? তোরা যে আমার সব—আমার ইহকাল—পরকাল।"

তারা যাবার সময় শাসিয়ে বলে যায়—"অমন কথা বল্‌বি তো বাবুজি তোর এখানে আর আস্‌ব না।"

চঞ্চল একমনে এদের চলার ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে থাকে—ভাবে, স্নেহ ও ভাল-বাসার খনি কি ভগবান এদের বুকে এনে লুকিয়ে রেখেছেন!

তার ছবি সহরের বাজারে বিক্রি হয়—অর্থ যা আসে তা' এই দরিদ্র অনাহারী বিপন্নদের তরেই খরচ হয়।

এদের শিক্ষার ভার নিয়েছে সে—দেবী সরস্বতীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় তার অর্থ সামর্থ দুই-ই দিয়ে।

ভাবে—সভ্যতার এই আলোকে বুঝিবা তারা হয়ে উঠ্‌বে অত্যাচারী ও অসত্যা-শ্রয়ী—সভ্য সমাজের মত এরাও একদিন মার্‌বে বুকে ছুরি—দরদীকে দেবে তাড়িয়ে।

শিক্ষা তবুও দিতে হয়। যে আকাঙ্খা সে একবার এদের বুকে জাগ্রত করে দিয়েছে তা' থেকে এদের বঞ্চিত কর্‌তে সে কিছুতেই পারবে না!

* * * *

কলিকাতায় বড় প্রদর্শনী—তার ছবি বিক্রেতা লিখেছে একখানা ভাল ছবি পাঠিয়ে দিতে।

পুরান ছবির গাদা পড়ে আছে। চঞ্চল তা' থেকে বাছতে থাকে একটাও পছন্দ হয় না। যে ছবিখানিকে একদিন সে ভাবত তার শ্রেষ্ঠ শিল্প, সেখানার রূপও যেন আজ ম্লান, নিস্প্রভ হয়ে পড়ে।

একখানা ছবি তার হাতের কাছে এসে পড়ে, পাঁচ বছর আগেকার আঁকা—সেদিন এই শিল্পটুকুই তাকে লোক সমাজে শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। এক দৃষ্টে তাকিয়ে দেখে ভাবে, সেদিন প্রাণের ভিতর যে ভাব নিয়ে এইখানাকে সে এঁকেছিল তাতো সবই আজ মিথ্যায় ভরে উঠেছে, তবুও সেদিন সে একেই ভেবেছিল তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন!

ছবি আঁকবার সময় সেদিন সে শুধু—বেলাকেই তার মনের কোণে স্থান দিয়েছিল। আর তার প্রাণের ভাবটাকেই সেদিন মডেল করে নিয়েছিল—নিজের মনে প্রাণে। কিন্তু যেদিন সেই বেলা তার দারিদ্রকে উপেক্ষা করে ধনীর ঘরে চলে গেল—সেদিন মনে হয়েছিল, এ বিশ্বের সবই মিথ্যা—সত্য বলে ভগবান কিছুই সৃষ্টি করেননি। তাইত তার এই গিরিগুহায়—নির্জ্জন বাস। মানুষকে সে সেদিন ঘৃণা করে, অমানুষদের ভিতর এসে ঘর বেঁধেছে।

কিন্তু অন্ধকারটা যেখানে বেশী বলেই সে ভাব্‌ত অলোকটা যেন সেই-স্থানেই সব চেয়ে বেশী বলে, আজ তার ধারণা হয়েছে; তাই অতীতের যা কিছু, সবই মিথ্যার ভরপুর, তার ভিতর সত্যের এক কণাও যেন সে খুঁজে পায় না।

ভাবে, এ মিথ্যার বোঝা বয়ে কি লাভ হবে তার। ছবিগুলিকে বাইরে নিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দেয় জ্বালিয়ে—দাউ দাউ করে আগুণ জ্বলে ওঠে—সব পুড়ে ছাই হোয়ে যায়। মাটিতে বসে গালে হাত দিয়ে সেই আগুণের দিকে তাকিয়ে কত কথা ভাবে—কত দিবসের কথা মনের পরে স্মৃতির জাল বুনে দিয়ে যায়—সে আন্‌মনা হয়ে পড়ে।

সারাজীবন বসে যে কল্পনাকে সে রূপ দিয়েছিল তা' আজ এক নিমেষে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

সোনা ও লখিয়া বই বগলে সাম্‌নে এসে বলে—"একি বাবুজি!"

পাগলের ন্যায় হেসে চঞ্চল বলে,—"আমার বুকের বোঝা আজ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিলুম্‌রে !"

এমনধারা তারা তাদের বাবুজীকে কখনো দেখে নাই ; তাই আশ্চর্য্য চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

চঞ্চল এগিয়ে এসে বলে—"কি ? পড়্‌তে এসেছিস্‌ ! আয় !"

দু'জনে ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর প্রবেশ করে। চঞ্চল তাদের পড়াতে পড়াতে বলে,—"পড়্‌তে তোরা শিখিস্‌নারে লখিয়া, তা'হলে তোদের নিজেদের কথা তোরা ভুলে যাবিরে। শিখ্‌বি ঐ মিথ্যাবাদীদের বুলি – কর্‌বি তাদেরই ন্যায় কাজ ! এই যে সোনা তোর পরে নির্ভর করে আছে, তাকেই তুই দিবি দূর দূর করে তাড়িয়ে !

লখিয়া সোনার দিকে তাকায়—একথা যেন তারা ভাব্‌তেও পারে না।

চঞ্চল গম্ভীর মুখে বলে,—"পড়্‌তে আর তোরা আসিস্‌ নারে ! পড়াতে আমি আর পার্‌ব না—একটু একটু করে বিষ দিয়ে প্রাণটাকে তোদের আমি মেরে ফেল্‌তে পার্‌ব নারে।"

লখিয়া বলে,—তুমিইতো বোলেছ লেখাপড়া কর্‌তে, তা'হলে নাকি পৃথিবীর সব খবর জানা যায়···

চঞ্চল বাধা দিয়ে বলে,—"তা'তো যায় ; কিন্তু সেই জানাটাই একদিন হয়ে উঠ্‌বে তোদের কাল—রাহুর ন্যায় যা কিছু তোদের আছে—সবই গ্রাস করে বস্‌বে। তা থেকে উদ্ধার পাবি কি করে !"

হেসে তারা বলে,—"উদ্ধার আমরা চাই না।"

অন্যন্যোপায় হয়ে চঞ্চল তাদের পড়া বলে দেয়। এক এক করে পাঠার্থিরা এসে ঘর ভরে ফেলে। চঞ্চল কাজের নেশায় সব ভুলে যায়—প্রাণের সকল দরদ দিয়ে এদের শিক্ষা দিতে থাকে।

* * * * *

ছবি আঁকা আর হয় না—এদের নিয়েই দিন কাটে। রাতও যায় এদের পরিচর্য্যায়। ধীরে ধীরে নিজেকে চঞ্চল একেবারে বন্য করে তুল্‌তে চায়। তাই এদের সুরে সুর মিলিয়ে জীবনের দিনগুলো কোন রকমে কাটিয়ে দেয়।

লখিয়ার পিতা বৃদ্ধ সর্দ্দার একদিন এসে বলে,—বাবুজি আমাদের নাকি এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে ?

চঞ্চল বলে,—"কেন ?"

সর্দ্দার বলে,—দূরে পাহাড়ের ওধারে একটা বাবু, এই তিন মাস হয় তাবু

ফেলে বসেছে—পাহাড়টা মাপ ঝোক কর্‌ছে—কিসের নাকি খনি আছে। একটা কারখানা বসাবে—সব জমিই নাকি এরা কিনে নিয়েছে সরকারের কাছ থেকে।”

চঞ্চল বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে,—বেশ হয়েছে—চার আনায় কুলিগিরি কর্‌তে পর্‌বি।

সরোষে গর্জ্জন করে সর্দ্দার বলে,—“তা’ হবেনা বাবুজি, আমরা আমাদের গাঁ’ ছাড়্‌তে যাব কেন।”

—“তোরা কি ইচ্ছে করে ছাড়্‌বি রে? জোর করে তোদের অধিকারে তারা আস্‌বে—রাজার আইন যে এদেরই জন্যেরে বোকা! তোদের মর্‌বারই অধিকার আছে—মারবার নয়।”

—“বেশ আমরা মর্‌তেই চাই, তবুও এ জায়গা ছাড়্‌ব না!”

চঞ্চলের মন অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে। ভাবে—নিরীহ, অন্নহীন, গৃহহীন কাঙ্গাল এরা; এদের তাড়িয়ে—কি লাভ হবে তোমাদের? পৃথিবীর বুকে এত স্থান থাকতেও কি কারখানা তোমাদের এখানেই কর্‌তে হবে! সভ্যতা কি এম্‌নি করেই থেথ্‌লিয়ে থেথ্‌লিয়ে মানুষকে মার্‌বে—বঁচেতে দেবে না।

কথাটা পল্লীময় রাষ্ট্র হয়ে পড়ে—সকলের বুক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে বাবুজির দরজায় এসে প্রতিকারের পথ খোঁজে।

চঞ্চল ভাবে—এরা তাকেই আশ্রয় করে নেয় কেন? এদের গোত্রের সঙ্গে তা’রতো কোন সম্বন্ধই নাই! তবুও এরা চায় তাকে—ভাবে, তাহাদেরই যেন একজন!

* * * *

ভিত্তিহীন কথাটা একদিন সত্যেই পরিণত হয়। তিনমাসের ভিতর এদের ঘরবাড়ি ছেড়ে যেতে হবে, এই-ই কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ।

চঞ্চলের উৎসাহে এরা জানাল, পিতৃপুরুষের ভিটে তারা ছাড়্‌বে না।

অনেক চোখ রাঙ্গানি—ভয় কিছুই কর্‌তে পারেনা এদের।—মৃত্যুপণ করে বসে রইল নিজেদের মাটীটুকুকে কাম্‌ড়ে।

কর্ত্তৃপক্ষের পাইক পেয়াদা এসে অত্যাচার সুরু করে দিল—তবুও এরা চঞ্চলকে কেন্দ্র করে, তা’র কথার পরে নির্ভর করে, সমস্ত উপদ্রব নির্ব্বিবাদে সহ্য কর্‌লে; কিন্তু একদিন তাদের সহ্যের সমস্ত বাঁধ ভেঙ্গে গেল, যেদিন তারা দেখ্‌ল চঞ্চলকে বন্দী—সমস্ত শরীরে অত্যাচারের চিহ্নে, রক্তে রঙ্গিন।

জেলের দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল এরা।

রাতে কি একটা পরামর্শ হ'ল। যে বন্য প্রকৃতি এতদিন সুপ্ত ছিল, তা' যেন মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় জাগরিত হয়ে উঠ্‌ল—সকলকে তার উদ্বুদ্ধ চেতনার পরিচয় দিতে।

অন্ধকারের আবরণে সকল পল্লী ভেঙ্গে তারা ছুট্‌ল পাহাড় ডিঙ্গিয়ে—যেখানে তাদের শত্রুর আস্তানা—মাসের পর মাস অত্যাচারই করে আস্‌ছে।

হিংসার আগুনে কেহই বেঁচে রইল না। একটা মহাপ্রলয়ের ন্যায় সমস্ত মাটীর সাথে মিশিয়ে দিয়ে—তারা কোথায় চলে গেল তার ঠিকানা কেহই পেল না।

* * *

চঞ্চল জেল থেকে বেরিয়ে এসে সবই শুন্‌ল চোখের কোণে অশ্রু জমে সমস্ত ঝাপ্‌সা করে দিল। সভ্য মানবের অবৈধ অত্যাচারে একদল শিশুরই ন্যায় সরল, নির্ব্বিবাদী মানুষ আজ বনে জঙ্গলে ঘুর্‌ছে - হয়ত আহার তাদের নাই—পানীয়ের অভাবে কতজন হয়তো পৃথিবীর বুকে শেষ নিশ্বাসের সাথে কত অভিশাপ রেখে যাচ্ছে। সে অভিশাপের হাত থেকে ত্রাণ পাবার শক্তি এ সভ্য সমাজের আছে কি?

বহুদিন পরে চঞ্চল নিজের বাড়ীর দরজায় দাড়াতেই সম্মুখে দেখে বেলা—শুভ্র-বেশ—সীথির সিঁন্দূর মুছে ফেলেছে। অজ্ঞাতেই তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল,—"এ কি বেলা।"

গম্ভীরস্বরে বেলা বল্লে,—"তোমারই কীর্ত্তি!"

চঞ্চল কিছুই বুঝ্‌তে পারে না—প্রশ্ন করে "সে কি?"

রুক্ষস্বরে বেলা উত্তর দেয়—"তুমিই তো ভীলদের দিয়ে মার্‌লে তাকে—এতই যদি অসহ্য হয়েছিল, আমাকে একবার জানাইলেই তো পার্‌তে। ছিঃ ছিঃ তুমি যে এত ছোট, তা'ত এক মুহূর্ত্তেও ভাবিনি!"

চঞ্চলের কণ্ঠে কোন স্বরই উঠ্‌ল না। নিস্পলক দৃষ্টিতে সে বেলার দিকে চেয়ে থাকে। কিছুইতো সে এর জানে না!

সে আবার বল্‌তে লাগ্‌ল,—"ভেবেছ এম্‌নি করে আমায় তুমি পাবে—সেটা স্বপ্নেও ভেবনা।"

হাঃ হাঃ করে—পাগলের হাসি হেসে চঞ্চল বেরিয়ে যায়।

কাঁচকলার কোপ্তা।

শ্রীসুহাসিনী দেবী।

উপকরণ ঃ—কাঁচকলা চারিটি, আদা দুই গিরে, কাঁচালঙ্কা দুইটী, বাগানের মসলা দুই ডাল, ছোট এলাচ দুইটি, লবঙ্গ চারিটি, দারুচিনি একগাঁট, গোলমরিচ গুঁড়া এক চিমটি, ছোলার ছাতু এক ছটাক, পাতিনেবু একটি, কিসমিস এক ছটাক, নুন আন্দাজ মত, চিনি আধকাঁচ্চা, ঘি আধ পোয়া।

প্রণালী ঃ—কাঁচকলাগুলি ছাড়াইয়া সিদ্ধ কর, সিদ্ধ হইলে সেগুলিকে বেশ করিয়া চটকাইয়া লও। আধ গিরা আদা কিমা করিয়া কুঁচাও, দেড় গিরা আদা বাটিয়া রাখ, কাঁচা লঙ্কাও বাগানের মশলা কুঁচাইয়া রাখ। এইবার আদা বাটা ও কিমা, বাগানের মশলা ও লঙ্কা কুঁচি, গরম মশলার গুঁড়া ও গোলমরিচ গুঁড়া, পাতি নেবুর রস, কিসমিস, নুন ও চিনি কাঁচকলার সঙ্গে মিশাও, একটু চেপ্টা ভাবের লেচী কাট। ঘি চড়াও, একটু লাল করিয়া ভাজিয়া উঠাও। গরম গরম খাইতে দিবে।

ইচ্ছা করিলে এই ভাজা কোপ্তার কারী বা কালিয়াও করিতে পার।

কাসুন্দি মাছ।

উপকরণ :—ইলিস্ বা ভেটকি মাছ একটা, মাঝারি পেঁয়াজ চারিটা, আদা দুই গিরা, রসুন চার কোয়া, কাসুন্দি বা তেঁতুল এক ছটাক, ঘি বা সরিষার তেল এক ছটাক, কলাপাতা খান দুই, দড়ি খানিকটা, নুন ও চিনি আন্দাজ মত, হলুদ এক গিরে, যদি তেঁতুল দিয়া কর তাহা হইলে সরিষা এক তোলা, কাঁচালঙ্কা আটটি, ঘি তিন ছটাক।

প্রণালী :—পেঁয়াজ, আদা, রসুন হলুদ এবং যদি সরিষা দাও তাহা হইলে সরিষা এক সঙ্গে বাটিয়া রাখ। এইবার কাসুন্দি বা তেঁতুল বাটা মশলা আর ঘি বেশ করিয়া চটকাইয়া মাখ, কাঁচালঙ্কা ভাঙ্গিয়া মেশাও, আন্দাজ মত নুন ও চিনি মিশাও। মাছটা আস্ত বানাইয়া পরিষ্কার করিয়া আঁশ ছাড়াইয়া ফুলকোপোঁটা বাদ দিয়া ধুইয়া লও। ছুরি দিয়া মাছের গায়ে বেশ গভীর করিয়া চিরিয়া দাও, যাহাতে মশলা ভিতরে ঢুকান যায়, কিন্তু দেখ, মাছ যেন কাঁটার গা হইতে না ছাড়িয়া যায়। মাছটা একটা কলাপাতার উপর রাখিয়া চিরার ভিতর মশলা ভরিয়া দাও, এবং বাকী মশলাটা মাছের বাহিরটায় বেশ করিয়া মাখাইয়া দাও, তারপর যা' অবশিষ্ট থাকে মাছের উপর ঢালিয়া দাও। এইবার কলাপাতাখানি দিয়া মাছটা বেশ করে মুড়িয়া ফেলিয়া দড়ি বাঁধ। এইবার অল্প আঁচে একটা তাওয়া চড়াও, মাছটা তাহার উপর পোড়াইতে দাও। টিপিয়া দেখ মাছটা নরম হইয়াছে কিনা। যদি হইয়া থাকে তাহা হইতে নামাইয়া পাতা খানা খুলিয়া মাছটা মশলা সমেত একটা প্লেটে ঢালিয়া ফেল।

আতার পায়স।

উপকরণ :—দুধ দুইসের, বড় আতা আটটি, চিনি আধসের, পেস্তা এক ছটাক।

প্রণালী :—আতাগুলি খোসা ছাড়াইয়া বিচি বাহির করিয়া ফেল, দুধ চড়াও, চিনি ঢাল, তারপর বেশ করিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া ক্ষীর কর। আন্দাজ তিন পোয়া থাকিতে থাকিতে নামাও। ক্ষীরটা ঠাণ্ডা হইলে আতাগুলি ছাড়। হাতা দিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া ক্ষীরেতে আতাতে মিশাইয়া লও। গোলাপজল দাও, পেস্তা কুঁচাইয়া ছড়াইয়া দাও। ইচ্ছা করিলে বরফের কুচি দিয়া খাইতে দিতে পার।

মামলেড বা কমলানেবুর জ্যাম।

উপকরণ :—গোঁড়ালেবু ছয়টি, মিষ্ট কমলালেবু একটি, পাতিনেবু আধখানা, চিনি, জল।

প্রণালী :—খোসা না ছাড়াইয়া নেবুগুলির রস বাহির করিয়া লও। নেবুর

বিচিগুলি পাথর বাটিতে ডুবজলে ভিজাইয়া দাও, বাটিটা নিবান উনানের গরমে বসাইয়া রাখ কুড়ুনী দিয়া নিংড়ান নেবুগুলি কুড়িয়া ফেল। সব রসই একটা মাটির হাঁড়িতে ঢাল। কোড়ানেবু ওজন কর। সের পিছু আড়াই সের জল দাও। তারপর নেবু কোড়া, বিচি, রস ও জল সব মিশাও। চব্বিশ ঘণ্টা ভিজিতে দাও। চব্বিশ ঘণ্টা পরে সবটা জল দাও, কাঁটা দিয়া বিচিগুলি ভাঙ্গিতে পারিলেই নামাও। আবার চব্বিশ ঘণ্টা ভিজিতে দাও। এইবার আবার ওজন করিয়া চিনি মিশাও। সের পিছু একসের করিয়া চিনি লও। যতক্ষণ না বেশ ঘন হয় ততক্ষণ ফোটাও। তারপর শিশিতে ঢাল। ঢালিবার পূর্ব্বে শিশিগুলি সামান্য তাতাইয়া লও।

মালপুয়া

উপকরণ ঃ—একপোয়া ময়দা, ঘি এক পোয়া, চিনি আধসের, দুধ আধসের ছোট এলাচি চূর্ণ চারি পয়সার।

প্রস্তুত প্রণালী ঃ—প্রথমে দুধ আধসের জ্বাল দিয়ে ক্ষীরের মত করে রাখ্‌বে। চিনি আধসের একটি পাত্রে আধপো জল দিয়ে বসিয়ে দেবে। রস ফুট্‌তে ফুট্‌তে সামান্য চিনির ময়লা জমবে। তখন সামান্য একটু দুধে জল মিশিয়ে রসে ঢেলে দেবে। তবেই রসের ময়লা কেটে বেশ পরিষ্কার রস হবে। রস একটু চিটে মত হলে নামিয়ে রাখ্‌বে। একটী পাত্রে ময়দা এক পো ঘি চায়ের চামচের ২ চামচ নিয়ে, ময়দাতে মাখাতে থাক, বেশ মাখা হলে, ঐ যে ক্ষীর করা আছে ঐ ময়দাতে গুলে নেবে, বেশ গোলা মাখা হলে এলাচির চূর্ণ দেবে। যদি গোলা, গোলা না হয়, তবে সামান্য জল দিয়ে রাবরীর মত করে নেবে, উনুনে ঘি বসিয়ে দাও, সবটা দিলেই ভাল হয়। ঘি গরম হলে একখানি চামচ দিয়ে ঐ গরম ঘির মধ্যে ঠিক লুচির মত করে ঐ গোলা ময়দাতে চড়াবে। ঠিক ফুলে লুচির মত হবে। নামিয়ে নামিয়ে ভাজ্‌বে মধ্যে যেন কাঁচা না থাকে। লালকরে ভেজে ঐ রসে ফেল্‌বে। ঠাণ্ডা হলে খেয়ে দেখবে কেমন ভাল লাগে।

গজা

উপকরণ ঃ—ময়দা এক পো, ঘি এক পো, চিনি আধসের। সোডা বাই কার্ব্ব দু পয়সার। কালজিরে এক পয়সার।

প্রস্তুত প্রণালী ঃ—প্রথমে এক পোয়া ময়দা, একটী পাত্রে নিয়ে চায়ের চামচের ৬ চামচ ঘি, কালজিরে এক পয়সার, সোডা বাই কার্ব্ব দু চিম্‌টী নিয়ে বেশ করে মাখ্‌তে থাক। মাখা হলে জল দিয়ে ঠাস্‌তে থাক, সাবধান জল যেন বেশী না হয় অথচ ঠাসা খুব নরম হলে ভাল হবে। ঠাসা খুব ভাল হলে ঐ ময়দাতে ৪ খানা লেচি করে

রেখে দাও। ময়দা মাখার আগেই ঠিক মালপুয়ার রসের মতো রস করে রেখে দেবে, উনুনে ঘি সবটা বসিয়ে দাও। চাকি বেলনা নিয়ে একখানা লেচি একটু তেল নিয়ে বেলতে থাক; আমাদের আঙ্গুল যেমন পুরু ঠিক তার আর্দ্ধেক মোটা করে বেলে, ছুরী দিয়ে সবটা বেলা ময়দা বরফির মত করে কেটে গরম ঘিয়ে ছাড়্বে; বেশ লাল করে ভেজে নামিয়ে রাখবে। এই রকম সব লেচি বেলে ছুরীদিয়ে কেটে ভেজে নামাবে। একখান চাটু উনুনে বসিয়ে দেবে। এবং আর্দ্ধেকটা রস ঢেলে দেবে। রসটা প্রায় চিনির মত হয়ে এলে ঐ যে গজা ভাজা আর্দ্ধেকটা ঢেলে দেবে। যদি উনুনে আঁচ বেশী থাকে তবে চাটু নামিয়ে নামিয়ে নিবে। রসে গজাতে যখন এক সঙ্গে ঠিক চিনি মাখার মত হবে তখন নামিয়ে ঢেলে রাখবে। বাকি রসে ভাজা গজা দিয়ে ঠিক ঐ রকম করে ঠিক করে নেবে। একেই বলে কুচা গজা। বড় জিভে গজা নয় কিন্তু।

কাশ্মিরী চাট্নী

উপকরণ ঃ—চিনি এক পো, ছোট এলাচি বড় এলাচি দারুচিনি দু আনার, কিস্‌মিস দু আনার, আদা দু পয়সার, আম আঠিছাড়া ১০টী—যে আমে আটি হয়েছে সে আমে চাটনী ভাল হয় না।

প্রস্তুত প্রণালী ঃ—আম ১০টী কুচিয়ে ধুয়ে নুন মেখে বেশ কড়া রোদে শুকুতে দেবে। একটী পাত্রে উনুনে চিনি এক পো বসিয়ে দেবে। আম রোদে ঝড়ঝড়ে শুক্‌নো হলে এনে রেখে দেবে। চিনির রস একটু চিটে মত হলে আম ছেড়ে দেবে। সেই সঙ্গে এলাচি দারুচিনি, সম্ভব মত একটু নুন দেবে। আদা কুঁচিয়ে কিসমিস্‌ বেছে ধুয়ে রাখ্‌বে। আমে রসে এলাচিতে জ্বাল হয়ে যখন খুব চিটে মত হবে তখন আদা কুচান ও কিসমিস্‌ ঢেলে দেবে। একটু ফুটে উঠ্‌লেই নামিয়ে পাথরের পাত্রে ঢেলে দেবে। ঠাণ্ডা হলে কাঁচের শিশিতে ঢেলে একটু সরষের তেল দিয়ে মুখ বন্ধ করে দেবে। প্রায়ই রোদে দেবে। একেই বলে “কচি আমের—কাশ্মিরী চাট্নী।

সঞ্চয়ন

সুন্দরীর আদর—তোমরা সকলেই লক্ষ্য করে দেখে থাক্‌বে যে, আমাদের দেশে যে প্রচলিত টাকা, মোহর, নোট্‌, টিকিট ইত্যাদি আছে—তার উপর যখন যিনি রাজা বা রাণী থাকেন, তাঁর মুখের প্রতিকৃতি থাকে। শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেতে-ই এই প্রথার প্রচলন ছিল—এতদিন পর্য্যন্ত। কিন্তু এখন কয়েকটী দেশের গবর্ণমেণ্ট, তাঁদের মুদ্রা, নোট্‌, টিকিট ইত্যাদির উপর রাজা, রাণী ও বড় বড় নাম করা লোকেদের বৃত্তান্ত ,খ্যাত এবং অখ্যাত সুন্দরীদের মুখের প্রতিকৃতি দিতে আরম্ভ করেছেন।

যে সব দেশে রাজা নেই এবং প্রজাতন্ত্র পালন প্রণালী প্রচলিত আছে, শুধু যে তাঁরাই এই রকম করতে আরম্ভ করেছেন, তা নয়। যে সব দেশে রাজা এখনও বর্ত্তমান, তাঁদের মধ্যেও অনেকে এই রকমে সৌন্দর্য্যের সমাদর করতে আরম্ভ করেছেন।

সুইডেনে ত রাজা পঞ্চম গাষ্টভ্‌ এখনও জীবিত আছেন। ইচ্ছা কল্লেই তিনি মুদ্রাদির উপর তাঁর নিজের মুখের প্রতিকৃতি দিতে পারেন। কিন্তু তিনিও ঠিক করেছেন, যে এবারে যে নূতন নোট্‌ বেরোবে তার উপর একটী সুন্দরী মেয়ের মুখের ছাপ্‌ দেওয়া হবে। তাঁর সম্রাজ্যের নিতান্ত একটী ছোট্ট সহরের এক সাধারণ বণিকের মেয়েকে এই উদ্দেশ্যে বেছে নেওয়া হয়েছে। মেয়েটীর নাম Yaoken Von Schmitterlow

ইটালি দেশের লোকেরাও এই নূতন পদ্ধতি অনুসারে তাদের মুদ্রা, নোট্‌ ইত্যাদি ছাপ্‌তে আরম্ভ করেছে। সেখানকার অনেকগুলি নোটের উপর একটী অখ্যাত ইটালি মেয়ের মুখ আঁকা আছে দেখা যায়। তাঁর নাম হচ্ছে Signorina Hild Piccolo অনেকগুলি বিখ্যাত চিত্রকর এবং ভাস্কর্য্যবিদ্যার পণ্ডিতকে নিয়ে একটী কমিটি তৈরী হয়—তাঁরাই অনেকগুলি মেয়ের মধ্য থেকে এঁকে বেছে নিয়েছেন।

কয়েক মাস পরেই এই ইটালি দেশেই নতুন "গবর্ণমেণ্ট বণ্ড্‌" বেরোবার কথা হয়। তখন আবার আর একজন সুন্দরীর খোঁজে পড়ল। এবার ও পছন্দের ভার পড়ল একদল চিত্রকরের উপর। এবার নির্ব্বাচিত হলেন "মিলান" সহরের Signorina Esperia Sperani নামক একটী মেয়ে—এঁরই মুখ এই নূতন Government Bond গুলির উপর দেখা যায়।

হাঙ্গারি এবং রুশ দেশেও এই রকম প্রসিদ্ধ এবং অপ্রসিদ্ধ সুন্দরীদের প্রতি-যোগীতার মতন হয়। অন্যান্য দেশের মত এই দুই দেশেও বিচারের ভার ছিল চিত্রকর-দের উপর। রুশ দেশে Agnes Mosjonkin নাম্নী একটী অনামা সাধারণ ঘরের মেয়েকে বেছে নেওয়া হয়েছে এবং হাঙ্গরি দেশে হাজার হাজার মেয়েদের মধ্য থেকে Mell Hona Horvakn নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

স্বাভাবিক উপায়ে রঙিন্ রেশম তৈরী:—তোমরা যে সব রঙিন্ সিল্কের সাড়ী, জামা ইত্যাদি পর তা সবই রসায়ণিক উপায়ে রং করা। কেবল আমাদের দেশে যে তসর মট্‌কা, এবং মুগাশিল্প পাওয়া যায়, তাদের রং স্বাভাবিক।

কিন্তু আমেরিকাতে কয়েক বছর হোল শ্রীযুক্ত ভার্শিয়ান্ ওশিজিয়ান নামক এক ডাক্তার, স্বাভাবিক উপায়ে রঙিন্ রেশম প্রস্তুত কর্‌বার উপায় আবিষ্কার করেছেন। বৈজ্ঞানিক নিয়মাধীন করে তিনি গুটি পোকাগুলির আহার্য্যের তারতম্য করে দেন মাত্র; তারই ফলে পোকাগুলি নানা রকম সুন্দর সুন্দর রংয়ের রঙিন্ লালা নিঃসরণ করে।

এই রকমে তিনি তাঁর গুটিপোকাগুলিদ্বারা আঠার রকমের রঙ্গিন রেশমের সুতা স্বাভাবিক উপায়ে তৈরী কর্‌তে পারেন। অনেকে গিয়ে দেখে এসেছেন যে বাস্তবিকই তাঁর চাষের গুটিপোকাগুলি নিজেরাই রংবেরংয়ের রেশম উৎপাদন করেছে—এবং সেখানে রং করবার কোন রকম রসায়নিক পন্থা অবলম্বন করা হয় না।

অদ্ভুত স্মরণ শক্তি—

কোনও স্কুলে যদি খোঁজ নেওয়া হয় তাহলে অঙ্ক খুব— ভালবাসে এরকম মেয়ের সংখ্যা খুব বেশী পাওয়া যায় না। যারা অঙ্ক শাস্ত্র ভালবাসে তাদের মধ্যেও অধিকাংশ মেয়েরাই খুব বড় বড় গুণ ভাগ কর্‌তে নারাজ, কারণ প্রায়ই সেগুলি ভুল হয়ে যায়—কাগজ পেন্সিলে লিখে কস্‌লেও।

কিন্তু আমাদের বাঙ্গালা দেশেরই একজন, কি বড় বড় যে গুণ ভাগ ইত্যাদি নির্ভুল ভাবে মুখে মুখে কষে ফেল্‌তে পারেন, তা' শুন্‌লে তোমরা অবাক্ হ'য়েযাবে। তাঁর অঙ্কশাস্ত্রে এই অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি এবং স্মরণশক্তি দেখে আজ শুধু যে ভারতবাসী মুগ্ধ তা নয়, বিদেশীরাও বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। একজন ভারতবাসীর এই অসামান্য ক্ষমতা।

ইনি অনেক দিন আমেরিকাতে ছিলেন। আমেরিকার লোকেরা তাঁকে অনেক সভায় অনেকবার ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁর ক্ষমতার পরীক্ষা করেছেন্—অনেকে তাঁকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুণ দিয়ে ঠকাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কিছুতেই কেউ তাঁকে

ঠকাতে পারেন নি। প্রতিবারেই তিনি নির্ভুল উত্তর দিয়ে আপনার গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

একবার এক সভায় তাঁরা তাঁকে এক শত সংখ্যাকে একশত সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে দিয়েছিলেন। (অঙ্কটী নিতান্ত বড় বলে আর এখানে তুলে দিলাম না) সভার অনেকেই মনে করেছিলেন যে, তিনি কিছুতেই পার্ব্বেন না এই প্রকাণ্ড অঙ্কটী কষতে—কিন্তু তিনি এবারও এই গুণটী মুখে মুখে নির্ভুলভাবে কষে দিয়েছিলেন। অঙ্কটী কষতে তাঁর ৫২ মিনিট ৩০ সেকেণ্ড লেগেছিল। আশ্চর্য্য ক্ষমতা! ভাবলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়—মনে হয় একি সত্যি!

এই অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিটীর নাম কি জান? এঁর নাম হচ্ছে শ্রীযুক্ত সোমেশ চন্দ্র বসু। ঢাকার অন্তর্গত ব্রজযোগীনিতে এঁর জন্ম। খুব ছোট বেলা থেকেই এঁর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং সাধনার ফলে আজ যে তা' কত বেড়ে গিয়েছে তার প্রমাণ ত দেখতেই পাচ্ছ।

ভগবানে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তিনি বলেন যে; শুদ্ধ নিয়মিত ভাবে সংযত, পবিত্র, জীবন যাপনের ফলেই তাঁর স্মরণশক্তি এত বেড়ে গিয়েছে। তাঁর এত স্মৃতিশক্তি যে গত বৎসর তাঁকে যে সব অঙ্ক করতে দেওয়া হয়েছিল সে সবের সংখ্যাগুলি তাঁর আজও মনে আছে।

চলন্ত স্কুল

উত্তর অণ্টেরিয়োতে লোকের বসতি খুব ঘন নয়। এক জায়গায় হয়তো দুইটা লোকের বাড়ী আছে—তার কাছে এক মাইলের ভিতর অন্য কোন বাড়ী নেই, কিন্তু এসব বাড়ীর লোকেদের ছেলে মেয়ে আছে। তাদের লেখাপড়া শেখবার ব্যবস্থা কি হবে? সে দেশের গভর্ণমেণ্ট তাদের শিক্ষার জন্য এক আশ্চর্য্য ব্যবস্থা
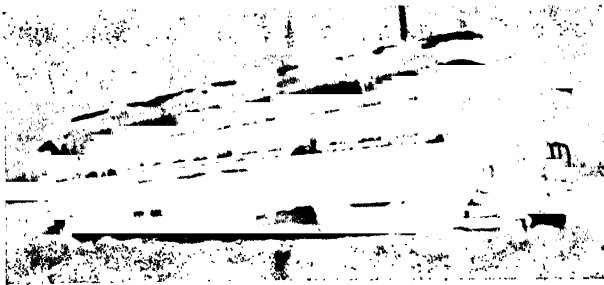
করেছেন। তাদের জন্য চলন্ত স্কুল করা হয়েছে। এই স্কুলগুলি ট্রেনের মধ্যে অবস্থিত। মাষ্টাররা ট্রেণেই থাকেন—খান। এক কথায় ট্রেনেই তাদের বাড়ী।

ট্রেণ গুলিতে স্কুলে যে সব জিনিষ থাকা দরকার সে সব ত আছেই তা' ছাড়া আছে শোবার ঘর, রান্নাঘর প্রভৃতি ; চলন্ত-স্কুল রেল-রাস্তাদিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়। পথে সুবিধা মত স্থানে—যেখানে লোকের বসতি আছে—থামায় ; তখন ছেলে মেয়েরা দলে দলে এসে তাতে পড়ে, সময় সময় গ্রাম থেকে বহু দূরেও তাদের
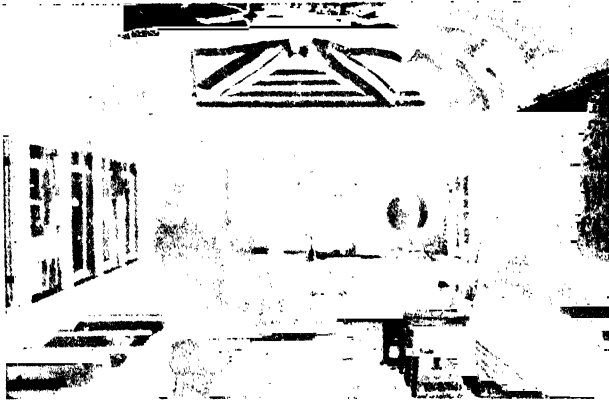
নিয়ে যাওয়া হয়। আবার এসে বাড়ীতে পৌছিয়ে দিয়ে যায়। অদ্ভুত নয় কি ?] একটি চলন্ত স্কুল ট্রেণ ও তার একটি ক্লাশ রুমের ছবি দেওয়া হ'ল। দেখ্‌লে তোমরা অনেকটা বুঝ্‌তে পারবে।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেঁটে রমণী।

শোনা যায় যে কুমারী ম্যান্‌জি রেস্‌ (Miss. Manzi Race) নাকি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেঁটে রমনী। তাঁর বয়স ২৪ বৎসর হয়েছে কিন্তু ইনি লম্বায় মাত্র ২৪ ইঞ্চি এবং এঁর ওজন মাত্র ২৩ পাউণ্ড। নিজের বিষয় তিনি একটী কাগজে যা লিখেছেন, তার সারাংশ দিলাম—

"আমি লম্বায় মাত্র ২৪ ইঞ্চি এবং আমার ওজন ২৩ পাউণ্ড—আমাকে একটী তিন বছরের মেয়ের মতই দেখায়। এইটিই হয়েছে আমার মুস্কিল, কারণ আমাকে দেখে কেউই আমার ঠিক বয়স বিশ্বাস করতে চায় না, সকলেই আমার প্রতি একটি ছোট মেয়ের মতই ব্যবহার করতে চায়। আমি যে কোন বিষয়ে গভীর কিছু চিন্তা করতে পারি, তা কেউই মান্‌তে চায় না ; কিন্তু বাস্তবিক আমি অন্যান্য সাধারণ লোকদের মতই খেতে পড়তে

পারি, চিন্তা কর্‌তে পারি, এবং অনেকগুলি ইউরোপীয় ভাষায় বেশ স্বচ্ছন্দে কথা বল্‌তে পারি।

সব থেকে মুস্কিল হয় আমার পোষাক নিয়ে। আমি বেঁটে বলে যেন আমাকে সেই তিন বছরের মেয়ের মতই পোষাক পরতে হবে। বড়দের মত সাজগোজ করবার যেন আমার কোন অধিকারই নেই! বেঁটে বলে আমাকে কতবার কত নাকালে যে পড়তে হয়েছে তার ঠিক নেই।

একবার জার্ম্মানীতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি এমন সময়ে এক পুলিস এসে আমাকে থামিয়ে, বেশ কড়া করেই আমাকে আমার পোষাক সম্বন্ধে দু'কথা বল্‌ল। তার মতে আমার মত ছোট মেয়েকে কেন আমার বাবা মা, এইরকম বড়দের মত পোষাক পরে পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াতে দেন্! আমি যত বলি যে আমার বয়স ২১ হয়ে গিয়েছে এবং পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে মা বাবার শাসন করবার বয়স আর নেই, ততই সে ব্যাপারটা হাস্যকর মনে করে এবং কিছুতেই বিশ্বাস করে না আমার কথা। পুলিসের সঙ্গে যখন বচসা হচ্ছে, সেই সময় দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটী ছোট খাট ভিড় জমে গেল, আমাদের চার-ধারে। পুলিসটী তখন বেগতিক দেখে, চট্‌করে একটী ছোট মেয়ের মত আমাকে তুলে নিয়ে চল্লেন থানার দিকে।

থানার লোকেরাও কিছুতেই আমার বয়স বিশ্বাস কর্ব্বে না। শেষকালে অনেক করে লিখ্‌তে পড়তে পারার প্রমাণাদি দিয়ে, তাদের হাত থেকে অব্যাহতি পাই। এই রকম আমাকে অনেক রকমে অনেকবার বিপদে পড়তে হয়েছে। তবে রস গ্রহণের ক্ষমতা আমার যথেষ্ট পরিমাণে আছে বলেই আমি "Sense of inferiority" থেকে নিজেকে অসম্পুর্ণরূপে বাঁচাতে পেরেছি।

অনেকে হয়ত ভাব্‌বেন যে বাবা মা'র মধ্যে একজন নিশ্চয়ই বামন, তা' না হলে আমি এত বেঁটে হলাম কি'রকম করে? কিন্তু তা নয়! আমার বাবা, মা দুজনেই সাধারণ লোকের মতই লম্বা। আমার এক ভাই ৬ ফুটের উপর লম্বা এবং এক বোন্ লম্বায় ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি।

পাঁচ বছর পর্য্যন্ত আমি বেশ বেড়ে ছিলাম—বাবা মা কেউ কোন রকম অসাধারণত্ব লক্ষ্য করেন নি, তার মধ্যে। তবে তারপরেই হঠাৎ আমার বাড় বন্ধ হয়ে গেল। কত ডাক্তার দেখান হলো, কত বিশেষজ্ঞের সন্ধানে দেশ বিদেশে ঘোরা হলো, কিন্তু আমাকে আর লম্বা করান গেল না।

আমার বাড়ীতে গেলে তোমাদের মনে হবে যেন একটী পুতুলের বাড়ীতে

এসেছ। সেখানের চেয়ার টেবিল, বিছানাপত্র, সব আমারই ছোট্ট ছোট্ট,—আমার মাপ অনুযায়ী তৈরী করা। এমন কি বাসন কোসন্‌গুলিও তাই।

অনেক 'বামন' বন্ধুর সঙ্গে ভাব আছে—তারা এখন আমার বাড়ীতে এসে জোটে; তখন মনে হয় যেন এটা লিলিপুটদেরই রাজত্ব! বামন নন্, এরকম অনেকের সঙ্গেও আমার বেশ বন্ধুত্ব আছে। তাঁরাও আসেন আমার বাড়ীতে মাঝে মাঝে!

"সংখ্যার খেলার" উত্তর

১।

১৪	৭	১২
৯	১১	১৩
১০	১৫	৮

২। ৮৮৮
৮৮
৮
৮
৮
———
১০০০

৩। সংখ্যাটী ১

৪। এবারও সংখ্যাটী ১

৫। ১ আর ১০

৬। সংখ্যাটী ১২ এবং অংশগুলি হচ্ছে ১, ২, ৩, ৬

৭। ২১৭৮ (২১৭৮ × ৪ = ৮৭১২)

কিশোরী

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

দেশের কিশোরী! বোন্ বলি স্মরি
তোমাদের মনোমাঝে
তোমাদের প্রীতি, আনন্দ-গীতি
আশার বীণায় বাজে
বাঙ্লা মায়ের স্নেহের ছায়ের
তোম্‌রা দুলালী মেয়ে
ছাড়ো গৃহকোণ্ মিলি' ভাই বোন্
সমুখে চলিব ধেয়ে।

* * *

শুধু ভাইদের কঠোর ব্রতের
সিদ্ধি নাহিক হবে
বহু বাধা জিনি তোমরা ভগিণী
সাথে না আসিলে সবে
আজি শরতের চারু প্রভাতের
আলোর পরশ লভি'
হৃদয়ে হৃদয়ে এসো নির্ভয়ে
মুক্তির আঁকি ছবি।

* * *

দুঃখ সুখের হাসি-রোদনের
দীর্ঘ যাত্রাপথে
হইয়া সহায় মহামহিমায়
ভরিয়ো পুণ্যব্রতে
শেফালি-বৃন্ত যেই অচিন্ত্য
বরণে মোহন হোলো
তারি তুলিকার লিখনে, সবার
সাধনা রাঙায়ে তোলো।

*　　*　　*

পল্লীনগরী　　　পবিত্র করি'
সেবায় অটল থেকো
আপনার জ্ঞানে　　　চির কল্যানে
সবারে সমান দেখো
মোরা ভাই বোন　　　অচপল মন
যুক্ত প্রাণের বলে
স্নিগ্ধ করিয়া　　　দিব সব হিয়া
বাঙ্‌লার গৃহতলে।